تحفۂ سعدیہ

তোহফায়ে সা'দিয়া

তোহ্‌ফায়ে সা'দিয়া

تحفۂ سعدیہ

তোহফায়ে সা'দিয়া

তোহ্‌ফায়ে সা'দিয়া

তোহ্‌ফায়ে সা'দিয়া

কুতুবে দাওরান, কাইউমে জামান, হজরত মাওলানা আবুস সা'দ আহমদ খান, নক্‌শবন্দী মুজাদ্দেদী ও মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রাহিমহুমাল্লাহ্‌ দ্বয়ের জীবনের ঘটনাবলী ও পরিচিতি এবং হজরত মাওলানা খান মুহাম্মদ সাহেবের আলোচনা এবং সেই সাথে মুসাযাই শরীফের প্রধান প্রধান বুজুর্গ ব্যক্তিদের আলোচনা ও স্মৃতিকথা

মূল উর্দূ ঃ
মাওলানা মাহবুব ইলাহী সাহেব

ভাষান্তর ঃ
মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশনায়ঃ

মূল উর্দু গ্রন্থঃ
খানকা সিরাজিয়া
কুন্দিয়ান, জেলা মিয়ানওয়ালী
পাঞ্জাব, পাকিস্তান

বাংলা অনুবাদঃ
খানকা সিরাজিয়া
২৯৬, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সড়ক,
বনানী, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৬০৫৪৯৮

সম্পাদনায়ঃ
মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণেঃ
আবদুল মান্নান তালুকদার
ইউনিক প্রিন্টার্স
৬৩ গ্রীণ রোড,
ঢাকা-১২০৫

কম্পিউটার কম্পোজঃ
শব্দরূপ কম্পিউটার সার্ভিসেস
৩৪, গ্রীণ রোড, ঢাকা।

বাংলা সংস্করণের প্রথম প্রকাশঃ
রবিউল আউয়াল, ১৪১৩ হিজরী
ভাদ্র, ১৩৯৯ বাংলা
সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইং

হাদিয়াঃ
শোভন সংস্করণ টাকা- ৮০.০০
সুলভ সংস্করণ টাকা- ৬০.০০

আরজ গোজার

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে তোহ্ফায়ে সা'দিয়ার বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হল। ঢাকাস্থ খানকা সিরাজিয়ার গদিনিশিন আলা হজরত ভাই হান্নান বহু পূর্বেই গ্রন্থটি প্রকাশের তাগিদ দিতে থাকেন এবং ভাষান্তরের কাজও সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাজ নানা কারণে বিলম্বিত হয়ে পড়ে। অবশেষে সকল অন্তরায় কাটিয়ে পাঠকদের খেদমতে গ্রন্থটি তুলে দিতে পারায় আবার মহান আল্লাহ পাকের বারগাহে জ্ঞাপন করি অফুরন্ত শুকরিয়া।

বস্তুতঃ মা'রেফাত ও তরীকত সম্পর্কিত তোহ্ফায়ে সা'দিয়া অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ উর্দূ ভাষায় লিখিত। বাংলায় এর ভাষান্তর খুবই কঠিন কাজ। অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক সাহেব এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করেছেন। মহান আল্লাহ পাক তাঁর এই পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করুন। সেই সাথে স্বীকার করতে হয় গ্রন্থটি মুদ্রণের জন্য ইউনিক প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল মান্নান তালুকদারের বিশেষ অবদানের। তাঁর আন্তরিক প্রয়াসের জন্য আল্লাহ পাক তাঁকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দান করুন।

গ্রন্থটি প্রকাশের নানাবিধ কাজে অনুজপ্রতিম মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম এবং অন্য যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁদেরকেও উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

তোহ্ফায়ে সা'দিয়ার ভাষান্তর, সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাজ যথাসম্ভব অনুগত, নির্ভুল ও সুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোন স্থানে কোন ব্যত্যয় ও ভুল কারো নজরে পড়লে অনুগ্রহ করে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে ইনশাল্লাহ তা শুধরিয়ে দেয়াহবে।

এই গ্রন্থ পাঠ করে যদি একজনও হেদায়েতপ্রাপ্ত হন, তবেই আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা সার্থক হবে। মহান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর রহমত ও বরকতের মধ্যে কবুল করে নিন, এই মোনাজাত করি।

ঢাকা, ১০ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৩ হিজরী

সম্পাদক

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

- ভূমিকা ৭
- বাইয়াত ও তরীক্বাপন্থী হওয়ার আবশ্যকতা ৯
- শরীয়তের শাখা সমূহ ১৪
- মুসাযায়ী শরীফের প্রধানদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৪
- হজরত হাজী দোস্ত মুহাম্মদ কান্ধারী (রঃ) এর বর্ণনা ৩৪
- হজরত খাজা মোহাম্মদ ওসমান দামানী (রঃ) এর জীবনের বর্ণনা ৪৫
- হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন (রঃ) এর জীবন ও স্মৃতি কথা ৫৭
- মুজাদ্দেদে আসর, কাইউমে জামান, হজরত মাওলানা আবুস সায়াদ আহম্মদ খান কুদ্দুসু সিররুহুর জীবনের ঘটনাবলী ৭০
- আলা হজরতের উত্তরসূরী ও খলিফাবৃন্দ ১৩২
- কুদওয়াতুস সালেকিন, যুবদাতুল আরেফিন, কাইয়ুমে জমান, কুতুবে দাওরান, সাইয়েদিনা ও মুরশিদানা, হজরত মাওলানা আবুস সায়াদ আহ্‌ম্মদ খান নক্শবন্দী, মুজাদ্দেদীর জীবনের ঘটনাবলী এবং বরকতম বাণী সমূহ ১৪৬
- নায়েবে কাইউমে জামান সিদ্দিকে দাওরান হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কুদ্দুসু সিররুহুর (গদীনিশীল খানকায়ে সিরাজীয়া, কুন্দিয়া, জিলা মিয়ানওয়ালী) জীবনী ২৪৫
- হজরত মাওলানা আলহাজ খান মুহাম্মদ সাহেব (গদীনিশীন খানকায়ে সিরাজিয়া) এর জীবনী ২৮৮

ভূমিকা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি খানকা সিরাজীয়াকে তোহ্ফায়ে সা'দিয়া দ্বিতীয়বার প্রকাশ করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন। এই পুস্তক লিপিবদ্ধ হইয়াছে হজরত কাইউমে জামানী, মাহবুবে সুবহানী, মাওলানা আবুস্ সা'দ আহ্মদ খান সাহেব (রঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনের পবিত্র ঘটনাবলী ও বিশেষ বিশেষ কাজের বিবরণ।

আ'লা হজরতের বরকতময় জীবদ্দশায় মাওলানা নজীর আহ্মদ আ'রশী সাহেব খানকা শরীফে সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে কিছু চোখে দেখা ঘটনা এবং কিছু তরীক্বাপন্থী ভাইদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার অনুসরণে ঐসব ঘটনাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কিতাবখানা যেহেতু সংক্ষিপ্ত এবং আ'লা হজরতের জীবনের বিস্তারিত ঘটনাবলী ইহাতে সন্নিবেশ করা সম্ভব হয় নাই, তবুও ইহা একবার পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয়ে পিপাসা থাকিয়া যায়। এবং বার বার পড়িবার আগ্রহ বাড়াইয়া দেয়। প্রতিবার পড়িবার পর এক বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

এই বরকতময় কিতাবের উসিলায় অগণিত সত্য অন্বেষণকারী মানুষ হেদায়েতের পথ পাইয়াছেন। তাঁরা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগও লাভ করিয়াছেন। এ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মরহুম মাওলানা নজীর আহ্মদ সাহেবের এই প্রচেষ্টা তরীক্বায়ে পাকের জন্য একটি বিরাট অবদান, যাহা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার সনদ ও সুযোগ লাভ করিয়াছে। বহুদিন পূর্বে এই কিতাবখানা লেখা হইয়াছিল এবং তাহা পাওয়াও যাইতেছিল না। সে কারণে গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার প্রকাশ করাই ছিল সিলসিয়ার অনুসারীদের একান্ত আকাংখা। যখন এদারায়ে সা'দিয়া মুজাদ্দেদিয়া কর্তৃপক্ষ পূণ্যবানদের এই দুষ্প্রাপ্য কিতাবখানা প্রকাশ করিবার প্রস্তুতি নিলেন, তখন সকলেই গ্রন্থটি খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার তাগিদ দিতে থাকেন। কিন্তু সর্বপ্রকার প্রস্তুতি ও সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই প্রচেষ্টা স্থগিত হইয়া যায়। তাছাড়া দ্বিতীয়বার প্রকাশের ব্যাপারে শায়খে তরীক্বত, জীনাতে মাসনাদ, হজরত মাওলানা আবুল খলীল খান মুহাম্মদ সাহেব মাদ্দেজিল্লুহুল আলী নির্দেশ দিলেন যে, কিতাবের শুরুতে একটি ভূমিকা থাকা প্রয়োজন, যার মধ্যে হজরত হাজী দোস্ত মুহাম্মদ কান্ধারী (রঃ), খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানী (রঃ) ও খাজা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন (রঃ) এর জীবন চরিত এবং আলা হজরতের বাল্য জীবনের কিছু ঘটনা ও পরিচিতি সংক্ষেপে তুলিয়া ধরা প্রয়োজন। সেই সাথে গ্রন্থের উপসংহারে আ'লা হজরতের স্থলাভিষিক্ত হজরতে সানী, নায়েবে কাইউমে জামান, সিদ্দীকে দাওরান

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রঃ) সাহেবের জীবনের ঘটনাবলীও লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। শ্রদ্ধেয় আ'লা হজরত এই খেদমত হজরত সানী (রঃ) এর খলীফা হজরত কাজী শামসুদ্দিন সাহেবের উপর ন্যস্ত করিলেন। উল্লেখিত কাজী সাহেব শিক্ষা ও ধর্মীয় ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও সময় ও সুযোগ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত পান্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া লেখকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

গ্রন্থটি লেখা আরম্ভ করিয়া দুইমাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শুধু বাকী ছিল কাজী সাহেবের পান্ডুলিপি খানা দ্বিতীয়বার দেখার পর একটি ভূমিকা সংযোজন করিয়া লেখকের নিকট দেওয়া। ঠিক সেই সময়ই লেখক একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং অসুস্থতা এতই দীর্ঘায়িত হইল যে দুইটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। পান্ডুলিপি যেভাবে ছিল সেভাবেই পড়িয়া থাকিল। বন্ধুদের ইচ্ছা ছিল গ্রন্থটি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা হোক। কিন্তু লেখকের শারিরীক অসুস্থতা ও দুর্বলতা ছাড়া বিলম্বের আর কোন কারণ ছিল না। লেখাপড়া ও অনুসন্ধান জাতীয় কোন কাজে মনোযোগ নিবদ্ধ হইতেছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের সহিত চিঠিপত্রের যোগাযোগ এক প্রকার বন্ধ ছিল এবং দুনিয়ার কাজ কর্মের প্রতিও ছিল অনীহা। অশান্তিময় এই অবস্থা প্রকট হইয়া উঠিল। প্রতিদিন হজরতে আ'লার নিকট একটি আবেদন পেশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া যাইতেছিলাম। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতেছিল কিন্তু কিছুই লিখিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে আ'লা হজরতের নেক দোয়ায় কিছুটা সুস্থ হইলাম, এবং আল্লাহর নাম লইয়া এই আশায় কলম ধরিলাম যে, যে-ভাবেই হোক ভূমিকা এবং উপসংহার সাজাইয়া গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া ফেলিব। এতে হজরত শায়খের নির্দেশও পালিত হয় এবং তরীক্বাপন্থী ভাইদের দীর্ঘদিনের আকাংখাও পূর্ণ হইয়া যায়।

তাহাছাড়া দ্বিতীয়বার প্রকাশ করার ব্যাপারে এই একটি কাজ বাকী ছিল যে, হজরত মাওলানা মুফতী আতা মুহাম্মদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থের ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া বিভিন্ন স্থানের অস্পষ্ট বিষয়গুলি হাশিয়ার ভিতর লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। আল্‌হামদুলিল্লাহ সে কাজও উল্লেখিত হজরত মুফতী সাহেব রমজান মাসে খানক্বা শরীফে অবস্থান করিয়া সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন।

— o —

বাইয়াত ও তরীক্বাপন্থী হওয়ার আবশ্যকতা

তরীক্কার সকল সিলসিলাহ্ হুজুর (সঃ) পর্যন্ত যাইয়া শেষ হয়। আল্লাহ্তায়ালা হুজুর (সঃ) কে খাতামুন নাবিয়ীন অর্থাৎ সর্বশেষ নবী উপাধি দিয়া এমন এক সময়ে এই দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন, যখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ অতীতের সকল পয়গম্বরদের শিক্ষা হইতে বিমুখ হইয়া পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। কোথায়ও একত্ববাদ-ত্রিত্ববাদে আসিয়া ঠেকে। কোথায়ও অগণিত দেবতা লা-শারীক আল্লাহর স্থান দখল করিয়া বসে। অসংখ্য দেবদেবীর পূজার প্রচলন ছিল সর্বত্র। ফলে চারিত্রিক অবক্ষয় আল্লাহর বান্দাদিগকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল।

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَ كُمْ مِنْهَا .

"আর তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।" আল্লাহতায়ালা হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) কে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়া যেন নূতন করিয়া রহমাতের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন। যিনি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুনিয়াকে তাওহীদের বা একাত্ববাদের আলোকে আলোকিত করিয়াছেন। হুজুর (সঃ) দ্বীন প্রচার আরম্ভ করেন এই আয়াতের মর্মানুযায়ীঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَ قْرَبِيْنَ

অর্থাৎ সর্বপ্রথম তিনি তাঁহার নিকটতম আত্মীয়দিগকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত পেশ শুরু করেন। ইহার পর আস্তে আস্তে আরব জাহানে, অতঃপর সমগ্র পৃথিবীর মানুষের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন। এই হেদায়েতের সূর্য সমগ্র পৃথিবীর অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়াছে।

صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَتَسْلِيْمَا تُهُ

কুরআন মজীদ আল্লাহতায়ালার শাশ্বত বাণী এবং মানুষের জীবনের সকল দিক নির্দেশক যথা তাওহীদ, রিসালাত, ইবাদাত, মুয়ামেলাত, রাজনীতি, চারিত্রিক সৌন্দর্য ইত্যাদি সর্বপ্রকারের আদেশ নিষেধ আইন-কানুন ইহাতে বিদ্যমান। মোটকথা, মানুষের জীবনের সর্বপ্রকার সাফল্য ও উন্নতির এমন কোন দিক নাই যাহা পরিপূর্ণরূপে এবং স্পষ্টভাবে ইহাতে পাওয়া যায়না। যদি রসুলুল্লাহ (সঃ) কে দ্বীনের শিক্ষক করিয়া না পাঠানো হইত আর হুজুর (সঃ) এর পরিবর্তে কোন ফিরিস্তা আসমান হইতে কিতাবুল্লাহকে আনিয়া মানুষের সামনে রাখিয়া এই বলিয়া চলিয়া যাইত যে, সাধারণ

মানুষ ইহা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম অনুযায়ী জীবন যাপন করুক, তাহা হইলে কি এই কিতাব মানুষকে হেদায়েতের নূর দান করিতে পারিত?

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এই প্রশ্নের জবাবে ইহাই বলিবেন, না–তা কখনও সম্ভব হইত না। কেননা, যে পর্যন্ত কুরআনের শিক্ষাকে একজন মানুষের মাধ্যমে বাস্তবে রূপান্তরিত না করা হয়, সে পর্যন্ত সাধারণ মানুষ কোন অবস্থাতেই তার সঠিক অনুসরণ করিতে পারে না–তা' সেই শিক্ষা মানুষের জন্য যতই উপকারী ও উন্নতমানের হোক না কেন। ইসলামের আহবায়ক হুজুর (সঃ) যখন স্বয়ং আল্লাহর হুকুম আহ্কাম ও কুরআনের শিক্ষা এবং আল্লাহওয়ালাদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার বাস্তব নমুনা পেশ করিলেন এবং নিজের কথায় ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহপাকের আদেশ ও নিষেধের ব্যাখ্যা মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিলেন, তখন মানুষের মধ্যে উহা বুঝা ও উহার দ্বারা লাভবান হওয়া ও উহার ফয়েজ ও বরকত অর্জন করার উপায় অনুসন্ধানের প্রচুর আগ্রহ দেখা দিল। এবং যখন হুজুর (সঃ) আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নিজের নবুওয়াত ও রিসালাতের কথা ঘোষণা করিলেন, তখন সর্বপ্রথম ঈমান আনিলেন হজরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) যিনি হুজুর (সঃ) এর স্ত্রী হওয়ার সম্মান লাভ করিবার সাথে সাথে দুনিয়ার কাজ কর্মেও হুজুর (সঃ) এর সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায় নিষ্ঠার পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অতঃপর বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হজরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ইমানের সন্ধান লাভ করিলেন। এবং যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হজরত আলী কারামাল্লাহ্ অজহু ইসলাম কবুল করিলেন। এই দুই মনীষী ঈমান আনিবার সাথে সাথে হুজুর (সঃ) এর সততা ও সত্যবাদিতার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখিতেন। অতএব এটা এতই সুস্পষ্ট যে, যিনিই একবার ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই হুজুর (সঃ) এর চরিত্র মাধুরীর দ্বারা এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, ঈমান ও ইসলাম তাহাদের মস্তিষ্ক ও অন্তরের এমন গভীরে প্রবেশ করিয়াছে যে, অতঃপর তাহাদের প্রতি যতই জুলুম ও অত্যাচার করা হোক না কেন, তাহারা কখনও এই ঈমান ও ইসলাম পরিত্যাগ করিতে রাজী নহেন। এবং ইহাই ছিল হুজুর (সঃ) এর সুহ্বত ও মুহাব্বতের তাসীর। তৎকালীন মোমেনগণ ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জন ও সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করা ভালবাসিতেন এবং ইসলাম হইতে বিমুখ হওয়া বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। যেমন কবি বলিয়াছেনঃ

یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے

অর্থাৎ এটা এমন নেশা নয়, যা টক খাইলে ছাড়িয়া যায়। অতএব অন্তরে ঈমান প্রবেশ করার ইহা একটি বিশেষ আলামত যার ফলে আল্লাহর হুকুম আহ্কাম ও

আদেশ নিষেধ একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত মানিয়া চলা তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া গিয়াছিল। ইবাদতের সময় হইলে একান্ত যত্নসহকারে ইবাদত করার জন্য প্রস্তুতি, লেনদেনের ব্যাপার হইলে সততা ও নিষ্ঠার সহিত তাহা সম্পন্ন করার আগ্রহ, জেহাদের সময় হইলে বিনা ইতস্ততায় আত্মোৎসর্গ করার জন্য অস্থিরতা ও আকাংখা, ঈমানের পরিপক্কতা, উচ্চ সাহসিকতা ও ধর্মের প্রতি আসক্তি ঃ এই সকল গুণাবলী হুজুর (সঃ) এর ভালবাসারই নির্দশন স্বরূপ ছিল। একবার সাক্ষাতেই হুজুরের ভালবাসার প্রভাব প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তরে এত মজবুত আকার ধারণ করিত যে তা' কোন অবস্থাতেই মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইত না। এবং এই ভালবাসার উৎসাহ ও উদ্দীপনা রসুল (সঃ) এর জন্য আত্ম উৎসর্গকারীদের কর্মময় জীবনে সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হওয়ার ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার শক্তি আনিয়া দিত। সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজমায়ীন হুজুর (সঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আল্লাহ তায়ালার আইন কানুনের শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এবং সেইসাথে হুজুর (সঃ) এর সংস্পর্শে আসিয়া আত্মশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতার দ্বারা ধন্য হইতেন। খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ও ধর্মের দৃঢ়তার শিক্ষা লাভ করিতেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর হাবীবে পাকের নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের বর্ণনা কুরআনের এই আয়াতে এরশাদ করিয়াছেনঃ

يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

হুজুর (সঃ) পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে শুনাইতেন এবং সর্বপ্রকার মলিনতা হইতে তাঁহাদের অন্তরকে পরিষ্কার করিতেন। এবং সেই সাথে কুরআন ও হিকমাতের শিক্ষা দিতেন। মোটকথা, রসুলুল্লাহ (সঃ) তেইশ বৎসরের স্বল্প সময়ের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামদের একটি বড় দলকে যুগের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া এমন দৃঢ় ঈমানওয়ালা এবং আমলওয়ালা তৈয়ার করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং আত্মশুদ্ধির কাজ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। অতএব এরশাদ হইতেছেঃ

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ
(الحديث)

অর্থাৎ, আমার সাহাবারা নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাঁহাদের মধ্যে যাহাকেই অনুসরণ করিবে, সুপথ পাইবে। কুরআনে পাক ইসলামের একটি পূর্ণাংগ ব্যবস্থা। তার

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহপাক স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। এ ব্যাপারে কুরআনের সাক্ষ্য বিদ্যমান আছেঃ

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون

অর্থাৎ, আমিই এই কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং আমিই ইহার হেফাজতকারী। মুমীনগণ যখন আদেশ নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন শুরু করেন তখন ইহার আয়াত তিলাওয়াতে আত্মশুদ্ধি হয়। কিতাব ও হিকমতের দ্বারা আত্মা আলোয় আলোকিত হইতে পারে। তাই তার পঠনের হেফাজাত করা হইয়াছে এবং আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই তালীমে কিতাব ও হিকমাতের সিল্‌সিলাহ কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকিবে। আল্লাহপাক কুরআনের শব্দসমূহ আর উহার যের ও জবরের হেফাজতের জন্য হাফেজে কুরআনের অন্তর খুলিয়া দিয়াছেন। এবং সঠিক উচ্চারণের সাথে ক্বারীগণ আরবী সুরে অক্ষরের মাখারেজ এবং সিফাতের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আলেম সম্প্রদায় ও তাফসীরকারকগণ ইহার অর্থ এবং ব্যাখ্যার কাজ হাতে নিয়াছেন। হাক্কানী আলেম ও মা'রেফাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আত্মশুদ্ধি ও ক্বলবের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা নিজ কিতাবের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার হেফাজত এমনভাবে করিয়াছেন, যাহা মানুষকে হতবাক করিয়া দেয়। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মাবলম্বী তাহাদের ধর্মীয় কিতাব এরূপ সুরক্ষিত অবস্থায় পেশ করিতে পারিবে না। কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যুগে যুগে অঞ্চলে অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় ছিলেন। তাঁহারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং হাদীসে নব্বীর প্রচার ও প্রসারের কাজকে জীবনের প্রধান কর্তব্য কাজ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের কাজ আলহামদুলিল্লাহ হুজুর (সঃ) এর সময় হইতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আলেম সম্প্রদায় ও নেককার ব্যক্তিদের এই সেই দল, যে-দলের সংস্পর্শে কুরআনের শিক্ষার বাহ্যিক দিক ও আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি খুলিয়া যায়। এবং তাঁহাদের মুহাব্বতে ক্বলব ও আত্মার সংশোধন হয়, আল্লাহর ভেদ জানা যায় এবং শরীয়াতের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ফলে মা'রেফতি লাইনে চলা সহজ হইয়া যায় এবং মারেফাতের এই পথ মনজীলে বা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সহজ করিয়া দেয়। সংক্ষিপ্ত জ্ঞান বিস্তারিত রূপ ধারণ করে, আর অপ্রত্যক্ষ বিষয়াদি প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। মোটকথা, এভাবেই নবুওয়াতের পরিপূর্ণ ফয়েজ ও বরকতের এই পেয়ালা ঐ সকল বুজুর্গ ব্যক্তিদের উসিলায়, সর্বদা পিপাসায় কাতর উম্মতকে পান করান হইতেছে। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা যে হুজুর (সঃ) এর জামানায় মানবতার পরিপূর্ণতা হাসিল হইয়াছিল। এই

রহমতের বৃক্ষ সতেজ হইয়া ডালপালা সহকারে ফল এবং চাহিদার পাত্র পূর্ণ করিয়াছে। এইভাবেই ফল ও ফুলের প্রাচুর্যের কারণে প্রার্থীর পাত্র ছোট বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। তবুও কোন অবস্থাতেই সময় এবং দূরত্বের পার্থক্যকে অস্বীকার করা যায় না। তাই আস্তে আস্তে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ঐ সকল জগৎ বিখ্যাত মনীষীকুলের আবির্ভাব ঘটে, যে-সম্পর্কে হুজুর (সঃ) পূর্বেই ইংগিত করিয়াছিলেন ঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

অর্থাৎ সবচাইতে উত্তম যুগ আমার যুগ। অতঃপর তাহাদের যুগ যাহারা আমার যুগের নিকটবর্তী, তারপর উহারা যাহারা তাহাদের যুগের কাছাকাছি। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর (সঃ) এর যুগের লোক, আর সাহাবাদের যুগের লোক তাবে'য়ীন এবং তাবে'য়ীনদের যুগের লোক হইতেছেন তাবা-তাবে'য়ীন। সাহাবা যুগ ব্যতীত আর প্রত্যেকটি যুগ পূর্ববর্তী যুগ হইতে উত্তম ছিল। আর এখনতো ইহার দূরত্বের বিস্তৃতি ১৪ শত বৎসর। এ-কারণে দুর্বলতাও প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছিয়াছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবী এখনও এইরূপ সম্মানিত ব্যক্তিশূণ্য হইয়া পড়ে নাই। যারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণে গুণান্বিত তাদের সামগ্রিক সংখ্যা কমিয়া গেলেও তাঁদের নেক অস্তিত্বের বরকত অস্বীকার করা যায় না। এই কারণে প্রত্যেক যুগের সত্য অন্বেষণকারীর জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন ঃ তাঁহারা যেন আরেফীনে কামেলীনের তালাশে থাকেন। আর যেই পীর সাহেবকে শরীয়াতের উপর মজবুত এবং ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে পরিপূর্ণ পাওয়া যাইবে, তাঁর নিকট বা'য়াত হইয়া আত্ম সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। তরীকা পন্থীর জন্য ইহা অবশ্যকর্তব্য যে, তিনি যেন তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ও মাপকাঠি হুজুর (সঃ) এর সুন্দরতম আদর্শের আলোকে স্থির করেন। এইভাবে ক্বলব ও আত্মাকে শরীয়াতের বাহ্যিক ও অন্তরীণ সাজে সজ্জিত করিতে হইবে।

—— o ——

শরীয়তের শাখাসমূহ

হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী বলেন যে, শরীয়াতের তিনটি শাখা আছে, যথা ইল্‌ম, আমল এবং এখলাস। ইল্‌ম অর্থাৎ সঠিক বিশ্বাস সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। তাহা আকায়েদের কিতাব অথবা যে কোন শরীয়াতের আলেমদের নিকট হইতে হাসিল করা সম্ভব, ইহার জন্য কোন মারেফতী লাইনের প্রয়োজন নাই। আ'মল অর্থাৎ ই'বাদত যথা– নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য বৈষয়িক লেনদেন মুফতী ও মুহাদ্দেস সাহেবানদের নিকট হইতে জানা যায়। ইহার জন্যও তাসাউফের তেমন প্রয়োজন নাই। এর পরে এখ্‌লাস ঃ ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এখ্‌লাস হইল ইল্‌ম ও আমলের প্রাণ স্বরূপ। ইহা অর্জন করিতে হইলে মারেফাত পারদর্শী এবং সৎলোকের একান্ত প্রয়োজন। অন্তরের পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা এবং সত্যবাদিতার সম্পদ কেবল তেমন লোকের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে, যাহাদের সংযোগে বা সিল্‌সিলাহ সঠিকভাবে হুজুর (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছায়। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখ আছেঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ, তোমরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ শোন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিবে এবং সত্যবাদী ও সরল লোকদের সাহচর্যে থাকিবে।

নেকী হাসিল করিবার সুযোগ

নবুওয়াতের সময়ও বাই'য়াত ছিল, আর এখনও তাই আছে। নবী করীম (সঃ) এর নিকট কাফেরগণ আসিয়া তাহাদের বাপদাদাদের মনগড়া ধর্ম হইতে তওবা করিয়া হুজুর (সঃ) এর হাতে হাত রাখিয়া ইসলামের উপর বাই'য়াত হইত এবং হুজুর (সঃ) এর একবারের দৃষ্টিপাতেই তাহারা সত্যিকারের ঈমান ও এখলাস এবং এহসানের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া যাইত। তাঁহাদের অন্তর বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার পর তাঁহারা অন্যদেরকেও সংশোধন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেন। তখনকার প্রচলিত ঈমান এবং বাপদাদাদের মনগড়া রসুম হইতে বাহির হইয়া ঈমান ও সুন্নতের অনুসরণের সঠিক স্থান পাইতে হইলে আল্লাহওয়ালাদের সহিত সম্পর্ক বা যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহর পরিচয় লাভ করা তাঁহাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যেই লুকাইয়া আছে। তাহাদের হাতে বাই'য়াত হওয়া এবং সঠিক দ্বীন ও হুজুর (সঃ) এর পবিত্র সুন্নতের উপর সর্বদা স্থির থাকার ওয়াদা পালন করা, আত্মশুদ্ধির ইহা সেই পবিত্র পথ, যে পথে চলিয়া সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীন ও তা'বা–তাবেয়িনগণ এবং উম্মতের ওলীআল্লাহগণ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণাগুণের অফুরন্ত নেয়ামত হাসিল করিবার সুযোগ

লাভ করিয়াছিলেন। সরল পথ প্রাপ্তির এই ফল্গু–ধারা অন্তর হইতে অন্তরে সিল্‌সিয়াহ বা সিল্‌সিলায় চিরকাল চালু থাকিবে।

নাজাত প্রাপ্ত দল

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ভবিষ্যদ্বানীর ন্যায় এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার উম্মৎগণ ৭ ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে। তন্মধ্যে নাজাতপ্রাপ্ত দল মাত্র একটি এবং বাকী সবগুলি জাহান্নামী। সাহাবাগণ প্রশ্ন করিলেন ঃ আল্লাহর রসূল, সেই নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি? ইহার উত্তরে হুজুর (সঃ) এরশাদ করেনঃ

هُمْ عَلَى مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِى

অর্থাৎ তাহাদের পরিচয় হইল এই যে, আমি এবং আমার সাহাবারা যে পথে চলিয়াছি ঠিক সেই পথে যাহারা ঈমান ও আমলের সাথে জীবন যাপন করিবে। হুজুর (সঃ) অ–আসহাবী শব্দের দ্বারা এই কথাই পরিষ্কারভাবে বলিয়াছিলেন যে, আমার সাহাবীদের পথ হুবহু আমার পথ, সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যতগুলি দল আছে তাহারা সবাই রসুলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহার সাহাবায়ে কেরামদের কথা ও কাজকে সুপথ প্রাপ্তির ও সত্যের মাপকাঠি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ফিক্কাহ্ আইনমতে মাজহাব সমূহ

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতের চারটি মাজহাব, যথা হানাফী, শাফে'য়ী, মালেকী ও হাম্বলী সাধারণভাবে পরিচিত। যদিও মাজ্‌হাবগুলিকে একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেকের লক্ষ্য হইতেছে হুজুর (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামদের আমলের পূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালা এই সকল ফেক্বাহ্ শাস্ত্রের মাজহাবের মধ্যে হানাফী মাজহাবকে বিশেষ সম্মান ও মর্তবা দান করিয়াছেন, এবং ইহা তাঁহার খাছ মেহেরবানী ও পুরস্কার। তবে হক, না–হক সম্বন্ধে আলেমদের সিদ্ধান্ত হইল এই যে, এই চারটি মাজহাবের প্রত্যেকটিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আধ্যাত্মিক চরিত্র

আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পথ যদিও অনেক, তবে তার মধ্যে চারটি তরীক্কা, যথা নকশ্‌বন্দীয়া, চিশ্তিয়া, কাদেরীয়া ও সোহ্‌রাওরার্দীয়া সাধারণভাবে গৃহীত ও পরিচিত। ইহাদের সকলের উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপন করিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা। আলহামদুলিল্লাহ, পুরস্কার ও সম্মান হাসিল করিবার ব্যাপারে এই চারটি তরীকাই সমানভাবে শরীকদার। কোন কোন তরীকায় এই উদ্দেশ্য খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি হাসিল হয়, আর কোন কোন তরীকায়

অনুশীলন ও মুযাহিদার প্রয়োজন হয় তা ভিন্ন কথা তবে সকলের প্রকৃত উৎস কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নার অনুকরণ ও আইমায়ে মুজতাহেদীনের অনুসরণ করা। যদিও আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে ইহাদের চিন্তা ও দর্শন ভিন্নরূপ, সকলের চাওয়া ও পাওয়া হইতেছে একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি বিধান। কাজেই এই চারটি তরীকাই সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা হইবে, তাহা প্রার্থীর অন্তরের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে। যে তরীকার পরিচয়ের সাথে তিনি সম্পর্কিত, সেইটা গ্রহণ করাই তাহার জন্য উপকারী ও মানানসই হইবে।

আল্লাহ নৈকট্য লাভের পরিপূর্ণ পথ

আধ্যাত্মিক লাইনে কোন পথ আল্লাহর নৈকট্য লাভে নিকটতম, পরিপূর্ণ এবং সহজতম সে সিদ্ধান্ত নেওয়া সকলের কাজ নয়। নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত একমাত্র সেই সকল সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদেরই কাজ যাঁহারা এই সকল তরীকার উপর পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন, প্রত্যেক তরীকার উঁচু-নিচু, স্তর, স্থান, পরিচয় ও ভেদ ব্যক্তিগতভাবে অবলোকন করিয়াছেন এবং আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভে যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন।

হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানীর সিদ্ধান্ত ঃ

আধ্যাত্মিক লাইনের ক্ষেত্রে এটা একান্ত প্রয়োজন যে, সত্য অন্বেষণকারী যে স্তরের যোগ্যতা নিয়াই আসুক না কেন, তাহারা যেন ফয়েজ ও বরকত হইতে বঞ্চিত না হন। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে মারেফাতের অনুসরণকারীদের মধ্যেও এতটা সাহস নাই যে, তাহারা ঐসকল কষ্ট সহ্য করিবেন, যাহা মুতাকাদ্দেমীনগণ (পূর্বপুরুষ) সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য কাহারো মধ্যে ইহা হাসিল করিবার আগ্রহ থাকিলেও (কষ্টের পথ পরিহার করিয়া) একটি সহজ ও লাভজনক পথ অনুসরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করার প্রতিই তার আকাংখা প্রবল থাকে।

আল্লাহতায়ালা আমাদের ইমাম এবং নেতা হজরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-কে উত্তম পুরস্কার দান করুন, কারণ, তিনি আধ্যাত্মিক লাইনে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের সকল স্তর অতিক্রম করার পর তরীকায়ে আ'লীয়া নক্শবন্দীয়াকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত বাক্যদ্বারা উক্ত তরীকার প্রশংসা করিয়া সত্যের অন্বেষণকারীদিগকে এই পথ অবলম্বন করার জন্য উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন।

برانكه طر يقے كه اقرب است واسبق واوفق واوثق واسلم واحكم واصدق واولى واعلى واجلى وارفع واكمل واجمل طريقه عليه نقشبند يه است قدس الله تعالى ارواح اهاليها واسرار مواليها - اين همه بز گى اين طريق وعلو شان اين بزر گواران بواسطه التزم سنت سنيه است على صا حباالصلوة والسلام والتحية واجنباب.

ازبد عت نا مر ضيه ايشا ند كه در رنگ اصحاب كرام عليهم الر ضوان من الملك المنان نهايت كاردر بدايت شان مند رج است = وخصور آگك هى ايشان داوام پيدا كرده وبعراز وصول يه در جنه كمال فوق آگاهى ديگران شده -

অর্থাৎ প্রকাশ থাকে যে, সেই সকল তরীকার মধ্যে সবচাইতে নিকটতম, প্রবীনতম, আপনতম, ভরসাযোগ্য, পরিপূর্ণতম, বিজ্ঞতম, সত্যতম, মহানতম, মর্যাদাপূর্ণ, উচ্চতম, পূর্ণতম এবং সুন্দরতম তরীকাই হইল তরীকায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়া। আল্লাহ তায়ালা এই তরীকার প্রধানদের আত্মা আর ইহার বুজুর্গ ব্যক্তিদের কল্বকে পবিত্র করিয়াছেন। এই তরীকার সম্মান এবং ইহার সুনাম হুজুর (সাঃ) এর সুন্নতের অনুসরণ ও অপছন্দনীয় (বিদয়াত) কর্ম হইতে বিরত থাকার কারণেই হইয়াছে। নক্শবন্দিয়া তরীকার বুযুর্গানে দীনদের মধ্যেই সাহাবায়ে কেরামদের ন্যায় তরীকার সর্বশেষ উদ্দেশ্য (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ) হাসিলের প্রচেষ্টা তাঁহাদের যাত্রার শুরুতেই পরিলক্ষিত হয়। সর্বোচ্চ আসনে কৃতকার্য হওয়ার পর তাঁহাদের প্রভাব অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে তরীকায়ে নক্শবন্দীয়াকে অতি উত্তম ও উন্নত বলিয়া যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তা তাঁর মনগড়া কথা অথবা একতরফা কোন সিদ্ধান্ত নয়। কারণ তিনি নক্শবন্দীয়া তরীকার পূর্বে চিস্তিয়া, কাদেরীয়া, সোহ্রাওয়ার্দীয়া এবং কুব্রোবীয়া ইত্যাদি একাধিক তরীকার পথ অতিক্রম এবং সেসবের স্থান ও অবস্থানসমূহের

পরিচয়ও লাভ করিয়াছেন। এমনকি তিনি ইহাতে খেলাফত ও এজাজাতের পাশ পত্রও হাসিল করিয়াছিলেন। কাজেই সন্দেহের কোন অবকাশই নাই যে, এরূপ লোকের পক্ষেই উল্লেখিত তরীকাসমূহের মধ্যে সহজতম ও লাভজনক পথ নির্বাচিত করিয়া সত্যের পথ অন্বেষণকারীদিগকে পথ প্রদর্শন সম্ভব ছিল।

যদি হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর ঐ সকল শব্দের ব্যাখ্যা জানিতে হয়, তাহা হইলে ইমামে রব্বানীর লিখিত তিনটি বড় বড় কিতাব দেখা প্রয়োজন। তিনি নকশ্‌বন্দীয়া তরীকার মর্তবার উপর যে ১৩ টি গুণাগুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার লিখিত কিতাবে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে।

—— o ——

এই পবিত্র তরীকার আটটি মৌলিক পরিভাষা আছে

হজরত আব্দুল খালেক গজদওয়ানী (রঃ) এর নিম্নলিখিত ৮টি প্রচলিত শব্দ আছে, যাহা নক্শবন্দীয়া তরীকার পথ নির্দেশের স্তম্ভের সমতুল্যঃ

(১) নজর–বর্–কদম

এই কথাটির দুইটি অর্থ আছে, একটি প্রকাশ্য আর একটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য অর্থ এই যে, পথ চলিতে এবং শহর ও গ্রামে আসা যাওয়ার সময় পথিক নিজের দৃষ্টি পায়ের উপর রাখিবে, যেন তাহা অন্যায় স্থানে না পড়ে এবং অসাবধান প্রমাণিত না হয়। আর অপ্রকাশ্য অর্থ এই যে, তরীকা পন্থীর চলার গতি এত দ্রুত হওয়া উচিত যে, যেখানে তাহার নজর পড়িবে পদযুগলও তৎক্ষণাৎ যেন সেখানে পৌছায়। মাওলানা জামী (রঃ) হজরত খাজা বাহাউদ্দিন কুদ্দুস সিরুহুর শানে বলেনঃ

بسکه زخرد کرده به سرعت سفر = باز نما نده

قد مشن از نظر =

অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুর দিকে এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন যে, পা'ও দৃষ্টির পিছনে থাকে নাই। যে উচ্চস্থানে দৃষ্টি পড়িয়াছে পা'ও সংগে সংগে সেস্থানে পৌছিয়াছে।

(২) হুশ–দর্–দম্

ইহার অর্থ এই যে, যে শ্বাস ভিতর হইতে বাহির হয়, তাহা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ এবং সাবধানতা বর্হির্ভুত না হয়। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী কুদ্দুসুসিররূহ বলেন, এরূপভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যে, কোন অবস্থাতেই যেন তাহা আল্লাহর যিকির হইতে গাফিল না হয়। শ্বাস আসা–যাওয়া এবং তাহার মাঝখানের সময়টুকুও আল্লাহর্ ধ্যানে অতিবাহিত করা উচিত, যেন এই অবস্থাটা তাহার মধ্যে এমন একটি যোগ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে যাহার সহিত কৃত্রিমতার কোন সম্পর্ক না থাকে।

(৩) সফর–দর ওয়াতন

ইহার অর্থ শ্বাস প্রশ্বাসের ভ্রমণ। অর্থাৎ তরীকাপন্থী তার নিজের অস্তিত্বের মধ্যে সফর করিবে। এবং মানবীয় অসুন্দর সিফাত বা গুণাগুণ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া ফিরিস্তা স্বভাবের দিকে অগ্রসর হইয়া ১০টি স্তর যথাঃ তওবা, ইনাবত (অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন), সবর, শোকর, ক্বানায়াত, ওয়ারায়া, তাক্বওয়া, তাসলীম, তাওয়াক্কুল

রেজা এই সবের উপরে কৃতকার্যতা অর্জন করিবে। ইহার মাধ্যমেই উর্ধ্ব জগতের ভ্রমণও হাসিল হইয়া যায়।

(৪) খেলওয়াত–দর–আঞ্জুমান

হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী (রঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আপনার তরীকার ভিত্তি কোন জিনিষের উপর? তখন তিনি বলিলেন এ "লেয়াতদর আঞ্জুমানের উপর" অর্থাৎ – প্রকাশ্যে মানুষের সাথে বসবাস করা আর অপ্রকাশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে। এবং এমনভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে যে, আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক যেন তরীকাপন্থীকে আসল উদ্দেশ্য হইতে বিরত না রাখে। এরশাদ হইতেছে ঃ

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে (সেই দিকে) ইংগিত করা হইয়াছে যে, তাহারা এইরূপ লোক, যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য বা লেনদেন করিতে যাইয়া আল্লাহর স্মরণ ও নিয়মিত নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত প্রদান করা হইতে গাফিল (বিরত) হয় না।

(৫) ইয়াদ করদ

অর্থাৎ, শায়েখ বা পীরসাহেব মুরীদগণকে যেসব যিকিরের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ইসমে জাত (আল্লাহ আল্লাহ) হউক অথবা নফী–ও এসবাত অর্থাৎ লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহ হোক, মুখে মুখে বা অন্তরে সর্বদা মুরিদকে ব্যস্ত রাখিবে।

(৬) বাজ গাশত

ইহার অর্থ এই যে, যাকির (অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণকারী) যিকির করার সময় যেরূপ মুখে মুখে আল্লাহ আল্লাহ বা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতেছে, ঠিক তেমনিভাবে অন্তরে অন্তরে অনুনয় বিনয়ের সাথে বলিবেঃ"খোদা ওয়ান্দা মাকসুদেমান তুরী ও রেজায়েতু, তরক করদাম দুনিয়াও আখেরাতরা বারায়েতু, মুহাব্বত ও মারেফাতে খোদ্দাহ।" শুরুতে তরিকাপন্থী নিজকে এই কথায় সত্যবাদী মনে না করলেও ইহা বলিতেই থাকিবে, কেননা ইহার দ্বারা অনুনয়–বিনয় ও নিজকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করার মনোভাব প্রকাশ পায়। অতঃপর ইন্‌শাআল্লাহ আস্তে আস্তে এই কথায় সত্যের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে।

(৭) নিগাহ দাশত

ইহার অর্থ এই যে, তরীকাপন্থী যিকিরের অবস্থার ওয়াসওয়াসা (দ্বিধা–সংশয়) হইতে সাবধানতার সহিত অন্তরের সংরক্ষণ করিবে, এবং দুশ্চিন্তা ও চঞ্চলতাকে

মনের উপরে কোন রকম প্রভাব ফেলিতে দিবেনা। এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা বা তদপেক্ষা বেশী সময় পর্যন্ত আল্লাহ ব্যতীত কোন চিন্তা যেন না আসে। এবং ইহার অনুশীলন এত বেশী পরিমানে করিতে হইবে যেন আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বিস্মরণে থাকে।

(৮) ইয়াদ দাশত

ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি আত্মহারা হওয়ার স্বাদ গ্রহণকারীর ন্যায় অবস্থা, সাবধানতা ও সেই সঙ্গে চির উপস্থিতির উপলব্ধি যেন হাসিল হইয়া যায়। ইহাকে হুজুরে ক্বলূব বলা হয়। অনুসন্ধানকারিগণ আল্লাহতায়ালার ভালবাসার ব্যাপারে যে সাক্ষী ও প্রভাবের কথা বলেন, তাহার অর্থও এই স্মরণীয় যোগ্যতা। নক্বশবন্দীয়া তরীকার সাথে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যও ইহাকেই বলা হয়।

তরীকার বৈশিষ্ট্য ঃ

ইমামে তরীকত হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী বোখারী (রঃ) আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে একান্ত অক্ষমতা ও অনুনয়-বিনয়ের সাথে ১৫ দিন পর্যন্ত সিজদায় পড়িয়া দোয়া করিয়াছিলেন ঃ আয় বারে ইলাহী, আমাকে ঐ মারেফাতের পথ বলিযা দিন-যে পথে চলিয়া আপনার বান্দারা অতি সহজে আপনার নৈকট্য হাসিল করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহতায়ালা তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন, এবং এই নকশবন্দীয়া তরীকা দান করিলেন। ইহা তাঁহার নামের উপাধি হিসাবেও প্রসিদ্ধ। ইহা সকল তরীকা হইতে নিকটতম ও সহজতম এবং ইহা নিশ্চিতরূপে আসল লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। এই সিলসিলার সংযুক্তি হজরত সাইয়েদিনা সিদ্দিকে আকবার (রঃ) এর সাথে, যিনি আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের পরে সর্বসম্মতিক্রমে আফজালুল বাশার অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। বিশেষ ভাবে সুন্নতের উপর আমল করা এই তরীকার মূল ভিত্তি এবং এ-কারণে সর্বপ্রকার বি'দয়াত হইতে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই তরীকার মধ্যে আবেগ ও উৎসাহ পূর্বশর্ত। একজন প্রকৃত শিষ্য পীরে কামেলের সাহায্যে তা হাসিল করিতে পারে। প্রার্থির মধ্যে প্রচুর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। যিকির ও ইবাদাতের মধ্যে বিশেষ স্বাদ ও সন্তুষ্টি এবং অন্তরে একটি বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। আর এই আকর্ষণই তরীকাপন্থীকে আসল উদ্দেশ্যের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

এই তরীকার ফয়েজ ও উন্নতি নির্ভর করে পীরের সাথে সুসম্পর্কের উপর। আর পীরদের সাথে সম্পর্ক হুজুর (সঃ) এর সুন্নতের অনুসরণে সাহায্যকারী। অতএব মুরীদগণ আদব ও সম্মানের সাথে যত বেশী পীরদের সাথে যোগাযোগ রাখিবে তত বেশী তাড়াতাড়ি উন্নতির ঘাটিসমূহ কৃতকার্যতার সাথে অতিক্রম করিতে পারিবে।

এই তরীকার মধ্যে বরকতের পিয়ালা তেমনিভাবে হাসিল হয়, যেমনভাবে সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (সঃ) এর মজলিশ হইতে হাসিল করিতেন। জনাবে রিসালাতে মাআব (সঃ) এর বরকতময় পরিবেশে সৎ অন্তঃকরণে এবং আগ্রহ সহকারে একবার আগমনকারী ব্যক্তিও পরিপূর্ণ ঈমান লাভে কৃতকার্য হইয়া যাইতেন। অল্প বিস্তর নকশবন্দীয়া তরীকার বুজুর্গানদের কাছে সৎ অন্তঃকরণে আগমনকারী ব্যক্তিরাও উহার কিছুটা অনুভব করিতে পারেন যাহা অন্যান্য তরীকায় দীর্ঘ দিন যাবৎ যোগাযোগ করিয়া হাসিল করিতে হয়। এই কারণেই নকশবন্দীয়া তরীকার প্রধান ব্যক্তিদের বক্তব্য এই যে, "তরীকায়ে মা, বিআইনিহি, তরীক্বায়ে আসহাবে কেরামাস্ত" অর্থাৎ, আমাদের তরীকা হুবহু সাহাবায়ে কেরামদের তরীকার মত। এই হজরতগণ উপকার করার ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা নবী করীম (সঃ) এর সুহ্বাতের বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ স্বরূপ। তাহা এই কারণে বলা হয়, "তরীকায় মা–মাহরুমী নিস্ত, অ, হারকে মাহরুমাস্ত, দর তরীকায়ে মা না– খাহাদ আমদ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের তরীকার অন্তর্ভূক্ত হইবেন তিনি বঞ্চিত হইবেন না। পক্ষান্তরে, যে চির বঞ্চিত, সে কখনো আমাদের সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবেনা।

মানুষের অস্তিত্ব ১০টি লতীফা বা সূক্ষ্ম জিনিষের উপর বিরাজমান। তম্মধ্যে ৫টির সম্পর্ক সৃষ্ট জগতের সহিত, আর ৫টির সম্পর্ক রুহ জগতের সহিত। রুহ্ জগতের সহিত সম্পর্কিত লতীফাসমূহ হইতেছে ক্বলব, রূহ, সির, খফি, এবং আখফা। এইগুলি প্রবৃত্তি এবং সৃষ্টি জগতের সহিত সম্পর্কিত। এই বরকতময় নকশবন্দীয়া তরীকার মধ্যে এই সকল লতীফার সাফায়ী ও বিশুদ্ধিকরণ এবং স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্বের জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট মৌলিক শৃংখলা আছে। এসবের উপর নিয়মিত আমল করিয়া তরীকাপন্থী অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট লতিফাসমূহের নূর পরিপূর্ণরূপে হাসিল করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

এই তরীকার অনুশীলন আরম্ভ হয় সায়েরে আনফাসী (নফসসমূহের ভ্রমণ) অর্থাৎ "পাস্ আন পাস্" যিকিরের দ্বারা। জগতের ভ্রমণও ইহার মাধ্যমে হইয়া যায়। উর্ধ জগতের ভ্রমণের অর্থ হইল এই যে, সম্ভবপর সীমানা যথা পৃথিবী, আসমান, আরশ ও কুরসি এই সকল সম্ভবপর জগতকে ঘিরিয়া আছে, যদ্বারা এই সকলের অবস্থা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পায় এবং খুলিয়া যায়। পাস্ আন পাস্ যিকিরের দ্বারা রূহ জগতের ৫টি লতীফার সাথে সম্পর্ক কায়েম হইয়া গেলে কাশফের দরজা হাসিল হইয়া যায়। নকশবন্দীয়া তরীকার প্রধান প্রধান ব্যক্তি বিশেষভাবে খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ) বলেন যে, সায়ের বা ভ্রমণ দুই প্রকারঃ একটি " মুস্তাদির " যাহা নিকট হইতে নিকটতর, দ্বিতীয়টি "মুসতাতীল" যাহা দূর হইতে দূরান্তর। এই পবিত্র তরীকায় রূহজগতের লতীফার অনুশীলন কখনও বিস্তারিত ও কখনও সংক্ষেপে করানো হইয়া

থাকে। তাফ্‌শীল হাসবে জায়েল হেঁ, অর্থাৎ বিস্তারিত ঘটনা হইতেছে এইঃ ক্বলবের লতীফা হজরত আদম (আঃ) এর পায়ের নীচে, লতীফায়ে রূহ্ হজরত নুহ (আঃ) এর এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পায়ের নীচে, লতীফায়ে সির্ হজরত মুসা আলাইহিস্‌সালামের পায়ের নীচে, লতীফায়ে খফি হজরত ঈসা (আঃ) এর এবং লতীফায়ে আখফা হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর পায়ের নীচে। এই লতীফাসমূহের উন্নতি ও পরিপূর্ণতা, স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব নির্ভর করে আল্লাহর ওলীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার উপর।

লতীফায়ে ক্বলবের দ্বারা বিলায়েতে আদম (আঃ) এর সহিত সম্পর্ক বুঝায়। যে তরীকাপন্থী এই পথে অগ্রসর হয়, তাহাকে "আদামিল মাশরাব"বলা হয়। লতীফায়ে রূহের দ্বারা কৃতকার্য ব্যক্তিকে ইব্রাহীমূল মাশ্‌রাব বলা হয়। লতীফায় সির্ এর দ্বারা সফলকাম ব্যক্তিকে "মুসাবিল মাশরাব" বলা হয় এবং লতীফায়ে আখ্‌ফার ওলীর আসনে কৃতকার্য তরীকাপন্থীকে বিলায়েতে মোহাম্মদীয়া (সঃ) এর দ্বারা সম্মানিত করা হয়। এই সকল বিলায়েতের সম্পর্ক বিলায়েতে সুগরার সহিত, যাহাকে আওলীয়ায়ে এজামের বিলায়েতের দায়েরা বলা হয়। দ্বিতীয় দায়েরা বিলায়েতে কোবরা যাহাকে আম্বিয়ায়ে কেরামদের দায়েরা বলা হয়। তৃতীয় দায়েরাহ মালায়ে আলা অর্থাৎ মালাইকায়ে মুক্বার্‌রিবীনদের বিলায়েতের দায়েরা এবং যাহাকে দায়েরায়ে বিলায়েতে উ'ল্‌ইয়া বলা হয়।

এই সিলসিলায় একটি বিষয় একান্ত প্রয়োজন যে, মুরীদ বা তরীকাপন্থীর ধ্যান সম্পূর্ণভাবে অন্তরের দিকে রাখিতে হইবে এবং অন্তর আল্লাহ তায়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ্ রাখিবে। অতঃপর যিকিরকারী নফী ও এসবাতের যিকির অর্থাৎ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার সময় শ্বাস নামাইয়া বেজোড় সংখ্যার উপর শেষ করিবে এবং প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশ করিতে থাকিবে। নেক কাজের সুযোগ হইল আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করিবে, আর যদি সময় কখনো উদাসীনতায় কাটিয়া যায় তাহা হইলে দুঃখিত হইবে এবং তওবা করিবে।

এই মহান তরীকার মধ্যে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা ও সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ইহাকে এহ্‌সান বলিয়াছেন এবং তাসাওউফের পরিভাষায় ইহাকে মুশাহিদাহ্ বা শুহুদ বলা হইয়াছে। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ আছেঃ

اَنْ تَعْبُدَ رَبَّكَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ (الحديث)

এই হাদীসের মর্মানুযায়ী বুঝা যাইতেছে যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌তায়ালাকে সরাসরি দেখিতে নাও পারে, তবুও দেখিবার মতো একটা অবস্থা অবশ্যই অনুভুত হয়।

কৃতকার্য হওয়ার সূত্র

পীরে কামেলের সুহ্বাতে থাকিয়া আদব ও নিয়মানুযায়ী চলা এবং মুরশেদের নির্দেশানুযায়ী অতি যত্নের সহিত এই পবিত্র তরীকার যিকির ও অন্যান্য ওজীফাহ্সমূহ আদায় করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে ইহার সাফল্য। অতঃপর এই তরীকার মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করার সুযোগও আছে। যাহারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও সাহসী, কেবল তাহারাই এই সুযোগ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। আল্লাহ্ পাক যাহাদিগকে এই কাজের যোগ্যতা দান করেন, তাহারাই ইহাতে সৌভগ্যবান হইতে থাকেন এবং উন্নতিলাভ করিতে থাকেন।

তরীকায় নকশবন্দীয়ার বিশেষ বিশেষ গুণাবলী হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী (রঃ) তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার পূর্বে তরীকায়ে নকশবন্দীয়ার প্রশিক্ষণ এবং দৃষ্টিভংগী সুশৃংখল অবস্থায় ছিলনা। তিনিই এই সুমহান সিলসিলাকে অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়াছেন এবং ইহাকে তালিকাভুক্ত করিয়া একটি কার্যকর রূপ দান করিয়াছেন। অতঃপর ইহার উপরই তাঁহার নিজস্ব তরীকা মুজাদ্দেদীয়ার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাছাড়া তিনি অসংখ্য সত্য উদঘাটন ও পরিচিতি তুলিয়া ধরার পর মারেফাতে ইলাহীর এই সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যেখানে পৌঁছিয়া তরীকাপন্থী নিজের অজান্তেই বলিয়া উঠেনঃ

অর্থাৎ রসূল (সঃ) ও নবীদের সুহ্বাতের কারণে যেসকল কামালাত বা বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে আসিয়াছিল, হাজার বৎসর পর হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর উসিলায় দ্বিতীয়বার তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এবং তাঁহার নূর মুসলিম উম্মার অন্তরকে চিরস্থায়ী জীবন দান করিতেছে।

মাওলানা আ'রশী (রঃ) এর জীবনালেখ্য ঃ

নজীর বেগ তাখাল্লুস বা খেতাব আরশী, পিতার নাম মাওলানা আব্দুল করীম। জন্ম ইংরাজী ১৮৮৪ সন, ইন্তেকাল সেপ্টেম্বর ১৯৪৭। বয়স ৬৩ বৎসর। বাসস্থান কসবাহ ধনুলাহ্, প্রদেশ নাভা। তিনি পাশ করা আলেম, বিজ্ঞ চিকিৎসক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, নামকরা সম্পাদক এবং উঁচু দরের কবি ছিলেন। তিনি লাহোরের মাদ্রাসায়ে নোমানীয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উলুমে শারাক্বিয়ার ডিগ্রী মৌলভী ফাজেল ও মুন্সী ফাজেল পাশ করেন। ধর্মীয় শিক্ষা ও চিকিৎসা বিষয়েও তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি তাঁহার দেশ ধনুলাতে বসবাস করিতেন। চিকিৎসার সাথে সাথে লেখা এবং সম্পাদনার কাজে বিশেষ ব্যস্ততাও তাঁহার ছিল। মাদ্রাসায় কারীমিয়া ধনুলাতে তিনি শিক্ষকতা শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাওলানা আব্দুল করীমের নাম অনুযায়ী মাদ্রাসার নাম মাদ্রাসায়ে কারীমিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি আরবী ও ফার্সী শিক্ষা দান, লেখা ও সম্পাদনা এবং চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। এছাড়া তিনি একজন প্রসিদ্ধ বক্তাও ছিলেন। তাঁহার ওয়াজ আলোচনা এবং তাফ্সিরযুক্ত ছিল। তাঁহার স্বলিখিত ও সম্পাদনার মধ্যে ছোট বড় প্রায় ৭২ খানা গ্রন্থ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি প্রকাশিত হইয়াছে এবং বাকীগুলি শুধু পান্ডুলিপি আকারেই পড়িয়া ছিল। সেগুলি সম্ভবতঃ দেশ বিভক্তির গন্ডগোলের সময় নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে। প্রকাশিত পুস্তিকা ও কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হইলঃ-

মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তা'লীমূল বানাত নামে ৮ খন্ডে তাহা প্রকাশিত হয়। মাওয়ায়েজে আরশী নামে নিজস্ব বক্তব্যের উপরও তিনি একটি বই প্রকাশ করিয়াছিলেন। খুৎবাতে আ'রশী নামে আর একখানা কিতাব ছাপা হইয়াছে। এছাড়া মুসনবী মাওলানা রুম (রঃ) এর শরাহ গ্রন্থ সহজ সরল এবং সুন্দর উর্দু ভাষায় লাহোর হইতে অতি চমৎকারভাবে ২১ খন্ডে প্রকাশিত হয়। এই শরাহখানা দেখিবার সুযোগ আমার (অর্থাৎ লেখকের) হইয়াছে।

হিন্দুস্থান বিভক্ত হওয়ার পর লাহোরে আসিয়া তিনি গোয়াল মন্ডীতে একটি ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (জামীয়া শারক্বীয়াহ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ যথা মুন্সী ফাজেল, আদীব আলেম এবং আদীব ফাজেলের প্রস্তুতি করান হইত। আর যেহেতু মুসনাবী মাওলানা রুম (রঃ) এর প্রথম দফতর মুন্সী ফাজেলের তালিকাভুক্ত ছিল, সেহেতু এই ব্যাপারে মাওলানা নজীর আহমদ আরশী (রঃ) এর শরাহ মিফতাহুল উলুম দেখার ও পড়ার সৌভাগ্যও হইয়াছিল। সত্য কথা এই যে, সর্বগুণে গুণান্বিত লেখক যেখানে জ্ঞান পিপাসুদের

সান্তনার জন্য পীর রুমী (রঃ) এর সত্য উদঘাটন এবং সঠিক পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে উর্দ্দু জানা ব্যক্তিদের উৎসাহের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কবিতার ছন্দে অভিধানিক জটিলতা দূর করা এবং ইলমে নহুর তরকীবের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। মুসনাবী শরীফের বিভিন্ন ব্যাখ্যার কিতাব সামনে রাখিয়া অর্থ ও ব্যাখ্যা সহজ করার ব্যাপারে এতটুকু অবহেলা তিনি করেন নাই। ভাষা অতিশয় বিশুদ্ধ এবং বর্ণনাভংগী খুবই মনোরম। অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় যে, উর্দ্দু ভাষায় মুসনাবী রুমী (রঃ) এর ইহা অপেক্ষা উত্তম ব্যাখ্যা বর্তমানে আর নাই। এছাড়াও তিনি দুরেব মাখতূম নামে মুসনাবী মাওলানা রূমী (আঃ) এর একটি ব্যাখ্যার কিতাব রচনা করেন এবং হাদিস বিষয় (কানজাল আমার) সম্পাদনা করিয়াছেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে কালীদে মাত্‌র বিয়াজে কারীমি, মুফরাদাতে আ'রশী, আনমুল ইলাজ এবং কালীদে আত্তারী; এইরূপ বহু সংখ্যক কিতাব প্রকাশ করিয়াছেন যাহার মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

—— o ——

স্বাভাবিক অবস্থায় মুসনাবী শরীফ মাওলানা রুমী (রঃ) এর ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক লেখার মধ্যে একটি সুগভীর সমুদ্রের ন্যায় আর এই দুর্গম পথ আমাদের সম্পাদক সাহেব খুব সুন্দর ও সাফল্যের সহিত অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহার মুল সম্পাদনা তুহফায়ে সা'দিয়ায়ে যে মহান ব্যক্তির পরিচয় এবং বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা আছে তাহাতে সম্পাদক সাহেব নিজেও ফয়েজ হাসিল করিয়াছেন। অতঃপর তাহার সাহায্যে তরীকায়ে নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়ার সঠিক পরিচয় লাভ করিয়াছেন। আমাদের সম্পাদক সাহেবের লেখা এই ১৯ খানা কিতাব বা পুস্তিকা আমরা হাতে পাইয়াছি। আর যদি তাঁহার লিখিত শরহে মুসনাবীর প্রত্যেক খন্ড ভিন্ন ধরা হয়, তাহা হইলে তাঁহার লিখিত কিতাবের সংখ্যা হইবে ৩৯টি। জনাব হাকীম মেহের মুহাম্মদ সাহেব গুজরানওয়ালার নিকট হইতে জানা যায় যে, তাঁহার লিখিত কিতাবের সংখ্যা ছিল ৭২ খানা। লেখক বলিতেছেন ঃ আমি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে জনাব হাকীম সাহেবের শুকরিয়া এজন্য আদায় করিতেছি যে, তিনি মাওলানা আরশী (রঃ) এর জীবনী লেখার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

তাঁহার চরিত্র ও অভ্যাস

তিনি অত্যন্ত বিদ্যাপ্রিয় এবং সুন্নতের একান্ত অনুসারী ছিলেন। অধ্যাপনার সাথে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। অনুসন্ধানজাতীয় সকল কাজ কর্মের উপর ছিল পূর্ণ অভিজ্ঞতা। মহান চরিত্র এবং আন্তরিকতা ও ওয়াদা পালন তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। হালাল রুজী উপার্জন করা এবং তাহা সঠিক পথে ব্যয় করা ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। মুত্তাক্বীদের নমুনা সামনে রাখিয়া সাজ-পোষাক ও চাল চলনে তিনি এত সহজ ও সরল ছিলেন যে, কোন কোন আগন্তক তাঁহাকে চিনিতে ভুল করিয়া বসিত। অধিকাংশ লোক মজলিসের অন্য কাহাকেও মাওলাানা আরশী মনে করিয়া তাহার সহিত মোসাফাহা করিয়া বসিত অথবা জিজ্ঞাসা করিত যে, আপনাদের মধ্যে আরশী সাহেব কে? সৃষ্ট জগতের সহিত চাল চলনে শরীয়তের নিয়ম-শৃংখলা মানিয়া চলা তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অতি পবিত্র এক আত্মা, কত সুন্দর চরিত্র, বিনয়ী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। কঠিন প্রয়োজনের সময়ও নিকটতম বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কাহারো মুখাপেক্ষী হওয়া লজ্জাজনক মনে করিতেন। নিজের সচ্ছল অবস্থা সর্বদা বজায় রাখিতেন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধু বান্ধবগণ কখনও তাঁহার কোন প্রয়োজনের বিষয় অনুভব করিতে পারিতেন। উহা অন্য কথা ছিল। কিন্তু সাহায্যের আশায় কাহারো নিকট মুখ খোলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যিকির ও অন্যান্য অজিফা এবং নিয়মিত মুরাকাবার প্রতি তিনি সর্বদা খেয়াল রাখিতেন। তাঁহার সুন্দর বক্তব্যের ধারাবাহিকতা মানুষকে শরীয়াত ও তরীকতের নির্দেশাবলীর দিকে আকর্ষণ

করা এবং উহার উপরে আমল করার জন্য সাহায্যকারী ছিল।

সত্য প্রকাশে সাহসিকতা

শহরে হিন্দু বেনীয়া এবং মহাজনরা সূদের কারবার করিত। মানবতা বিবর্জিত এই গোষ্ঠীর বেশীর ভাগ শিকার হইত অসহায় এবং অভাবী মুসলমানরা। এজন্য তিনি তাঁহার ওয়াজ ও নসীহতের মধ্যে ইহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন যাহাতে সুদের লেনদেনের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা আসে। ব্যাংকের সূদ সম্পর্কেও তিনি নিষেধ করিতেন। স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং মহাজনদের নিকট হজরতের এই ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ লাগিত। কিন্তু তিনি কোন নাফরমান শক্তির পরোয়া করিতেন না। মুসলমানদিগকে সূদের কারবার হইতে (যাহা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে যুদ্ধের সমতুল্য) সর্বদা নিষেধ করিতেন। সুন্নতের উপর আমল ঠিক রাখিয়া একটি অমুসলমান এবং সাম্প্রদায়িক সরকারের অধীনে বসবাস করিয়াও তিনি শরীয়তের হুকুম আহকাম প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতেন।

বাইয়াতের ঘটনা

উপরে উল্লেখিত সম্পাদক সাহেব তাঁহার বাইয়াতের ঘটনা গ্রন্থের শুরুতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোরমভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাইয়াতের তারিখ উল্লেখ করেন নাই তবে খানকা সিরাজিয়ায় তিনি প্রথম উপস্থিত হন ২৩শে শাউয়াল ১৩৫০ হিঃ রোজ বুধবার। বাইয়াতের সম্মান এই তারিখের পূর্বে মালিয়ার কোটলায় মিস্ত্রী জহুরউদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে হাসিল হইয়াছিল। জনাব মিস্ত্রী সাহেবই হজরতকে এই দিকে খেয়াল করাইয়াছিলেন। অতএব সম্মানিত সম্পাদক সাহেব সৌভাগ্যের প্রথম দিন ছিল, এই নামকরণে ইহা লিখিয়াছিলেন যে, ঐদিন ছিল সেই দিন যেদিন আমার তরীকাপন্থী ভাই মিস্ত্রী জহুরউদ্দিনের একখানা চিঠি এই মর্মে আমি পাইয়াছিলাম যে, (আলা হুজুর মুরশীদিনা ও মাওলানা আবুস্ সায়াদ আহমদ খান) দামাত বারাকাতুহুম কোটলায় পদার্পন করিয়াছেন। তোমার আসিয়া একান্তই হজরতের সাক্ষাতের দ্বারা সম্মান ও নেকী হাসিল করা উচিত। মরহুম মিস্ত্রী সাহেবের এই কথায় উল্লেখিত মাওলানা আরশী সাহেবের অস্থির অন্তরে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং তিনি পরের দিনই মালিয়ার কোটলার দিকে রওয়ানা হন। গাড়ীতে উঠিবার সাথে সাথেই তিনি হজরতে আলা কুদ্দুসু সিররুহুর দিক হইতে অদৃশ্য ধ্যান এবং ফয়েজ অনুভব করিতে থাকেন। তিনি লিখিতেছেনঃ(ধনূলাহ) বারনালার ঐ সেই পায়ে চলা পথ, যে পথে প্রত্যহ আসা যাওয়া ছিল; আজ জানিনা ইহার যোগাযোগ কোন জান্নাতুন নাঈমের সহিত হইয়াছে যার কারণে আতরের ঘ্রাণ মিশ্রিত বায়ু রীতিমত আমার অন্তরকে সুবাসিত করিতেছিল।

نسیم کوئے تواز لطف یروبردم = غمے کہ بردل این
جان نگارمی گزارد

অর্থ ঃ তোমার গলির প্রভাত বায়ু সর্বক্ষণ দয়াপরবশ হইয়া এই প্রেমাসক্ত হৃদয়ের বেদনা বিদূরিত করিয়াছে।

যদিও উল্লেখিত সম্পাদক সাহেব তখন পর্যন্ত কোন পীরের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু একজন পীরে কামেল ও সত্যের পথ প্রদর্শক পাওয়ার আগ্রহ তাঁহার অন্তরকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল। অপর দিকে, প্রকাশ্য পূজারী এবং দুনিয়াদার পীরদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর যাহা একজন পীরে কামেল এবং ওলী আল্লাহ পর্যন্ত পৌছান ছিল একটি দুস্তর বাধা স্বরূপ। এখন হজরতে আলার খেদমতে আসার সৌভাগ্যে তাই তিনি বলিতেছেন ঃ মন ইহা মানিয়া লইয়াছে যে, না দেখা এবং না শোনা যে গন্তব্য স্থানের জন্য আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম, তাহা ইহাই। মোটকথা, যেদিন তিনি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলেন, তার পরের দিনই তরীকায় প্রবেশ করিলেন। হজরতের প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় শুনুন ঃ আমার পীরের প্রথম বারের বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ আমার অস্থির অন্তরকে চির সান্তনা দান করিয়াছে। আমার এই দুইটি কবিতা সেই সময়েরই স্মরণিকা স্বরূপঃ

یہ شہر کو لہ مرد ے بد یدہ ام کہ مپرس = یحان
خویش کسے بر گز یدہ ام کہ مپرس چروز باسرآمد مرا
بہ تشربی = کنوی بآب حیا تے ر سید ہ ام کہ مپرس

অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন যে, আমি মালিয়ার কোটলা শহরে যেই আল্লাহর বান্দাকে পাইয়াছি, জানিতে চাহিওনা তিনি কত মর্তবার অধিকারী। আমি মনেপ্রাণে যে ব্যক্তিত্বকে নির্বাচিত করিয়াছি, আমার নিকট তাঁহার বুর্যুগীর বর্ণনা জিজ্ঞাসা করিওনা। আধ্যাত্মিক পিপাসায় পিপাসার্ত অবস্থায় অনেকদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এতদিন পর সেই আবেহায়াত পর্যন্ত পৌছাইতে পারিয়াছি। তাঁহার নিবেদিত প্রাণ এবং অন্তরের অবস্থা তোমরা কি জানিতে চাও?

মোটকথা, বাইয়াত এবং উহার পবিত্র ফললাভের দ্বারা ধন্য হইয়া সম্পাদক সাহেব সত্বর নিজের দেশ ধনুলায় চলিয়া গেলেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ ইহার পূর্বে দেশে একখানা মসজিদ সম্প্রসারণ এবং নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাড়াতাড়ি অনুমতি লইয়া চলিয়া যাই। স্থির হইয়াছিল যে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য পুনরায় কোন এক বিশেষ সময়ে খানকা শরীফে উপস্থিত হইব। কিন্তু যখন আগ্রহের আগুন জ্বলিয়া উঠে তখন তাহা নিভাইতে চাহিলেও নিভান যায় না।

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب
کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے

অর্থাৎ ভালবাসার উপর কোন হস্তক্ষেপ চলেনা। ইহা এইরূপ অগ্নি যাহা জ্বালাইতে চাহিলেও জ্বলেনা এবং নিভাইতে চাহিলেও নিভান যায়না। অসাক্ষাতের এই দিনগুলিতেও হজরতের সহিত চিঠি পত্রের যোগাযোগ ছিল। কামেল পীরগণ যখন কোন উপযুক্ত মুরীদ দেখিতে পান তখন তাঁহাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগ্রহের উষ্ণতা প্রার্থীর অস্তিত্বে আল্লাহ ব্যতীত সকল শক্তিকে পুড়িয়া ছাই করিয়া দেয়। সম্পাদক সাহেবের চিঠি পত্রে আগ্রহ এবং চাহিদা সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছিল। এবং পীর সাহেবের উপদেশমূলক খেয়াল দ্বারা প্রার্থীর অন্তরে আগ্রহ ও উষ্ণতা আরো বৃদ্ধি পাইতেছিল। আসলে দুনিয়ার ব্যস্ততার অবস্থা এরূপ যে, তাহার মধ্যে কোন ধর্মীয় কাজ সংযুক্ত থাকিলে একজন নিতান্ত ভাল এবং মজবুত লোককেও ইতস্তত ও অস্থিরতার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। কিছুটা এরকম অবস্থাই আমাদের মরহুম সম্পাদক সাহেবের ঐসময় দেখা দিয়াছিল। মসজিদ নির্মাণের ব্যস্ততা খানকা শরীফে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। পীর ও মুরীদের মধ্যে চিঠি পত্রের যোগাযোগ ঐ সময় এই ধরণের ছিল ঃ পীরের পক্ষ হইতে স্নেহ সহকারে তাড়াতাড়ি আসার উপদেশ দেওয়া হইত। পক্ষান্তরে, মুরিদের পক্ষ হইতে মসজিদ নির্মাণের ওজর দিয়া অবসর প্রাপ্তির পর উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইতেছিল। যখন এই বিলম্ব দীর্ঘায়িত হইল, তখন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এমন কথা লিখিয়া দিলেন, যাহা পড়িয়া সম্পাদক সাহেব উপস্থিত হওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থার বর্ণনা তাঁর নিজের ভাষাতেই শুনুনঃ

"পীর সাহেবের সর্বশেষ চিঠির একটি বিশেষ কথা এই ছিল যে, মসজিদ নির্মাণ যদিও একটি সম্মানজনক কাজ কিন্তু চরিত্র গঠণ এবং আত্মশুদ্ধি, 'যাহা প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ–আত্মিক সংশোধন', উক্ত নির্মাণ কাজ হইতে অনেক উত্তম ও অগ্রগণ্য।" এই উপদেশের ফলে জনাব সম্পাদক সাহেবের প্রতিক্রিয়া ঃ এই উপদেশ পাইয়া আমি আর বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি খানকা শরীফের দিকে রওয়ানা হইলাম। ২৩শে শাউয়াল ১৩৫০ হিজরী রোজ বুধবার আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে এই বিদেশী নিজ কামেল পীরের বরকতময় দেশের পবিত্র মাটিতে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করার সম্মান হাসিল করিল। সেইখানে যাইয়া কি দৃশ্য দেখিয়াছেন এবং কি কি হাল অবস্থা অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার কিছু প্রকাশ মরহুম সম্পাদক সাহেবের লেখা 'কেয়া দেখা' শিরোনামে তাঁহার অতি বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ফার্সী কাসিদায় বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থ পাঠে বিমোহিত হইবেন।

সার কথা এই যে, আমাদের লেখক সাহেব তরীকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই বিশেষ উৎসাহ সহকারে পীরের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বরকত হাসিল করিতে থাকেন। দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পরও চিঠি পত্রের মাধ্যমে অবস্থা জানাইয়া তরীকার পাঠ লইতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে এমন অবস্থায় পৌছান যে, পীর সাহেব তরীকায়ে পাকের অনুমতি দিয়া তাঁকে ধন্য করেন।

আত্মসংশোধন এবং পীরের কেরামত বা বুযুর্গীর একটি ঘটনা

কোন কোন বন্ধুর সহিত মাওলানা আরশী সাহেব আলোচনা করেনঃ মুরীদ হওয়ার প্রথমদিকে একবার খানকা শরীফে যাওয়ার পথে লালামুসা ষ্টেশনে (তখন ট্রেন কুন্দিয়া লালামুসা ও মালিকওয়ালের পথে যাইত) আমার মনে ইচ্ছা জাগিল, বড়ই মজার ব্যাপার হইবে যদি খানকাশরীফে পৌঁছানোর পর হজরত পীর সাহেব আমাকে জর্দা এবং পোলাউ খাইতে দেন।

আমি যখন খানকা শরীফে পৌছিলাম তখন দস্তরখান বিছানোই ছিল এবং খানা পরিবেশন করা হইতেছিল। সাধারণ খানা যথা রুটি ও তরকারী আমাকেও দেওয়া হইয়াছে। তখনও খাওয়া আরম্ভ করি নাই। এমন সময় হজরত পীর সাহেব ব্যস্তসমস্তভাবে তাশরীফ আনিলেন এবং আমার কাছে দাঁড়াইয়া খাদেমকে বলিলেনঃ আ'রশী সাহেবের সম্মুখ হইতে এই খানা তুলিয়া নাও এবং ভিতর হইতে জর্দা পোলাউ যাহা প্রস্তুত আছে আনিয়া উনাকে খাইতে দাও। আজ তাঁহার মন জর্দা পোলাউ খাইতে চায়।

আমি ইহা শুনিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেলাম। জর্দা পোলাউ আনা হইল। আমি খাইলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি এজন্য লজ্জিত ছিলাম। পীর সাহেবের কাশ্‌ফ ও কারামতের এই নমুনা দেখিয়া আমার অন্তরে বর্ণনাতীত ভয় ও আতংক বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পর আল্লাহ তায়ালা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

তরীক্বার প্রচার

উল্লেখিত সম্পাদক সাহেব হজরতের জীবদ্দশাতেই তরীকার স্তরসমূহ উত্তরণ করেন এবং তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া তরীক্বায়ে নকশবন্দীয়ার প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কাজেই সিলসিলায়ে আ'লিয়ার প্রচারের কাজে যত্নবান হওয়া তাঁহার একান্ত কর্তব্য কাজ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে তাঁহার নেতৃত্বে শত শত সত্য অন্বেষণকারী খানকা শরীফের দিকে অগ্রসর হইয়া হজরত আলার ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হইয়াছেন। আ'লা হজরত কুদ্দুসু সিররুহুর মর্মান্তিক ওয়াফাত ১৩৬০ হিজরীতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের সম্মানিত সম্পাদক পীরে

কামেলের নিকট হইতে তরীকার শিক্ষা পরিপূর্ণ করার জন্য সুদীর্ঘ ১০টি বৎসর সময় পাইয়াছিলেন। তরীকার পীর ও সূফীয়ায়ে কেরামগণ একজন মধ্যম অবস্থার তরীকাপন্থীর জন্য এতটা সময়ই ধার্য করিয়াছেন। হজরত শায়েখের ওফাতের পর খানকার সহিত তাঁহার সম্পর্ক যদিও নিয়মিত ছিল কিন্তু বেশী বেশী আসা যাওয়ার ঐ সিলসিলা শায়েখের জীবদ্দশার ন্যায় ছিলনা। তবে তিনি নিজ স্থানে সেইভাবেই দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সাথে তরীকায়ে আলীয়ার নিয়মাবলী পালন করিতে থাকেন এবং উক্ত তরীক্বার পরিচয় ও নিয়মিত প্রচারের কাজে সচেষ্ট হন।

জীবনের শেষ দিনগুলি

হিন্দুস্থান ভাগ হওয়ার পর যে রক্তাক্ত বিপ্লব দেখা দিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি মুসলমানদের ইহকাল ও পরকালের মংগল কামনা করা সকল কাজের মধ্যে অগ্রগণ্য মনে করিতেন। তিনি দেশবাসী মুসলমানদিগকে সূদী কারবার করিতে নিষেধ করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করিতেন। সত্যকথা প্রকাশ্যে বলা ছিল তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অভ্যাস। এই জন্য তিনি প্রদেশের সরকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে একজন বিপ্লবী নেতা হিসাবে গণ্য হইতেন। সূদখোর হিন্দু এবং শিখরা তাঁহাকে একজন হিংসুক ও সাম্প্রদায়িক মুসলমান মনে করিত। দেশ বিভক্তির পর যখন বাড়ীঘর পরিবর্তন করার সময় হইল এবং সত্য প্রত্যাখানকারিগণ যখন লা-পরওয়া হইয়া মুসলিম নর-নারী এবং নিষ্পাপ শিশুদের হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হইল, তখন তিনি তাঁহার সাথীদিগকে সাহস প্রদান করেন। সেইসংগে তিনি মুসলমানদেরকে ধ্বংস ও রক্তাক্ত অবস্থা হইতে রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

তিনি প্রকাশ্যে বলিতে শুরু করেন যে, যদি শত্রু তোমাদের উপর আক্রমন করে, তবে তোমরাও সাহসিকতার সহিত সেই আক্রমন প্রতিহত কর এবং তাহাদিগকে "কায়ফারে কেরদার" পর্যন্ত পৌঁছাও (অর্থাৎ নাফরমানীর শেষ পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দাও)। যদি আল্লাহর পথে তোমাদের জান কুরবানী হইয়া যায় তাহা হইলে উহাকে নিজেদের মংগল মনে করিও এবং কোন অবস্থাতেই নিজেদেরকে বিধর্মীদের কাছে ন্যস্ত করিওনা। মোটকথা, তখন তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবসহ বিধর্মীদের সাথে মুখামুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এবং শেষ পর্যন্ত নাভা প্রদেশের অন্তর্গত তালুন্ডী নামক স্থানে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

"আর আল্লাহর পথে যাঁহারা নিহত হন তাঁহাদিগকে মৃত বলিওনা। তাঁহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উহা উপলব্ধি করিতে পারনা।"

খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের রক্তের দ্বারা ইতিহাস আবারও রচিত হইল। এবং সজল নেত্রে আকাশ তাহা প্রত্যক্ষ করিল। বড়ই মর্মান্তিক সেই দৃশ্য। নিঃসন্দেহে, পৃথিবীর এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি বালুকণা, যাহা তিনি এবং তাঁহার সাথীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহার সাহসিকতার সাক্ষি দিবে এবং তাঁহার মর্যাদার জন্য আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তার দরবারে নিজের ভাষায় দোয়া করিতে থাকিবে।

—— o ——

মুসাযায়ী শরীফের প্রধানদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা

মিয়ানওয়ালী জেলার কুন্দিয়ায় অবস্থিত খানকা সিরাজিয়া মুজাদ্দেদীয়া প্রকৃতপক্ষে খানকা আহমাদীয়া সায়ীদীয়া মুসাযায়ী শরীফের একটি ফয়েজ ও মনোরম অবস্থায় পরিপূর্ণ ফলযুক্ত উচ্চ শাখা যাহা হজরতে আকাবেরে মুসাযায়ী শরীফের রুহানী শিক্ষা এবং তাহার প্রচারের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। খানকায়ে মুসাযায়ী শরীফের বানী প্রতিষ্ঠাতা হজরত খাজা হাজী দোস্ত– মুহাম্মাদ কান্ধারী (রঃ)। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হজরত খাজা মুহাম্মাদ ওসমান দামানী (রঃ) এবং অতঃপর তাঁহার সুযোগ্য সন্তান খাজা সিরাজউদ্দিন (রঃ) এই খানকার আসনকে অলংকৃত করিয়াছেন। এই তিন হজরতের বরকত ও পূণ্যময় উপস্থিতিকালে একটি বিরাট অঞ্চল নকস্বন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরীকার প্রধানদের উসিলায় ফয়েজ ও বরকতের দ্বারা লাভবান হইয়াছে। বিশেষভাবে হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিনের জামানায় খানকায়ে মুসাযায়ী শরীফের শান শওকত উন্নত শিখরে উপনীত হয়। কাবুল, খোরাসান, কান্ধার ইত্যাদি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য সত্য অন্বেষণকারী ফয়েজ হাসিল করার জন্য তাঁহার বাসস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিয়া নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের আশেপাশের সকল এলাকাবাসীকে আল্লাহর পরিচয়ের পিয়ালা পান করাইয়াছেন। হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন (রঃ) তাঁহার জামানায় শরীয়তের চর্চা যেভাবে করিয়াছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, হজরতে আলাও খানকা সিরাজিয়ায় সেই তরীকাই চালু করেন। একারণে এই খানকায়ে আলীয়া একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে।

যেহেতু এই মারেফাতের প্রস্রবণের সংযুক্তি আকাবেরে মুসাযায়ী শরীফের অতল সাগরের সহিত এবং এই দুঃস্প্রাপ্য মোতী সেই ফয়েজের খনির সহিত সম্পৃক্ত, সেহেতু তুহ্ফায়ে সা'দিয়া দ্বিতীয়বার প্রকাশ করার সময় হজরত মাওলানা আবুল খলীল খান মুহাম্মাদ সাহেব মদ্দেজিল্লুহুল আলী বলিয়াছেন যে, মুসাযায়ী শরীফের বুযুর্গদের আলোচনাও বরকত স্বরূপ উক্ত কিতাবের শুরুতে সংক্ষেপে থাকা প্রয়োজন। কাজেই আমি সম্মিলিতভাবে এই তিন হজরতের আলোচনা ও বর্ণনা এই কিতাবের সন্নিবেশিত করিলাম।

হজরত হাজী দোস্ত মুহাম্মাদ কান্ধারী (রঃ) এর বর্ণনা

হজরত হাজী দোস্ত মুহাম্মাদ কান্ধারী সাহেব জন্মগ্রহণ করেন ১২১৬ হিজরীতে কান্ধারের নিকট তাঁহার পিতার গ্রামে। বৃদ্ধি হওয়ার পরই তাঁহার বিদ্যার্জনের আগ্রহ হয়। সর্বপ্রথম তিনি কুরআন মজীদ পাঠ শিখিয়া আরবী ও ফার্সী ভাষায় দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা শুরু করেন। প্রকাশ্য বিদ্যা অর্জন তখনও শেষ হয় নাই, ইতিমধ্যেই তাঁহার

অন্তরে আল্লাহর পরিচয় লাভের আগ্রহ দেখা দিল। প্রকৃতি জন্মলগ্ন হইতেই তাঁহার অন্তরে তাহা আমানত স্বরূপ রাখিয়াছিল। নিজের লেখা জীবনীতে হজরতওয়ালা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জীবনের প্রথম হইতেই আমার আল্লাহওয়ালাদের সহিত একটি বিশেষ রকমের ভালবাসার সম্পর্ক ছিল । যদিও প্রথম দিকে প্রকাশ্য বিদ্যা অর্জনের ব্যস্ততা আল্লাহওয়ালাদের দলে শরীক হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিত, তথাপি যখনই কোন বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালার খবর পাইতাম, তখনই তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিজের জন্য দোয়ার আবেদন জানাইতাম। ইহার পর হাজী সাহেব এইরূপ লেখেনঃ

সত্যের অনুসন্ধান

কাবুলে থাকাকালে একটি আশ্চর্য রকমের ইতস্ততার মধ্যে পড়িয়াছিলাম। কেননা, একদিকে মন আল্লাহওয়ালাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, অপর দিকে বিদ্যা অর্জন করার আগ্রহ মাদ্রাসার সহিত জড়িত রাখিতে চাহিতেছিল। আমি মাত্র নাহু ও সরফ এবং মান্তেকের কয়েকখানা কিতাব পড়িয়াছি, তার মধ্যেই আমার মাদ্রাসার শিক্ষা হইতে মন উঠিয়া গেল। ঐ সময় এক রাত্রে আমার বুকে এমন ব্যথা উঠিল যে, আমি বেহুঁস হইয়া পড়িলাম। বেহুঁসীর এই অবস্থা এক নাগাড়ে ১৩ দিন পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই হুঁস ফিরিয়া আসিল এবং মুখে আল্লাহু এবং সুবহানাল্লাহর যিকির চালু হইয়া গেল। এই যিকির কখনও আস্তে এবং কখনও জোরে হইতেছিল। মুখে কখনও অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতি আর কখনও ব্যথার নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলাম। কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না যে এই ব্যথার কারণ কি এবং ইহার পরিণামই বা কি হইবে। ঐ সময় পেশাওয়ারের গ্রামে কোন এক বুযুর্গের সন্ধান পাইয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম।

তাঁহার সুহবাতে ঐ আগ্রহ যাহা যিকির চালু হইবার কারণে আমার ভাগ্যে হইয়াছিল, উহা প্রায়ই শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং উহার স্থলে অদৃশ্য অস্থিরতা ও পেরেশানী সৃষ্টি হইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত এই অস্থিরতার দ্বারা বিরক্ত হইয়া এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যেভাবেই হোক বাগদাদ শরীফ যাইয়া হজরত গাওসুল আজম শেখ সাইয়েদ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) এর দরবার শরীফে উপস্থিত হইব। হইতে পারে সেখানে গেলে আমার ব্যথার উপশম হইবে। কাজেই বাগদাদ শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া হজরত গাউসুল আজমের বরকতময় মাজার শরীফে উপস্থিত হইলাম। ফাতেহা পাঠ করিয়া দোয়া করিলাম কিন্তু ঐ অস্থিরতা দূর হইল না।

পীরের অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ততা এবং শুভ সংবাদ

কিছুদিন বাগদাদ শরীফে অবস্থান করার পরও এই অস্থিরতা আমাকে নিশ্চিন্তে বসিতে দেয় নাই। অপারগ হইয়া সেখান হইতে কুর্দিস্তানের শহর সোলাইমানীয়ায় পৌঁছিলাম। সেখানে অবস্থানকালে কোন এক ব্যক্তি আমাকে শেখ আব্দুল্লাহ হারদী (রঃ)

সম্বন্ধে জানাইলেন যে, হেরাত অঞ্চলে তাঁহার বুযুর্গী ও আল্লাহওয়ালা হওয়ার খুব সুনাম আছে। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে তাঁহার প্রশংসা শোনা যায়। আমি তৎখনাৎ সোলাইমানীয়া হইতে রওয়ানা হইয়া হেরাতে পৌঁছিলাম এবং দুইতিন মাস উল্লেখিত পীর সাহেবের খেদমতে অতিবাহিত করিলাম । কিন্তু ভিতরের অস্থিরতা দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল। শেষ পর্যন্ত হজরত শেখ আব্দুল্লাহ হারদী (রঃ) আমার এই করুন অবস্থা দেখিয়া বলিলেনঃ তুমি হজরত শাহ্ আবু সাইদ (রঃ) এর খেদমতে দিল্লী চলিয়া যাও। সেখানে তুমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে । কিন্তু আমি দিল্লী সফরের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই দ্বিতীয় বার বাগদাদের দিকে রওয়ানা হইলাম।

বাগদাদে শেখ মুহাম্মাদ যাদীদ (রঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর বসরা চলিয়া গেলাম। বসরায় হজরত হোসাইন দোসরী (বসৃরী) (রঃ) এর খেদমতে একাধারে সাত মাস অবস্থান করিলাম। সেখান হইতে স্থলপথে একাধিক শহরে ঘোরাফেরা করিতে থাকিলাম। প্রত্যেক শহরের বুযুর্গদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহাদের নিকট দোয়ার আবেদন করিতে থাকিলাম। শেষ পর্যন্ত শহরে কালাত নাসিরখান পৌঁছিলাম। এখানে সেই অস্থিরতাটা আবার বাড়িয়া গেল। আল্লাহ তায়ালার দরবারে অনুনয় বিনয়ের সহিত কান্নাকাটি করিলাম এবং ভয় ও আদবের সহিত এস্তেখারা করিলাম। ইহার ফলে একাধিক শুভ খাব (স্বপ্ন) দেখিলাম। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলাম যে হজরত শাহ্ আবু সাইদ দেহল্ভীর খেদমতে হাজির হইব। সিদ্ধান্তের পর বোম্বাইর পথে দিল্লী রওয়ানা হইলাম। বোম্বাই পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে, হজরত শাহ্ সাহেব রহমাতুল্লাহ্ হজ্বের নিয়তে বোম্বাই তশরীফ আনিয়াছেন এবং জাহাজের অপেক্ষায় এখানেই অবস্থান করিতেছেন। এই খবর শুনিয়া যারপরনাই খুশি হইলাম এবং তৎক্ষনাৎ শাহ্ সাহেবের খেদমতে হাজির হইয়া মুরীদ হওয়ার জন্য আবেদন জানাইলাম। আবেদন তিনি কবুল করিলেন। একদিন সুযোগমত শাহ্ সাহেবের নিকট আমার জীবনের সকল ঘটনা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ তোমার আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য সময়ের প্রয়োজন। আমি হজ্বে যাইতেছি এবং আমার অন্তরের সকল ধ্যান ধারণা হেজাজের দিকে চলিয়া গিয়াছে। অতএব তোমার অন্তরের অস্থিরতা দূর করার জন্য দিল্লী যাইয়া আমার ছেলে আহ্মদ সাঈদের সহিত সাক্ষাৎ কর এবং তাহার নিকট হইতে ফয়েজ অর্জন করিতে থাক। অথবা বোম্বাইতেই থাকিয়া যাও এবং আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা কর।

পীরের দরবারে

আমি প্রথম প্রস্তাবকেই অগ্রাধিকার দিয়া ভাবিলাম, দিল্লী গিয়া হজরত শাহ্ আহমদ সাইদ (রঃ) এর খেদমতে থাকাই উচিৎ হইবে। তাছাড়া বোম্বাই শহরে আমার

পরিচিত কেহই ছিলনা। সেখানে গরমের আধিক্যও সহ্যের বাহিরে ছিল। অতএব বোম্বাই হইতে দিল্লী রওয়ানা হইলাম। সফরের মধ্যে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে, হজরত শাহ্ সাহেব কেবলা হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং আমাকে এই রূপ বলিতেছেনঃ

شماآدون ماهستيد =

অর্থাৎ, তুমি আমার খলীফা

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিলে দিল্লীর দিকে মন ধাবমান হইল। দিল্লী পৌঁছাইলাম। খানকায়ে মাজাহারীয়ায়ে প্রবেশ করার সাথে সাথে তরীকার পীর আমার ইমাম, আমার পীর হজরত শাহ্ আহমদ সাইদ সাহেবের চেহারা মোবারক দেখিলাম। তাঁহার সাক্ষাৎ এবং বরকতের দ্বারা পূর্বের ইতস্ততা ও অস্থিরতা মুহূর্তের মধ্যে দূরীভূত হইয়া গেল। অন্তরে পরিবর্তন আসিল । অস্থিরতা স্বস্তিতে পরিণত হইল।

হজরতওয়ালার পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিলাম এবং এক বৎসর দুই মাস পাঁচ দিন তাঁহার খেদমতে থাকিলাম। হজরত পীর সাহেব এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে তরীকায়ে নকসবন্দীয়া কাদেরীয়া এবং চিস্তিয়ার সম্পর্কের দ্বারা ভাগ্যবান করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি তরীকার মধ্যে আমাকে খেলাফতের পোষাকে ভূষিত করিয়াছেন।

পীরের প্রতি ভালবাসা

হজরত কান্ধারী সাহেবের জীবনীতে এই ঘটনাটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, পীর হজরত শাহ্ আহমৃদ সাঈদ (রঃ) এর প্রতি তাঁহার এত বেশী ভক্তি ছিল যে, পীর সাহেবের জুতা তুলিয়া তিনি নিজের মাথার উপর রাখিতেন, চোখে লাগাইতেন। ভক্তি ও ভালবাসার তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সময় পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিতেন। প্রত্যেক শহরে ঝাড়ুদার বা মলমুত্র পরিষ্কার করার জন্য লোক থাকে। এখানেও হজরতের শৌচাগার পরিষ্কার করার লোক নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু দিল্লীতে অবস্থানকালে হজরত হাজী সাহেব পীরের নিজস্ব শৌচাগার পরিষ্কার করার কাজ নিজ হাতে করিতেন এবং তাহা নিজের জন্য গৌরব ও সম্মানের কাজ বলিয়া মনে করিতেন। অতিশয় বিনয় ও নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার এই অবস্থা কিভাবে লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা ভাবিতে অবাক লাগে। আসলে মুহাব্বতের সম্পর্কই এইরূপ যে, যাহার প্রতি ভালবাসা হয় তাহার জন্য নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া যায়। এই পরম ভক্তির কারণে শাহ্ সাহেব কেবলা হজরত হাজী সাহেবের সহিত নিজের ভালবাসার বিষয় এভাবে প্রকাশ করিতেনঃ হাজী সাহেব যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহা তিনি আমার ভালবাসার জন্য পাইয়াছেন। এবং আমার যতটুকু ভালবাসা তাঁহার সহিত আছে ততটুকু ভালবাসা আমার মুরীদদের মধ্যে আর কাহারও সহিত নাই।

ভবিষ্যদ্বানী ও শুভ সংবাদ

হজরত শাহ্ আহমৃদ সাঈদ সাহেব (রঃ) স্বয়ং হজরত হাজী সাহেব সম্পর্কে বলিতেনঃ শাহ গোলাম আলী (রঃ) এর খলীফাদের মধ্যে মাওলানা খালেদ রূমী (রঃ) যেরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার উসিলায় সিলসিলায় আলীয়া নকশবন্দীয়ার ফয়েজ ও বরকতের দ্বারা অনেক লোক লাভবান হইয়াছেন, ঠিক তদ্রূপ হজরত হাজী সাহেব ওলীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইবেন এবং তাঁহার দ্বারা লাখ মানুষ হেদায়েতের আলোকে আলোকিত হইবেন।

অনুমতি পত্রে প্রশংসার বাক্যসমূহ

হজরত শাহ্ সাহেব কেবলা বিদায়ের সময় হজরত হাজী সাহেবকে প্রদত্ত অনুমতি পত্রে হাজী সাহেবের সম্পর্কে যে সকল প্রশংসার বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা একজন পীর কামেলই কেবল তাঁহার স্থলাভিষিক্তের জন্য ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ

فَصَارَ مَجْتَمَعَ الاَ نْوَارِ وَمَعْدَنَ الْبِحَادِ فَأَ جَزْ تَهُ بِاجَازَةٍ مُطْلَقَةٍ

অর্থাৎ হজরত হাজী সাহেব আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁহার নূরে পরিপূর্ণ ও মারেফাতের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছেন। অতএব আমি তাঁহাকে তরীকার পূর্ণ অনুমতি প্রদান করিলাম।

থাকার স্থান সম্পর্কে উপদেশ

হাজী সাহেব কেবলা লক্ষ্যার্জনে সফলকাম হইয়া পীরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সময় শাহ্ সাহেব (রঃ) বাসস্থান নির্বাচনের ব্যাপারে এই উপদেশ দেন ঃ আপনি এরূপ স্থানে অবস্থান করিবেন যেখানে পোস্ত এবং পাঞ্জাবী উভয় ভাষার লোক বসবাস করে। অর্থাৎ একদিকে পোস্ত ভাষার লোক এবং অন্যদিকে পাঞ্জাবী ভাষার লোক বসবাস করে, সেরূপ স্থানে আপনি অবস্থান করিবেন।

মনে হয়, পীর সাহেবের দৃষ্টি যেন ইহা অবলোকন করিয়াছিল যে, তাঁহার মুরীদ পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী, অত্যন্ত নেককার এবং তাঁহার নূরের ফয়েজ কাবুল ও কান্দাহার ব্যতীত পোস্ত এবং পাঞ্জাবেও আলো বিস্তার করিবে। অতএব তাঁহার কেন্দ্রীয় স্থান এরূপ স্থানে হওয়া উচিৎ যেখানে বিভিন্ন পেশাধারী লোক সহজে পৌঁছাইতে পারিবে। বস্তুতঃ পীর সাহেবের ভবিষ্যদ্বানী সঠিক হইয়াছে এবং হাজার হাজার বিপথগামী লোক হাজী সাহেবের উসিলায় ঈমান ও হেদায়েতের সম্পদ লাভ করিয়াছে।

মুসাযায়ীর নির্বাচন

হজরত হাজী সাহেব মুসাযায়ী গ্রামকে নিজের অবস্থানের জন্য নির্বাচিত করেন। বর্তমানে সেখানে পাকা রাস্তা হইয়াছে। স্থানটি ডেরা ইসমাঈল খান হইতে ৪১ মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ থানা দারাবিন (দেরাদুন) হইতে দক্ষিণে তিন মাইল দূরে এই বসতি প্রকৃতপক্ষেই পোস্ত এবং পাঞ্জাবী ভাষায় মিলনস্থান ছিল। ইহার পশ্চিম দিকের সকল অধিবাসীর ভাষা পোস্ত এবং পূর্ব দিকের সকল অধিবাসীর ভাষা পাঞ্জাবী। আর মুসাযায়ী শরীফের অধিবাসিগণ পোস্ত ও পাঞ্জাবী উভয় ভাষাই বলিতে এবং বুঝিতে পারেন।

বুযুর্গীর প্রকাশ

হজরত হাজী সাহেব কেবলা ঐ স্থানকে নিজের বসবাসের জন্য পছন্দ করেন এবং নিজের মুরীদদের পানির সুবিধার্থে মুসাযায়ী শরীফের পশ্চিম দিকে একটি পাহাড়ী ঝরণার কাছে ঘর তুলেন যাহাতে পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন সহজে মিটান যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তাজুখীল গোত্রের লোকজন হাজী সাহেবের সাথে অত্যন্ত পরিচিত হন এবং অনেকে তরীকার অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু এ এলাকায় বসবাসকারী অন্য গোত্রের কিছু সংখ্যক ধনী লোক হাজী সাহেবের উক্ত স্থানে অবস্থান করা এবং তাঁহার মুরীদদের ঐ ঝরণার পানি ব্যবহার করা মোটেই পছন্দ করিত না। তাহারা হাজী সাহেবের সাথে তাজুখীল গোত্রবাসীদের গাঢ় সম্পর্ক দেখিয়া যদিও সরাসরি কিছুই বলিতে পারিতেছিল না কিন্তু এই চিন্তা সবসময়ই করিত যে, কোন একটি সুযোগ পাইলেই তাহারা হাজী সাহেব ও তাঁহার মুরিদদেরকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিবে। ঘটনাক্রমে একদিন একজন হিন্দু তহশিলদার ঘুরিতে ঘুরিতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। যেসব বিরোধী লোক সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তাহারা ফরিয়াদী হইয়া তহশিলদারের নিকট বলিলঃ একজন দরবেশ আমাদের বাপদাদাদের জমীন দখল করিয়া বসিয়া আছেন এবং তাহার সহিত একটি বিরাট দলও রহিয়াছে। তাহারা সকলে আমাদের ঝরণার পানি নষ্ট করিয়া দিতেছে। আমাদের কথায় তাহারা দখল ছাড়িতেছে না এবং এইখান হইতে যাইতেছে না। যদি আপনি এই দরবেশদেরকে এইখান হইতে বাহির করিয়া দেন তাহা হইলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব।

তাহাদের আদর যত্ন এবং এইসব বানোয়াট কথা ও চাটুবাক্যে তহসিলদার বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তৎখনাৎ তিনি অশ্বারোহী হইয়া অত্যন্ত দাপটের সহিত হাজী সাহেবকে খুব ধমকাইলেন এবং ক্ষমতার সুরে বলিলেনঃ ফকীর সাহেব, আপনি এইখান হইতে চলিয়া যান। হাজী সাহেব তাহার এই চমক ধমক দেখিয়া একটু নরম সুরে তাহাকে বলিলেনঃ শেখ সাহেব, আমরা এইখান হইতে যাইবনা। তহশিলদার হিন্দু ছিলেন। মুসলমানদের খেতাব "শেখ" সম্বোধনে তিনি আরও রাগান্বিত হইলেন

এবং আরো কঠোরভাবে বলিলেন, আপনাদেরকে এইখান হইতে যাইতেই হইবে। তাহার এরূপ ব্যবহারে হাজী সাহেবও একটু কঠোরভাবে বলিলেনঃ শেখ সাহেব, আমাদেরকে এইখান হইতে সরান যাইবেনা। তহসিলদার বারবার এই শেখ খেতাব সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না এবং চরম বেয়াদবির সাথে বলিলেনঃ আমি এখনই তোমাদেরকে জোরপূর্বক বাহির করিয়া দিব। ইহা শুনিয়া হাজী সাহেবও রাগান্বিত হইয়া বলিলেনঃ শেখ সাহেব, কাহারও এই শক্তি নাই যে আমাদেরকে এইখান হইতে সরাইয়া দিবে। এই কথা বলিবার সময় হাজী সাহেব তহসিলদারের দিকে জালালী দৃষ্টিতে তাকাইলেন। সংগে সংগে তহসিলদার ঘোড়ার পিঠ হইতে নীচে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। এই স্থানে হাফেজ সিরাজী (রঃ) ঠিক কথাই বলিয়াছেনঃ

بس تجربه کر دیم درین دار مکافات
بادرد کشان هر که درافتاد بر افتاد

অর্থাৎ এই ক্লেদাক্ত দুনিয়ায় আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। যে পতিত হইয়াছে সে উত্থিত হইয়াছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া তহসিলদারের সংগের দেহরক্ষী ও তহসিলদারকে আনয়নকারী গ্রামের সেই ধনী ব্যক্তিগণ ভীষণ ভয় পাইয়া গেল এবং তাহাকে ঐখান হইতে তুলিয়া বাড়ী নিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁহার হুঁস হইল, তখন অনুনয় বিনয়ের সাথে বলিলেন, আমাকে ফকীর সাহেবের কাছে লইয়া যাও। অগত্যা তাহারা তাঁহাকে হাজী সাহেবের কাছে নিয়া আসিল। হাজী সাহেবের কাছে আসিয়া সর্বপ্রথম তিনি নিজের বেয়াদবী ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করিলেন এবং বলিলেনঃ হুজুর আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি এই শর্তে যে, আমার তিনটি আকাংখা পূর্ণ হইতে হইবেঃ (১) আমার স্ত্রীও যেন মুসলমান হইয়া যায়, (২) আমি যেন আমার বাপদাদার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হই এবং (৩) আমার চাকুরীও যেন ঠিক থাকে। হাজী সাহেব বলিলেনঃ আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তোমার সকল আশাই পূর্ণ হইবে।

অতঃপর তহসিলদার মুসলমান হইলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। ওদিকে বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী খুবই অসুস্থ হইযা পড়িয়াছিলেন। সর্বপ্রকার চিকিৎসা গ্রহণের পরও তিনি সুস্থ হইলেন না। সেই অবস্থায় কোন এক ব্যক্তি তাহাকে "কালিমায়ে তৈয়েবা" পড়িতে বলিল। কালিমায়ে তৈয়েবার শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথেই তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। ইহার পর হাজী সাহেবের দোয়ায় তাঁহার বাকী ইচ্ছাসমূহও পূর্ণ হইয়াছিল। হজরত হাজী সাহেব তাঁহার নাম শেখ আব্দুল্লাহ্ রাখিলেন। এই ঘটনার দ্বারা হাজী সাহেব কেন তাঁহাকে বারবার শেখ সাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিলেন তাহার কারণও প্রকাশ হইয়া পড়িল। শেখ আব্দুল্লাহ্ আরো অনুরোধ জানাইলেনঃ মুসলমান হইবার পর পূর্বের বংশ পরিচয়ের সাথে আমার কোন সম্পর্ক

থাকিলনা। অতএব এই সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তখন হাজী সাহেব বলিলেন, আজ হইতে তোমার বংশ পরিচয় হইল ফকীর। সুতরাং তাঁহার বংশধরগণ আজ পর্যন্ত ফকীর উপাধিতে পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে ফকীর ফয়জুল্লাহ, ফকীর আবু সাঈদ, ফকীর আহম্মদ সাঈদ এবং ফকীর আবুল হাসান বিশেষভাবে পরিচিত। হজরত হাজী সাহেবের দোয়ায় আজ পর্যন্ত তাঁহাদের খান্দান ভালভাবে চলিয়া আসিতেছে।

গ্রামবাসীদের আগ্রহ

এই আশ্চর্যজনক কেরামত দেখিয়া সমস্ত গ্রামবাসী এমনকি বিরোধী ব্যক্তিরাও তাঁহার বুযুর্গী মানিয়া নিয়াছিল এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া হাজী সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সকল গ্রামবাসী এক বাক্যে হাজী সাহেবের শুভাগমন এবং অবস্থান করাকে নিজেদের জন্য মংগল ও বরকতের কারণ মনে করিল। এইভাবেই খানকায়ে আহমাদীয়া সায়ীদিয়ার ন্যায় হেদায়েতের একটি বিরাট কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই নাম আজ পর্যন্ত তাসবীহ খানার দরজায় মর্মর পাথরে লিখিত রহিয়াছে। এই কেন্দ্র স্থাপন প্রকৃতপক্ষে হজরত শাহ্ সাহেবের ভবিষ্যত বাণীর ফলস্বরূপ ছিল। ডেরা বাঁধার স্থান নির্বাচন করার প্রতি যে নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন, বর্ণিত সব কিছু তাহারই বরকত স্বরূপ।

তরীকার প্রচলন

হজরত শাহ্ সাহেবের উচ্চ ধ্যান অনুযায়ী হাজী সাহেবের মাধ্যমে এই অঞ্চলে হেদায়েতের যে বীজ রোপিত হইয়াছিল অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই তাহার ডালপালা চতুর্দিকের ব্যাপক অঞ্চলকে ছায়া দান করিয়াছে। ফারসী, পোস্ত এবং পাঞ্জাবী ভাষাভাষী প্রায় সকল এলাকার লোকই তাঁহার উপদেশ ও চিন্তাধারার দ্বারা লাভবান হইয়াছে। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খলীফাগণ এই মারেফাতের সাগরের দ্যুতিতে প্রত্যেক ভুখন্ডকে (যাহা অন্যায় ও অত্যাচারের আগুনে জ্বলিতেছিল) প্লাবিত করিয়াছিল। তাঁহার লক্ষাধিক ভক্ত ব্যক্তি খেলাফতের অনুমতিপত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই খলীফাগণ ঐ মারেফাতের বৃক্ষের ডালপালা স্বরূপ ছিলেন। ইহারা শরীয়তের সুফল এবং মারেফাতের রোশনীর দ্বারা হাজার হাজার মানুষকে অন্তর্লোকের নূর দান করিয়াছেন। এমনকি ঐ বৃক্ষের ডালপালা হইতে আরো চারা গজাইয়া ছায়াকে প্রশস্ত করিয়াছে এবং ফয়েজ দান করার ব্যাপারে আসল বৃক্ষের সাহায্যকারী হিসাবে প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন–

"আর সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা প্রশাখা উর্ধে বিস্তৃত"।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ

হাজী দোস্ত মুহাম্মদ কান্ধারী (রঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁহার খলীফা এবং অনুসারীদের সিলসিলা ব্যাপক আকারে কাবুল, কান্ধার, হিরাত এবং সীমান্ত জিলাসমূহ ও পাঞ্জাবের দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। হজরত শাহ্ সাহেবের কাছে হাজী সাহেব যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি খলীফাদের সংখ্যা একশতের মত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একান্তই বিনয়ী ছিলেন। নিজের মুরীদদের কথা আলোচনা করার সময় এই সংখ্যা বরকতময় মনে করিয়া লিখিয়াছেন। চিঠিখানা মুনাক্বেবে আহ্‌মদীয়া সায়ীদিয়া এবং তাহার মাকতুবাতের মধ্যে উল্লেখ আছে।

তরীকাপন্থীদের প্রশিক্ষণ

হজরত হাজী সাহেবের মুরীদদিগকে প্রশিক্ষন দেওয়ার ধরণ তেমনই ছিল যেমনটি তিনি হজরত শাহ্ সাহেবের সোহবতে থাকিয়া দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন।

নকসবন্দীয়া তরীকার আমল হইতেছে অজিফা এবং যিকির করার উপদেশ, দিবা ও রাত্রির ধ্যান, আভ্যন্তরীণ লতীফাসমূহের মোরাকাবা, ওয়াজ ও নসিয়ত, মুরীদদের অবস্থা অবগত হওয়া এবং তাহাদের প্রতি অধিক মমত্ববোধ, আগ্রহ-উৎসাহ প্রদর্শণ, তরীকা প্রচলনে সতর্কতা অবলম্বন এবং সংস্কার ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উষ্ণতা রক্ষন। মোট কথা, যত রকমের সৌন্দর্য্য এবং গুণ একজন পীরে কামেল এবং বুযুর্গ ব্যক্তির মধ্যে থাকা প্রয়োজন তাহার সকলই হাজী সাহেবের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। মুরীদদিগকে তাঁহার লংগরখানা হইতে দুই বেলা আহার দেওয়া হইত। সত্য অন্বেষণকারিগণ সর্ব প্রকারের পার্থিব অশান্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া মারেফাত শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত থাকিতেন। পবিত্র ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলা এবং বিদায়াত হইতে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকা এই সিলসিলার অবশ্য কর্তব্য কাজ। তাঁহার বুযুর্গির একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, মুরীদগণ সর্বদা সতর্ক অবস্থায় থাকিতেন এবং কেহই নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিতেন না। কখন কখন তিনি মুরীদদের কক্ষে গিয়া তাহাদের জামা-কাপড়, পানাহারের পাত্রসমূহ ও বই পুস্তক পর্যন্ত দেখাশুনা করিতেন যাহাতে কোন কাজ তরীকার নিয়মাবলী এবং খানকার শৃংখলার পরিপন্থী না হয়। কেননা, উহা একাগ্রতা বিঘ্নিত হইবার কারণ হিসাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তরীকার মৌলিক বিষয়াদির মধ্যে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, পীর সাহেব তরীকাপন্থীকে যে সব নিয়ম ও শৃংখলা রক্ষার আদেশ করেন তাহাতে যেন একচুল পরিমান এদিক ওদিক না হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং অন্যান্য ফরজ, সুন্নত আদায় করার পর, ধ্যান ও ধারণার

যাবতীয় যোগ্যতা নিজের দায়িত্ব পালনের কাজে ব্যয় করিতে হইবে। ইহাতে একাগ্রতা এবং সর্বপ্রকার বাতেনী (গুপ্ত) গুণ হাসিল হয়। লংগরখানা হইতে সাধাসিধা খানা দেওয়া হইত, তাহা মোটামুটি যথেষ্টই ছিল। তাছাড়া অল্প আহার, অল্প কথা,অল্প নিদ্রা, অল্প মেলামেশা ইত্যাদি খানকা শরীফের মৌলিক আদর্শের অন্তর্গত।

একটি ঘটনা

স্বাস্থ্যবান একজন আফগানী যুবক মুরীদ ছিল। লংগর খানার খাবার গ্রহণ করার পরও তাহার ক্ষুধা থাকিয়া যাইত। এ কারণে সে কিছু গমজাতীয় খাবার ভাজি করিয়া নিজের কাছে রাখিত এবং খুব বেশী ক্ষুধা অনুভব করিলে উহা হইতে কিছু খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিত। ঘটনাক্রমে একদিন হাজী সাহেব মুরীদদের কক্ষ পরিদর্শন করিতে গেলেন। হাজী সাহেবের একজন বিশিষ্ট খাদেম খাজা মুহাম্মদ ওসমান (রঃ) তাড়াতাড়ি ঐ যুবক মুরীদের কাছে আসিয়া বলিলেন, হুজুর আসিতেছেন। যুবক সংগে সংগে সেই গম ভাজির ব্যাগটি লুকাইয়া ফেলিল যাহাতে হাজী সাহেব ইহা দেখিয়া তাহাকে অধৈর্য্য ভাবিয়া দুঃখিত না হন। এই ঘটনা বর্নণার উদ্দেশ্যঃ এই বিষয়টিও খানকা শরীফের আদবের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, মুরীদগণকে লংগরখানা হইতে যে পরিমান খানা দেওয়া হয়, তার উপরই তাহাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। স্বল্প আহারে নিজেকে অভ্যস্ত করা উচিৎ এই কারণে যে, ভর পেট আহার এই পথে একান্ত ক্ষতিকর এবং আল্লাহর পরিচয় লাভে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণও ইহাই। শেখ সাদী (রঃ) বলেনঃ

উদর পূর্তি খেয়োনা, তবেই অন্তরে তুমি মারেফাতের নূর দেখিবে।

রচনাদির সম্পাদনা

হজরত হাজী সাহেবের সম্পাদনার মধ্যে আমাদের কাছে এখন দুইটি মজমুয়া সংকলন আছে। তাঁহার পীর হজরত শাহ্ আহ্মদ সাঈদ সাহেব দেহলবী এবং অতঃপর মুহাজীরে মাদানী কুদ্দুসু সিররূহু হাজী সাহেবের নামে যেসব বিষয় লিখিয়াছেন, হাজী সাহেব তাহা বরকতের নিয়াতে একত্রিত করিয়া একটি সংকলনে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে পীর এবং মুরীদদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা যায়। এই সংকলনে তরীকা সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান কথা লিপিবদ্ধ আছে যাহা অন্তরকে তৃপ্ত ও সঞ্জীবিত করে। দ্বিতীয় মজমুয়া তাঁহার নিজস্ব উপদেশ, স্মৃতি এবং তরীকা শিক্ষা বিষয়ক লেখার সংকলন । এগুলি তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার পীর এবং প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং মুরীদ ও মোখলেসীনের কাছে লিখিয়াছিলেন। প্রথম মজমুয়া মাকাতীবে হজরত শাহ আহমদ সাঈদ হজরত হাজী সাহেবের নামে লেখা। গ্রন্থটি মাওলানা সাইয়েদ জাওয়ার হোসাইন সাহেব নকশবন্দীর পরিচিত একজন প্রফেসর ডঃ গোলাম হোসাইন সাহেব তুহফায়ে জাওয়ারীয়া নামে হায়দারাবাদ সিন্ধু হইতে

প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। দ্বিতীয় মজমুয়া ৩১টি রচনার সমষ্টি। হজরত মুফতী আতা মুহাম্মদ সাহেব (গ্রাম চৌধওয়ান জিলা ডেড়া ইসমাঈল খান) কোন এক স্থানে ইহা পান এবং হাফেজ নাসরুল্লাহ খান খাকওয়ালী সাহেবের সাহয্যে মুদ্রিত করেন। গ্রন্থের দুই খন্ডই ফার্সী ভাষায় লিখিত। ভাষা অত্যন্ত সুন্দর, সহজ ও বিশুদ্ধ। সামান্য ফার্সী জানা ব্যক্তি ইহা পাঠান্তে ইহার গুণ ও রহস্য অবগত হইতে এবং তরীকার পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

শেষ আবেদন

মহা সম্মানিত হজরত দোস্ত মুহাম্মদ কান্ধারী (রঃ) এর জীবন চরিত্রের ইহা একান্তই একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র। আমি (লেখক) মানাকীকে আহ্মদীয়া সঈদীয়া এবং অন্যান্য মোকাতীব ও পুস্তিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া কতিপয় নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অতিরিক্ত সম্পূরকের সাথে এই গ্রন্থে সাজাইয়াছি। ইহাকে হজরতে আলার জীবন চরিত আখ্যায়িত করা অন্যায় ও দুঃসাহসিকতার শামিল হইবে। বরকতময় কিতাব তুহ্ফায়ে সা'দিয়া গ্রন্থের মূল উৎসের সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা অতিরিক্ত বরকতের অধিকারী হওয়াই বর্তমান উদ্দেশ্য। অন্যথায় হজরত হাজী সাহেব (রঃ) এর আভ্যন্তরীণ অবস্থা,মারেফাতের পরিচয় এবং বিভিন্ন হাল অবস্থা তুলিয়া ধরিবার জন্য অনেক সময় এবং বিরাট দফতর প্রয়োজন। তবে এই বাক্যঃ

مَالَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

" যে সম্পূর্ণ অর্জন করিতে পারেন সে সম্পূর্ণ বর্জনও করিতে পারেন "

অনুযায়ী আমি অতি নগন্য ব্যক্তি যতদূর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতেও তরীকায়ে পাকের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণকারীদের জন্য চোখের সান্তনা এবং অন্তরের তৃপ্তির প্রচুর উপাদান বিদ্যমান আছে।

——— ० ———

হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানী (রঃ) এর জীবনের বর্ণনা

হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান কুদ্দুসু সিররুহ তাঁর জন্মভূমি লুনীতে ১২৪৪ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত পরিবারের এক কৃতি সন্তান। তাঁহার পিতা একজন সম্মানিত আবেদ সাধক এবং মর্যাদাবান মুফতী এবং নিজ দেশে ফকীহে লুনী উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা তিনি বাড়ীতেই অর্জন করেন। বিবেকবান হওয়ার পর পিতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি দেশের বাহিরে অন্য মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য গমন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আরবী সরফ নাহু শিক্ষা সমাপনান্তে আরবী ও ফার্সীতে পারদর্শিতা লাভ করেন। কিন্তু এখানে শিক্ষা সমাপ্তির পূর্বেই মারেফাতের আকর্ষণ তাঁহাকে মাদ্রাসা হইতে খানকায় নিয়া আসে। নিম্নে বর্ণিত ঘটনায় তার সূত্রপাত ঘটে।

মাদ্রাসা হইতে খানকা

তাঁহার বড় ভাই আখুন্দ মুহাম্মদ সাঈদ সাহেব খুয়ী বাহারা গ্রামে তাঁহার মামা মাওলানা নিজাম উদ্দিন সাহেবের নিকট লেখাপড়া করিতেন। মাওলানা নিজামউদ্দিন সাহেব ছিলেন হজরত হাজী দোস্ত মুহাম্মদ কান্ধারী (রঃ) সাহেবের মুরীদ। একবার তিনি তাঁহার বড় ভাই মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের জামা কাপড় নিয়া খুয়ী বাহারা গ্রামে গেলেন। তাঁহার মামা নিজাম উদ্দিন সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আমার পীর হজরত হাজী সাহেবের কাফেলা চৌধওয়ান গ্রামের নিকট অবস্থান করিতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আমি তাঁহার পরিচিত নই। তিনি কোন পীর সাহেব এবং কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও আমি জানি না।

খুয়ী বাহারা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় মামা তাঁহাকে বলিলেনঃ তোমার বাড়ী যাওয়ার পথে চৌধওয়ান অতিক্রম করিতে হইবে এবং চৌধওয়ানের নিকটেই হাজী সাহেবের কাফেলা অবস্থান করিতেছে। তুমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আমার সালাম জানাইবে এবং এই সংবাদ দিবে যে খুয়ী বাহারায় বাসকারী হুজুরের খাদেমগণ আগামীকাল তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইবেন। হজরত খাজা মুহাম্মাদ ওসমান (রঃ) বলেনঃ আমি বাড়ী যাওয়ার পথে চৌধওয়ার নিকট গিয়া গমনকালে আশেপাশের গ্রামবাসীর কাছে হাজী সাহেবের কাফেলার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, হজরত এখানেই অবস্থান করিতেছেন। আমি হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হইয়া মামার সালাম ও সংবাদ পৌঁছাইলাম। অতঃপর সেখান হইতে বিদায় নিয়া নিজ শিক্ষা অর্জনের কাজে ব্যস্ত হইয়া গেলাম।

কিছুদিন পর আল্লাহকে পাওয়ার আগ্রহ আমার অন্তরকে উতলা করিয়া তুলিল। ঐ সময় আমি ফেকা শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হেদায়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার আকাংখা এত তীব্র হইয়াছিল যে, সব সময়ই আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলাম। পড়াশুনাও করিতে পারিতেছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহকে পাওয়ার আগ্রহের নিকট আমি নিঃসার হইয়া আমার সম্মানিত ওস্তাদের নিকট বলিলাম ঃ আমার পক্ষে লেখাপড়া চালাইয়া যাওয়া মুসকিল হইয়া পড়িয়াছে। আল্লাহর মুহাব্বত দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি যে, আপাততঃ লেখাপড়া স্থগিত রাখিয়া কোন আল্লাহওয়ালার নিকট উপস্থিত হইয়া বাইয়াত গ্রহণ করিব। ইহাতে আমার মনের অবস্থার হয়ত পরিবর্তন হইবে। আমার সম্মানিত শিক্ষক এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং সিদ্ধান্ত দিলেনঃ হেদায়া কিতাবের যে অংশটুকু বাকী রহিয়াছে তাহা শেষ করিয়া লও। অতঃপর আমিও তোমার সাথে যাইব। এবং আমরা উভয়েই কোন আল্লাহওয়ালার নিকট যাইয়া বাইয়াত হইব। আমি বলিলাম ঃ হুজুর হেদায়া শেষ হইতে অনেক দিন লাগিয়া যাইবে, আমার মন ভীষন অস্থির, তাই সিদ্ধান্ত নিয়াছি যে, আগামীকাল সকালেই আমি হাজী সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বাইয়াতের আবেদন করিব। হজরত দামানী সাহেব আরো বলেনঃ আমার সম্মানিত শিক্ষক আমাকে অনেক বাধা দিয়াছিলেন কিন্তু আমি তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। আমি পরের দিন খুব সকালে মাদ্রাসা হইতে রওয়ানা হইয়া গেলাম এবং সোজা চৌধওয়া পৌঁছিলাম। তখন হাজী সাহেব তাঁহার কাফেলা সহ চৌধওয়া হইতে দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব শুক্রবার ৯ই জমাদিউস্‌সানী ১২৬৬ হিজরীতে আমি হাজী সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আছরের সময় বাইয়াতের আবেদন করিলাম। কিন্তু হাজী সাহেব সাবধান করিয়া বলিলেনঃ ফকীরী অবলম্বন করা বড়ই কঠিন কাজ। তবুও আমি বারবার অনুরোধ করিলাম ঃ হুজুর আমিতো ফকীরী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি। আমি মনের টানে অপারগ হইয়া সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া আপনার কাছে উপস্থিত হইয়াছি। এই কথা শুনিয়া হজরত বলিলেনঃ ঠিক আছে, মাগরীবের নামাজের পর দেখা যাইবে।

আলাহামদু লিল্লাহ, মাগরীবের নামাজের পর তিনি আমার আবেদন মঞ্জুর করিয়া আমাকে মুরীদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তখন আমার মনের অবস্থা যে কি হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

অন্তর্দৃষ্টি

ইল্‌মে সরফ, নাহ, ইল্‌মে আকায়েদ, ফেকাহ, অসুলে ফেকাহ এবং তাফসীর ও হাদীছের যেসব কিতাব আমি ইতিপূর্বে পড়িয়াছিলাম, তাহা স্মরণে ছিল এবং তাহার বিষয়বস্তুও জানা ছিল। কিন্তু দৃষ্টি কখনও প্রকাশ্য শিক্ষার উর্ধে যাইত না। সেই কারণে

হজরত হাজী সাহেব মেহেরবানীপূর্বক আমাকে দ্বিতীয়বার তাফসীর, হাদীছ ও তাসাওউফের কিতাবসমূহ পড়াইতে শুরু করিলেন। অর্থাৎ যেই শিক্ষা গ্রহণের ধারা আমার স্থগিত হইয়া গিয়াছিল তাহা শুধু পুনরায় চালুই হয় নাই বরং প্রকাশ্য বিদ্যা অর্জনের সাথে সাথে মারেফাতের বিষয়াদিও তিনি আমাকে পরিষ্কার বুঝইয়াছিলেন। কাজেই হাজী সাহেবের নিকট নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসা ও গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিঃ মিশকাত শরীফ , সিহাহ্ সিতা অর্থাৎ বুখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, তিরমীজি শরীফ, আবুদাউদ শরীফ, নিসায়ী শরীফ, ইবনে মাযাহ শরীফ, ইলমে আখ্‌লাকের মধ্যে আহ্ইয়াউল উলুম (কামেল) তাফসীরের বাগভী (কামেল), ইলমে তাসাওউফের মধ্যে মাকতুবাতে মুজাদ্দেদীয়ার তিন অধ্যায় এবং মাকতুবাতে মাসুমিয়াহ তিন অধ্যায়। ইহা ছাড়াও তিনি আমাকে তাসাওউফের একাধিক পুস্তিকা এবং কিতাব বিশেষ যত্ন সহকারে পড়াইয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ, হজরতে ওয়ালার মেহেরবানীতে আমার অন্তর জাগতিক জ্ঞানার্জনের পর্যায় অতিক্রম করিয়া মারেফাতে ইলাহীর পূর্ণ ইয়াকীনের স্তরে পৌঁছিয়াছে।

মিশকাত শরীফ পাঠের সময়ের একটি ঘটনা

মিশকাত শরীফের সবক (পাঠ) যখন কিতাবের বুয়ু পর্যন্ত পৌঁছাইল তখন হজরত হাজী সাহেব (রঃ) বলিলেনঃ মোল্লা ওসমান, কিতাবুল বুয়ুও পড়িবে কি? উত্তরে আমি বলিলামঃ হজরত, আমার নিকট কোন নগদ টাকা পয়সা ও ধন সম্পত্তি নাই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার বেচাকেনার তেমন কোন প্রয়োজন দেখা দিবে না। হাজী সাহেব বলিলেনঃ খুব ভাল কথা। আমার কাছেও দুনিয়ার ধনসম্পদ নাই এবং তোমার কাছেও নাই। অতএব মানুষের সাথে আমাদের বেচাকিনা ও লেনদেনের সুযোগ হইবে না। অতঃপর তিনি এই কবিতাটি পাঠ করিলেন।

علم کثیر آمدو عمرت قصیر=آنچہ ضروری ست بران شغل گیر

অর্থাৎ, বিদ্যা অনেক প্রকার এবং তোমার আয়ু সংক্ষিপ্ত। অতপর যাহা শিক্ষা করা জরুরী, তাহাতে মনোনিবেশ কর। সুতরাং তিনি কিতাবুল বুয়ু বাদ দিয়া কিতাবুল আদব আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পীরের উদারতা এবং মুরীদের মেধা

হজরত খাজা ওসমান (রঃ) বলেন, এক দিন হাজী সাহেব আমাকে প্রশ্ন করিলেনঃ ওহে মোল্লা ওসমান, তোমার সেই দিনের কথা মনে আছে কি, যেদিন তুমি তোমার মামা মাওলানা নিজাম উদ্দিনের সালাম এবং খবর পৌঁছাইবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলে? আমি বলিলাম, হজুর খুব মনে আছে। হাজী সাহেব বলিলেনঃ আমি

ঐ দিনই তোমার চেহারায় নকশবন্দীয়া তরীকার সম্পর্কের নূর দেখিয়াছিলাম এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তুমি নিশ্চয়ই আকাবেরে নকশবন্দীয়ার মহান সম্পর্কের দ্বারা ধন্য হইবে। কিন্তু যখন অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল এবং তুমি আসিলেনা, তখন আমি মনে করিলাম যে, আমার ধারণা হয়ত ভুল হইয়াছে। যখন তুমি এইখানে পৌঁছিলে, তখন আমার সেই কাশফের সত্যতা প্রমাণিত হইল।

পীরের সান্নিধ্য এবং খেদমত

হজরত খাজা ওসমান (রাঃ) বাইয়াতের পর হজরত হাজী সাহেব কেবলার সাথে এমন গভীরভাবে সম্পর্কিত হইয়াছিলেন যে, বাহিরে এবং বাড়ীতে সর্বদা সাথে সাথেই থাকিতেন এবং হাজী সাহেব যখন ১২৮৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন তখন তাঁহার পীরের খেদমতে অতিবাহিত করার মোট সময় হইয়াছিল ১৮ বৎসর ৪ মাস ১৩ দিন।

পীর ও মুরীদের পারস্পরিক সম্পর্ক

পীর ও মুরীদের মধ্যে স্থাপিত গভীর ভালবাসার অন্তর্নিহিত কারণেই তাঁহারা পরস্পর কখনও পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হন নাই। হজরত খাজা ওসমান (রাঃ) যেরূপ আন্তরিকতা ও আনুগত্যের সাথে হজরত হাজী সাহেবের সুহবাতে বা সান্নিধ্যে থাকিয়া সর্বপ্রকার খেদমত করিয়াছেন, তাহার কোন তুলনা দৃষ্টিগোচর হয়না। অপর দিকে এই আয়াত প্রণিধাণযোগ্যঃ

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

অর্থাৎ, সৎকর্মের সুফল ব্যতীত হয় কি হে প্রতিদান। তার উপর হাজী সাহেবের ভালাবাসা এবং স্নেহ ছিল। তাহাতে তিনি মুরীদদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। মুরীদ যখন পীরের জন্য সব কিছু বিলাইয়া দেয় তখন এই ত্যাগের দ্বারা স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়। মুরীদ পীর ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি অনুরাগী হওয়াকে সম্মানের ব্যাঘাত মনে করে এবং পীর সাহেবগণও ইহা পছন্দ করেন না যে, মুরীদ অন্যের দিকে অগ্রসর হইয়া আসলের আন্তরিকতা হইতে বঞ্চিত হোক।

একটি কঠিন পরীক্ষা

নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় জানা যায়, হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান শিক্ষা জীবন শেষে যখন মারেফাত শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিলেন, তখন একদিন তাঁহার পীর হাজী দোস্ত মুহাম্মদ কান্ধারী (রঃ) তাঁহার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী (অর্থাৎ মুরীদদের ঘরে ঘরে গিয়া খোঁজ খবর নেওয়া) খাজা মুহাম্মদ ওসমানের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সে সময় তিনি ঘরে ছিলেন না। কিন্তু দুইখানা কিতাব সেখানে পাওয়া গেল। হজরত কান্ধারী (রঃ) কক্ষের অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এই কিতাবগুলি কার? সে বলিল, ইহা মোল্লা মুহাম্মদ ওসমানের। ইহা শুনিয়া হজরত হাজী সাহেব বলিলেনঃ

কি আশ্চর্য, মোল্লা ওসমানের জন্য আমিও আছি এবং এই কিতাবও! সোবাহানাল্লাহ! একজন অতি সুন্দর একটি কথা বলিয়াছেনঃ

من توشرم تومن شری من تن شرم تو جان شری
تاکی نگوید بعد از ین من دیگرم تودیگری

অর্থাৎ, আমি তোমাতে একীভূত হইয়াছি এবং তুমি আমাতে এক হইয়াছ। অতঃপর কেহই বলিতে পারিবেনা যে, আমি একটি ভিন্ন সত্তা।

হাজী সাহেবের এই অপ্রকাশ্য মনঃকষ্টের ফলে তাঁহার সম্পর্ক স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর খাজা ওসমান নিজের বাতেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেকে সম্পর্কচ্যুত দেখিলেন এবং ইহার কারণও জানিতে পারিলেন। কিন্তু হজরতের জালালীয়াতের সম্মুখে ইহার প্রকাশ এবং ওজর আপত্তি করার সাহস হইল না। আনুগত্য ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সকল খেদমত পূর্বের ন্যায়ই করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই অবস্থার মধ্যেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। খেদমতের মধ্যে নিয়ম নিষ্ঠার কোনই ত্রুটি ছিলনা, তথাপি মনের মধ্যে সর্বদা একরূপ অস্থিরতা ও কষ্ট বিরাজ করিতেছিল। অন্তর্দ্বন্দ্বের এই অবস্থা যাহার মধ্যে দেখা দেয় কেবল সেই ইহার যাতনা বুঝিতে পারে। তবু তিনি এই দুঃখ অন্তরে ধারণ করিয়া কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করেন নাই।

একদিন তাহাজ্জুদ নামাজের পর ঠিক সেহরীর সময় তিনি নিজের অজ্ঞাতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সংগী ইহার কারণ জানার জন্য অনেক আবেদন সত্ত্বেও খাজা সাহেব (রঃ) উহা গোপন রাখাই উচিৎ মনে করিলেন। কিন্তু সংগীর একান্ত পীড়াপীড়িতে তিনি বাধ্য হইয়া ইংগিতে প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া বলিলেনঃ হজরত কেবলা যে নেয়ামত আমাকে দিয়াছিলেন তাহা আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। অনেক দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিয়াছি, কিন্তু আজ দুঃখ ও অনুতাপের অনুভূতি অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা শুনিয়া সাথীর অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে, খাজা ওসমান ইতিমধ্যেই তরীকার সকল স্তর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। খাজা সাহেবের এই ব্যথাপূর্ণ চীৎকার তাঁহাকেও ব্যথিত করিয়াছিল। তাই একদিন তিনি সুযোগ মত হজরত হাজী সাহেব কেবলার নিকট মোল্লা মুহাম্মদ ওসমানের জন্য সুপারিশ করিয়া বলিলেন, হজরত আমার কক্ষের সাথীর উপর একটু নেক দৃষ্টি দিলে ভাল হয়।

ইহা শুনিয়া হাজী সাহেবের মুখমন্ডলে জালালীয়াতের চিহ্ন প্রকাশ পাইল এবং বলিলেনঃ তুমি আমার ও মোল্লা ওসমানের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি কে? আমাদের ব্যাপারে তোমার কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই ঘটনার বর্ণনার মধ্যে ইহা উল্লেখ আছে

যে, সুপারিশকারীর নিজ কর্মের ফল এই দাঁড়াইল যে, মোল্লা ওসমানের সম্পর্ক তো বহাল হইয়া গেল কিন্তু তিনি নিজে সম্পর্কচ্যুত হইলেন। এই কারণেই বুজুর্গ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, ফানাফিস্ শায়েখ প্রকৃতপক্ষে ফানা ফিল্লার সূচনা বা ভূমিকা স্বরূপ। পীর ও মুরীদদের মধ্যে যে পর্যন্ত একটি বিরাট ও মজবুত আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত না হয়, সে পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান (রঃ) হজরত হাজী সাহেবের খেদমতে ব্রতী ছিলেন, যা কেবল ভাগ্যবান মুরীদের পক্ষেই সম্ভব। হজরত খাজা সাহেব সেই দুর্গম পথ অতি সাবধানতার সহিত এবং ত্যাগের মাধ্যমে অতিক্রম করিয়াছেন।

একবার হাজী সাহেব তাঁহার স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে খাজা মুহাম্মদ ওসমানকে বলিলেনঃ ডেরা ঈসমাইল খানে অমুক হাকীম সাহেবের নিকট রুগীর অবস্থা বলিয়া ঔষধ নিয়া আস। যদিও ঐ সময় দিনের অল্প অংশই বাকী ছিল এবং রাত্রি নিকটবর্তী ছিল, রাস্তা ছিল অসমতল এবং দুর্গম, তদুপরি ডেরা ঈসমাইল খানের দূরত্ব ছিল ৩২ মাইল, তা সত্বেও তিনি আদেশ পাওয়া মাত্র রওয়ানা হইলেন। সারা রাত্রি হাঁটিয়া খুব সকালে ডেরা ঈসমাইলে পৌঁছিলেন এবং হাকীম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া ঔষধ লইয়া তখনই রওয়ানা হইলেন এবং রাস্তার সকল কষ্টকে উপেক্ষা করিয়া মুসাযায়ী শরীফের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন।

এদিকে হাজী সাহেব অর্ন্তদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে মনোনিবেশ করিয়া বলিলেন ঃ হায় আফশোস, আমি মোল্লা ওসমানকে ভীষণ কষ্ট দিলাম, জানিনা পথে তাঁহার কত রকম কষ্ট হইতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোল্লা ওসমান সাহেব উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ ৬৪ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করার পরও তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল মনে হইতেছিল এবং তাঁহার মধ্যে কোনরূপ ক্লান্তি ও দুর্বলতার লক্ষণই ছিলনা। কবি হাফিজের এই কবিতা তাহার ব্যাখ্যা স্বরূপঃ

دررہ منزل لیلے کہ خطرھا ست بجان = شرط اول قدم
آنست کہ مجنون باشی

অর্থাৎ লায়লার প্রেমের পথে এমন সব আশংকা আছে যাহা জীবনের প্রতি হুমকী স্বরূপ। অতএব এ পথে যাত্রার প্রথম পদক্ষেপের জন্য শর্ত হইতেছে দিওয়ানা হওয়া।

অপর দিকে একটি সাধারণ খেদমতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কিভাবে তাহা বড় বড় খেদমতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে। এক রাত্রে হজরত হাজী সাহেব কেবলা খানকা শরীফে নিদ্রারত ছিলেন এবং খাজা মুহাম্মদ ওসমান এক কোণায় দিয়াশলাই হাতে লইয়া জিকির এবং মোরাকাবার অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। তিনি এ কারণে জাগ্রত ছিলেন যে, হজরত যে কোন সময় জাগরিত

হইতে পারেন। ঠিক তাহাজ্জুদের সময় হাজী সাহেব জাগ্রত হইলেন এবং " মোল্লা ওসমান" বলিয়া ডাক দিলেন। তিনি জ্বি হুজুর বলিয়া সাথে সাথেই বাতি জ্বালাইলেন। ইহাতে হজরত হাজী সাহেব খুব খুশি হইলেন এবং খেদমতের এই সতর্ক অবস্থা দেখিয়া বলিলেনঃ মোল্লা ওসমান, তুমি অনেক কঠিন এবং ধৈর্যপূর্ণ খেদমত আনজাম দিয়াছ। কিন্তু তোমার এই খেদমত সকল খেদমতকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। হজরত হাজী সাহেবের পক্ষ হইতে রাজী ও খুশির এই বহিঃপ্রকাশ খাজা মুহাম্মদ ওসমানকে যেরূপ রূহানী অবস্থা ও স্থায়ী খুশি দান করিয়াছে তাহা কেবল তাঁহার অন্তরই জানে।

খুশির এই বাক্য প্রমাণ করিতেছে যে, হজরত হাজী সাহেব কেবলা ঐদিন তাঁহার দান এবং দয়ার সম্পর্ক পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা, খাজা মুহাম্মদ ওসমান (রঃ) তাঁহার পীরের সহিত ভালবাসা, খেদমত এবং ত্যাগের মাধ্যমে শুধু তরীকায়ে নকশবন্দীয়াই নয় বরং কাদেরিয়া, চিস্তিয়া, সোহরাওরদীয়া, কুবরোভীয়া, কলন্দারীয়া এবং মাদাতরীয়াতে খেলাফত এবং জমানীতের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

স্থলাভিষিক্ততা

হাজী দোস্ত মুহাম্মাদ কান্ধারী (রঃ) এর খলীফাদের মধ্যে হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান সাহেবই প্রধান ছিলেন। তিনি ছিলেন মারেফাতের সকল গুণে গুণান্বিত। এই জন্যই হজরত হাজী সাহেব কেবলা জীবনের শেষ সময় তাঁহাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া একাধিক খানকা শরীফের দেখাশুনার দায়িত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। তন্মধ্যে মুসাযায়ী শরীফ এবং খোরাসানের খানকাসমূহ ছাড়াও অন্যগুলিও শাহ আহমদ সাঈদের হিজরাতের সময় হাজী সাহেবের হাতে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ১২৮৭ হিজরীতে হজরত হাজী সাহেব কেবলার ইন্তেকালের পর তিনি স্থায়ীভাবে সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার সহিত নিজের উপর অর্পিত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর পর্যন্ত তরীকায়ে আলীয়ার প্রসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং অগনিত মানুষকে নিজ ফয়েজ ও বরকতের দ্বারা ধন্য করেন।

কতিপয় উপদেশমূলক বাণী

প্রথম বাণীঃ হজরতে সানী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করেনঃ হজরত আলা মাওলানা আবুস সায়াদ আহমদ কুদ্দুসু সিররুহ বলেনঃ একবার হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান (কুদ্দুসু সিররুহ) বাড়ীর বাহিরে তাশরীফ আনিলেন এবং আমি (আবুস সায়াদ আহমদ খান) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান তখন উপদেশ ছলে বলিলেন, "মৌলভী সাহেব, যৌবন কালকে পুরস্কার মনে করা উচিত কারণ ইহার মধ্যে মানুষ কষ্ট করিতে পারে। বার্ধক্যে পৌছাইলে কিছুই করা যায় না। আমাকে দেখ; চোখের দৃষ্টি কমিয়া যাওয়াতে এই অবস্থা হইয়াছে যে

রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া অনেক খুঁজিয়া পাহাড়ী ঝরণার কাছে পৌছাইতে পারি নাই অথচ ঝরণাটি ঘরের সামনেই অবস্থিত এবং প্রত্যহ যেখানে আমি ওজু করি। অতঃপর অপারগ হইয়া ছোট বউকে ডাকিলাম। তিনি আলো জ্বালাইলে ঝরণা দেখিতে পাইলাম।

তিনি দুনিয়া সম্বন্ধে আরো বলিলেনঃ যে সকল পীরের অন্তরে কোন ধনী ও জমিদার ব্যক্তিকে দেখিয়া এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এই ধনী ব্যক্তি আমার মুরীদ হইলে খুবই ভাল হইত, সে সব পীর ঐরূপ ধারণা পোষণ করার ফলে কাফের হইয়া যায়। কেননা, তরিকার দাবী হইল ফকীরি অবলম্বন করা এবং দুনিয়া হইতে দূরে থাকা।

দ্বিতীয় বাণীঃ মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব (রঃ) একবার কিতাব পড়া এবং পাঠ্যদান হইতে মন উঠিয়া যাওয়ার অভিযোগ পেশ করিলেন। তখন হজরত খাজা ওসমান বলিলেনঃ নিয়াতের মধ্যে কোন গন্ডগোল মনে হইতেছে। নতুবা নকশবন্দীয়া তরীকায় খালেস (অকৃত্রিম দৃঢ়) নিয়াতের সহিত ধর্মীয় কিতাবের পড়াশুনা তরীকার সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করিয়া দেয় এবং উহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জিত হয়।

তৃতীয় বাণীঃ মাওলানা আকবর আলী বিভিন্ন সময় হজরত খাজা ওসমানের পক্ষ হইতে চিঠি পত্রের উত্তর লিখিতেন। তিনি বলিতেছেনঃ একবার আমি হজরত ওয়ালার পীর ভাই পীর লাল শাহ্ এর ইন্তেকালের উপরে হজরত খাজা (রঃ) এর পক্ষ হইতে শোক বাণীতে এই কথা লিখিয়াছিলাম যে, এই মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা এত দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছি যে তাহা ভাষায় লিখিয়া ও বলিয়া শেষ করা যাইবে না। অন্তরে এমন আগুন জ্বলিতেছে যাহা কখনো নিভান সম্ভব নয়। হজরত খাজা সাহেব এই লেখা পড়িয়া আকবর আলী সাহেবকে বলিলেনঃ যাহা অতিরঞ্জিত এবং প্রকৃত পক্ষে সত্য নয়, তাহা কখনো লেখা উচিৎ নয়। অতঃপর উক্ত লেখার স্থলে নিজ হাতে তিনি লিখিলেনঃ নিশ্চয়ই হজরত লাল শাহ্ সাহেবের মৃত্যু একটি বিরাট দুর্ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা মরহুমকে জান্নাতবাসী করুন এবং আমাদের মুরুব্বীদের দোয়ার উসিলায় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার পরিবারবর্গকে ফয়েজ ও বরকতের দ্বারা ধন্য করুন। আমিন।

অতঃপর তিনি বলিলেনঃ আমিও হজরত হাজী সাহেব (রঃ) এর পক্ষ হইতে চিঠি পত্রের উত্তর লিখিতাম। একবার আমি গল্লায়ে শুতরান এর পরিবর্তে উর্দানাজাত লিখিয়াছিলাম। হজরত হাজী সাহেব কেবলা আমাকে সাবধান করিয়া বলিলেনঃ যে কথা সকলে বুঝিতে পারেনা তাহা কখনো লিখিবেনা। ভবিষ্যতে ইহার প্রতি নজর রাখিবে।

চতুর্থ বাণীঃ হজরত খাজা ওসমান বলিলেনঃ খানকা যিকির করিবার স্থান, কিতাব বাড়ীতে বসিয়া পড়া উচিৎ। অবশ্য উহা তেমন কিতাব হইবে যাহা (মুরীদের অবস্থার সহিত) সম্পর্কযুক্ত এবং পীর সাহেব আদেশ করেন।

অন্তর্দৃষ্টি এবং কেরামাত

মাজমুয়ায়ে ফাওয়ায়েদে ওসমানীতে হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানী (রঃ) এর অন্তর্দৃষ্টি ও বুজুর্গির আলোচনা বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। আমরা এখানে মাত্র দুইটির উল্লেখ করিতেছি। (১) একদিন এশার নামাজের সময় হজরত খাজা সাহেব মাওলানা হোসাইন আলী সাহেবকে বলিলেনঃ মাওলানা সাহেব, আপনি আপনার বাড়ীতে যান এবং পুনরায় চলিয়া আসুন। এই সময়ের মধ্যে (আপনার সহিত) সে সকল ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহা ইনশা আল্লাহ আমি সম্পূর্ণভাবে আপনাকে বলিয়া দিব। একটি ঘটনাও ভুল হইবেনা। তাহার ইতস্ততা দূর করার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার ইহাও বলেনঃ মাওলানা সাহেব, আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবাণীতে ওলী আল্লাহগণ সব কিছুই জানেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার অনুমতি নাই।

مصلحت نست كه از پرده برون افترراز

ورنه مجلسى را تران خبر نسيت كه نسيت

অর্থঃ রহস্য গোপনীয়তার আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হওয়া মংগলজনক নয়। নতুবা এমন কোন খবর নাই যাহা পাগলদের মজলিসে নাই।

(২) একদিন মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব (পরিবার পরিজনদের ধারণা তিনি ভুল ও বাক্যবাগিশ লোক ছিলেন) হজরত খাজা সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মাওলানা হোসাইন আলীকে দেখিয়া এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন এবং এই আয়াতের অর্থের দিকে খেয়াল করাইয়া তাঁহাকে পরিবার পরিজনদের অস্থিরতা হইতে মুক্তিদান করিলেন।

يَاايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْ وَاجِكُمْ وَاَوْلَا دِكُمْ عَدُ وَّالَّكُمْ فَاحْذَ رُوهُمْ

অর্থাৎ, তোমরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ শোন! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যেই তোমাদের শত্রু রহিয়াছে, অতএব তাহাদের নিকট হইতে সাবধান হও।

চিঠিপত্রসমূহ

হজরত খাজা ওসমান (রঃ) এর চিঠিপত্রের মধ্য হইতে আমরা এখানে দুইখানা চিঠি পেশ করিতেছি, যাহা হজরত মাওলানা আবুস সায়াদ আহ্‌মদ খান সাহেব (রঃ) বাণীয়ে (প্রতিষ্ঠাতা) খানকায়ে সিরাজীয়ার নামে লিখিয়াছেন।

প্রথম চিঠিঃ এই চিঠিখানা হজরত খাজা ওসমান দামানী (রঃ) মাওলানা আবুস সায়াদ আহ্‌মদ খান সাহেবকে তাঁহার প্রথম পীর হজরত পীর লাল শাহ্ এর

ইন্তেকালের শোকবাণী হিসাবে লেখেন। তিনি তাঁহাকে সান্তনা দিয়া লেখেনঃ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সত্যিকারের মুরীদদের জন্য পীরের ইন্তেকাল একটি বিরাট দুর্ঘটনাই বটে। পীর লাল শাহ্ সাহেবের ইন্তেকাল একান্তই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। হায় হুতাশ করিবেন না। এবং আমি এই নগণ্যকে ধৈর্য্য ধারণের এবং ইল্‌ম হাসিল করার ব্যাপারে সাহায্যকারী মনে করিবেন।

দ্বিতীয় চিঠিঃ শোকপত্র প্রাপ্তির পর যখন আলা হজরত খাজা সাহেবের নিকট নতুন করিয়া বাইয়াত হওয়ার আবেদন করিলেন, তখন তিনি উত্তরে লিখিলেনঃ

অতঃপর ফকীর নগণ্য মুহাম্মদ ওসমান আফী আনহুর পক্ষ হইতে প্রিয় ও সরলমনা মিয়া আহ্‌মদ খান সাল্লামাহুল্লাহ, আল্লাহ্ আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় মংগল দান করুন। অতঃপর জানিবেন যে, আপনার চিঠিতে আপনি নতুন করিয়া আমার কাছে বাইয়াত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। চিঠিখানা আমি পাইয়াছি। জানিবেন যে, হজরত লাল শাহ্ এর সকল মুরীদানের পীর প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং আমি। এজন্য বর্তমানে নতুনভাবে আপনার মুরীদ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানীতে আপনার যখন ইল্‌মে দ্বীন অর্জন সমাপ্ত হইবে এবং আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার একান্তই ইচ্ছা হইবে, তখন আমার কাছে মুরীদ হইবেন। এখন লেখাপড়া করুন এবং অবসর সময় জনাব শাহ্ সাহেবের নির্দেশিত যিকির ইসমে জাত (অর্থাৎ আল্লাহ্ আল্লাহ) করিতে থাকুন। আমাদের বুজুর্গদের লক্ষ্য ইসমে জাতের মধ্যে দৃঢ়তা লাভ করা। পাঞ্জেগানা নামাজ জামাতের সহিত আদায় করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। তাছাড়া যাবতীয় নাজায়েজ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার একান্ত চেষ্টা করিবেন। খোদাহাফেজ, ওয়াস সালাম।

আত্মনির্ভরশীলতা

একবার কাটরি আফগানার সকল লোক উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলঃ আমাদের কারিজ (চারণভূমি) ও তাহার আশেপাশের জমির মূল্য দশ হাজার টাকা। উহার বার্ষিক আয় প্রায় দুই হাজার টাকা। আমরা উহা আপনার লংগরখানার খরচের জন্য হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করিতে ইচ্ছুক। ইহা আপনি গ্রহণ করুন। কিন্তু খাজা সাহেব এই বলিয়া অস্বীকার করিলেনঃ ফকীরদের সকল প্রকার কাজ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়াই চলে।

(২) একবার হাজী গোলাম নবী (বাবর গোত্রের) এক পত্রে আবেদন করিলেনঃ আমার সমস্ত সম্পত্তি যথা জমীন, ট্যাঙ্কের টাকা, বাগান এবং বাসস্থানের মূল্য ১১,০০০ টাকা। ইহা হুজুরের লংগরখানার জন্য দান করিয়া আমি নিজেও মুরীদদের দলে অন্তর্ভুক্ত হইতে চাই। দয়া করিয়া কবুল করুন। হজরত খাজা সাহেব উত্তরে লিখিলেনঃ আপনার নেক নিয়াত এবং সদিচ্ছা সঠিক। আল্লাহ্ আপনাকে ইহার উত্তম

পুরস্কার দান করুন। তবে জানিবেন যে, ফকীরদের লংগরখানার খরচ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া চলে এবং আমাদের অতীত বুজুর্গগণ কখনো এই ব্যাপারে কোন প্রকার অস্থিরতা ও ব্যতিব্যস্ততা বা ইতস্ততা করেন নাই। তাঁহারা লংগরখানা ইত্যাদির যাবতীয় খরচের জন্য আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করিয়াছেন। অতএব এই ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করিবেন। অবশ্য খানকা শরীফ আপনার ঘরের মতই। যখন ইচ্ছা আসুন এবং খানকার মুরীদদের সহিত বাকী জীবন অতিবাহিত করুন। ইনশাআল্লাহ্‌ তায়ালা তাওয়াজ্জু এবং দোয়ার মধ্যে সর্বদা ভরপুর থাকিবেন।

ইন্তেকাল

দীর্ঘ ৩০ বৎসর পর্যন্ত হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানী (রঃ) একাধারে খোরাসান অঞ্চল ও সুবায়ে সরহাদের বিভিন্ন এলাকায় এবং পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সত্যানুসন্ধানীদের সঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তিনি সত্য ও সরল পথের অনুসন্ধানকারীদিগকে হুবহু ঐসকল উম্মতের পথে পরিচালিত করিয়াছেন যাহারা প্রথম যুগের পবিত্র আত্মাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সকল অস্থির প্রবৃত্তির মানুষকে তিনি আধ্যাত্মিক শান্তিদান করিয়াছেন। এমন কি হেদায়েতের পিয়ালা তৃপ্তিমত পানকারিগণও পুনরায় পিপাসা অনুভব করিতেছিল। অবশেষে এই আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলের সকল উত্তম-অধমকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলার পর ইশরাকের সময় শাবান মাসের এক তারিখে ১৩১৪ হিজরীতে ইহজগত ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি -----রাজেউন।

الَى اللّٰه اَشْكُوْلَا الَى النَّاس انّنى اَرَى الْاَرْض تَبْقَى
وَالْاَخْلَاء تَذْهَبُ

অর্থাৎ, "আমার অভিযোগ আল্লাহ্‌ তায়ালার নিকট, মাখলুকের নিকট নহে। কেননা, আমি দেখিতেছি পৃথিবী স্থির আছে কিন্তু বন্ধুরা চলিয়া যাইতেছে।"

হজরতের বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর ২ মাস ১৩ দিন। জানাজার নামাজ পড়ান তাঁহার বড় ছেলে হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন (রঃ)। তিনি তাঁহার শায়েখ হজরত হাজী দোস্ত মুহাম্মাদ কান্ধারী (রঃ) এর পায়ের কাছে চির নিদ্রার স্থান লাভ করিয়াছেন। রাহিমাহুল্লাহ তায়ালা রাহমাতান ওয়াসিয়াতীন আবদান সারমাদান।

মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে রাখিয়া যান। তাঁহারা সবাই নেককার এবং সুশিক্ষিত এবং সারা জীবন পবিত্র ধর্ম শিক্ষা ও প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা হইতেছেনঃ

(১) খাজা সিরাজউদ্দিন যিনি গদীনশীন ছিলেন। (২) হজরত মাওলানা বাহাউদ্দিন (রঃ) (৩) হজরত মাওলানা সাইফুদ্দিন (রঃ)। এই তথ্যাদি লেখক মাওলানা সাইয়েদ আকবার আলী দেহ্‌লভী খলীফায়ে মেজাজ কর্তৃক লিপিবদ্ধ ফাওয়ায়েদে ওসমানী

হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ফাওয়ায়েদে ওসামানীতে তাঁহার জীবনের বিস্তারিত আলোচনা, ঘটনাবলী, বাণী এবং কেরামতসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। আরবী অক্ষরের নম্বর অনুযায়ী ওয়াফাতের সাল তারিখ সম্বলিত প্রশংসাবাণী হজরত খাজা ওসমান দামানী রহমাতুল্লার ইন্তেকালের পর তাঁহার অনেক খাদেম ও শিষ্য পদ্যে ও গদ্যে রচনা করিয়াছেন। তাহারা মৃত্যু তারিখের সহিত মিল রাখিয়া বিভিন্ন ভাষায় প্রশংসা করার বিশেষ যোগ্যতা রাখিতেন। সে সবের কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। উল্লেখ্য সকল প্রশংসা বাণী সবিস্তারে ফাওয়াদে ওসমানীতে লিপিবদ্ধ আছে।

(١) از مولانا محمد شیرازی = (رح)
(ا) حَمْدُ اللّٰه الّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَیُّ الْقَیُّومُ اَلْمَا جِدْ
١٣١٤ = مجری
(ب) سَلَافِیْ عَلٰی مَرْکَزِ الْاِ یِمَانِ عُثْمَانَ =
١٣١٤ بحری =
(ج) شیرازی از اهل یه تایخ سال گفت = هر سپر
(د) گفت شیرازی پی تاریخ سال =
عا لمد ین در محاق شد ١٣١٤ هه
(٢) ازجان حقد اد خان تر یی (رم)
درجوار قرب حق دادش مقام ١٣١٤ هه
(ب) دل محزون به سال وصلشن گفت
دو ست با کام دل مد وست رسید ١٣١٤ هر
(٣) ار مولانامحد حین صا حب (رح)
ثریر قر ـــی آشانے متکا ١٣١٤ مصر
(ب) روح غش بود چون قد سی وطنی
(٤) از مولانا محمود حین خان نازان رئسي مجبر =
(ب) سال وصال حضرت نهر ثواب نازان
عشمان نقشنبد کا مل ولی نو شئر ١٣١٤ هر
احوال وآثار حضرت خواجه سر اج الدین (رحمه الله)
— ৫ —

হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন (রঃ) এর জীবন ও স্মৃতিকথা

হজরত খাজা মুহাম্মাদ সিরাজউদ্দিন (রঃ) ছিলেন হজরত খাজা মুহাম্মাদ ওসমান দামানী (রঃ) এর বড় ছেলে। তিনি তাঁহার প্রধান খলীফা ও গদীনশীনও ছিলেন। তিনি খানকায়ে আহ্‌মদিয়া সায়ীদীয়া মুসাযায়ী শরীফে সোমবার দিন এশরাকের সময় ১৫ই মুহাররম ১২৯৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

তিনি কুরআন মজীদ শিক্ষা করিয়াছেন আকুনজী মোল্লা শাহ্ মুহাম্মাদ বাবর সাহেবের নিকট। ফার্সীতে বিভিন্ন পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ, আরবীতে ইলমে নহু ও ইলমে সরফ, মানতেক, আকায়েদ এবং ইলমে তাজবীদ ও কেরাত, ফেকাতে কানজুদ্দাক্কায়েক, শরহেবেকায়া জিলদাইন, হেদায়ায়ে ও আখেরাইন, উসূলে ফেকাতে নুরুল আনোয়ার ও হুসামী, তাফসীরে জালালাইন, হাদীসে মেশকাত শরীফ, ইবনে মাজা নিসফে আউয়াল ইত্যাদি গ্রন্থ হজরত মাওলানা মাহমুদ সিরাজী (রঃ) এর নিকট পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থ যথা হুসামী কামেল, শরহে বেকায়া, হেদায়া আউয়ালাইন, তাফসীরে মাদারেক, তানকীহে উসুল বজদোবী, তালখীসূল মিক্‌তাহ্, তরজমায়ে কুরআন, মিশকাত শরীফ দ্বিতীয় খন্ড সিহাহে সিত্তা, ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করেন মাওলানা হুসাইন আলী সাহেব (রঃ) জিলা মিয়াল ওয়ালী এর নিকট।

আধ্যাত্মিক বিষয় মাকুতুবাতে ইমামে রব্বানীর তিন খন্ড এবং মাকুতবাতে মাসুমীয়ার তিন খন্ড পাঠ করেন তাঁহার পিতা হজরত খাজা দামনীর নিকট।

স্থলাভিষিক্ত

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন আরবী ফার্সী শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং তরীকার সকল স্তর ১৩১১ হিজরীতে সফলতার সহিত শেষ করার পর হজরত খাজা মুহাম্মাদ ওসমান দামানী তাঁহার নিজ সুযোগ্য সন্তানকে ১৪ বৎসর বয়সে তরীক্বায়ে সিলসিলার অনুমতি দেন এবং সনদপত্র লিপিবদ্ধ করার পর তাঁহাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্দিষ্ট করেন। অতঃপর খানক্বা শরীফের ইমামতির দায়িত্ব, খতমে খাজেগান এবং যিকির ও মুরাকাবার বিষয়ে নিজের প্রতিনিধিত্ব দান করিয়া হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিনকে প্রকাশ্যে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেন। হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করিতে শুরু করিয়া দেন। এবং তাঁহার সুহবতের বরকতে সত্য অন্বেষণকারিগণ রূহানী তাসীর ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে থাকেন।

সিলসিলার প্রচার ও উন্নতি

হজরত খাজা নিজেও তরীক্বায়ে আলীয়া মুজাদ্দেদীয়ায় এত উন্নতি লাভ করেন যে তৎকালীন পীর সাহেবগণ ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অনুসারীদেরকেও এমন উচ্চ স্তরে উন্নীত করেন যাহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সুতরাং সত্য অনুসন্ধানকারিগন এবং সুন্নাতে রাসূলের আশেকানগণ ক্বান্ধার, কাবুল, বোখারা, তুরকিস্তান ও বিভিন্ন মুসলিম দেশ হইতে মারেফাতে এলাহীর জন্য হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সিলসিলায়ে আলীয়ার সহিত সম্পর্ক স্থাপন এবং সর্বপ্রকার পরিপূর্ণতা লাভ করিতেন। তিনি পূর্ণ আন্তরিকতা, যত্ন এবং ভালবাসার সহিত তাহাদিগকে প্রশিক্ষণ দান এবং তাহাদের বাহ্যিক ও আত্মিক সংশোধন সাধন করেন। আরবী, ফার্সী ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষায় প্রচুর যোগ্যতা ছাড়াও উন্নতমানের শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনেক উৎসাহ ছিল। মুসলিম দেশসমূহ হইতে আগত ব্যক্তিবর্গের অনেকেই বিভিন্ন ইসলামী পত্র পত্রিকা এবং অনেক মুল্যবান গ্রন্থ সংগে নিয়া আসিতেন। ফলে নিঃসন্দেহে মুসাযায়ী শরীফে তাঁহার কুতুবখানা দুস্প্রাপ্য কিতাবসমূহের একটি অমূল্য ভান্ডার হিসাবে গড়িয়া উঠে। তাঁহার মৃত্যুর পর গ্রন্থাগারের ঐ অবস্থা এবং শান শওকত থাকে না। তবুও সেই গ্রন্থাগারে এখনও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, জ্ঞান ও সাহিত্য, তাসাওউফ এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ রক্ষিত আছে।

আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য সাধনার প্রয়োজন

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন (রাঃ) যখন খানক্বার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক ১৭ বৎসর। অতঃপর তিনি শতশত অনুসারীকে এই পথে পরিচালিত করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে ওলীর সুউচ্চ আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হন। আধ্যাত্মিক জগতে এইরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম। অতএব আল্লাহর মারেফাত অনুসন্ধানকারীর অন্তরে এই প্রশ্ন অবশ্যই আসিতে পারে যে, আল্লাহর পরিচয় লাভ করার জন্য সাধনার প্রয়োজন আছে কি? না ইহা ব্যতীতই আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করা যায়।

প্রসংগত বলা অযৌক্তিক হইবে না যে সাধনা ও প্রচেষ্টা এ ব্যাপারে একান্তই আবশ্যক, কেননা, ইহার দ্বারা প্রবৃত্তি সুশৃংখল হয়, অন্তর খেয়াল–খুশির প্রবঞ্চনা হইতে নিরাপদ হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের পথ সুগম হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা বড় কথা হইল এই যে, সাধনা ও চেষ্টাকারী তরীক্বাপন্থীর স্বভাবের মধ্যে যদি

পরিচ্ছন্নতা থাকে এবং তাঁহার মধ্যে দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রতিভা থাকে তাহা হইলে সাধনা সেই প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত ও সুসজ্জিত করিয়া দেয়। স্বভাবের মধ্যে সৌন্দর্য এবং যোগ্যতা যখন অনুপস্থিত থাকে সাধনা তখন সম্পূর্ণ নিঃষ্ফল হয়। যেমন শেখসাদী (রঃ) বলেন, "হে জ্ঞানীজন, অমানুষ কখনো শিক্ষা দ্বারা মনুষত্ব লাভ করে না।" অন্য কথায় ইহা ধ্রুব সত্য যে আল্লাহ্তায়ালার দয়া ও তাঁহার দান সীমাহীন। সাধনার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বরং তাহা শুধু আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। তাঁহার পুরস্কার ও দয়ার পথ ভিন্নতর। তিনি যখন যাহাকে ইচ্ছা দান করেন। সময় এবং দূরত্বের নিয়ম কানুন সৃষ্ট জগতের জন্য চিরস্থায়ী। আল্লাহ ইহা হইতে বহু উর্ধে। কুরআনের সাক্ষী এ ব্যাপারে সর্বোত্তমঃ

. لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার নিকট তাঁহার কোন কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যাইবে না। প্রশ্ন শুধু মানুষের কাজেই করা হইবে। অতএব যখন আল্লাহ তায়ালার দয়া অনুগ্রহ মানুষ লাভ করিতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালার নূর যখন মানুষের অন্তরকে আলোকিত করিয়া দেয় তখন সকল বাধা সৃষ্টিকারী শক্তি তাঁহার আলোকের তীব্রতায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং অন্তর মারফাতে ইলাহীর উজ্জ্বল ঘাঁটিতে পরিণত হয়। বিষয়টি আরো সুন্দর করিয়া প্রকাশ করার জন্য আমাদের ঐ সময়ের অবস্থা বিস্তারিতভাবে জানিতে হইবে। খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেব (রঃ) গদীনিশীন হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সুন্দর স্বভাব, উপযুক্ততা ও যোগ্যতা এবং মহান চরিত্রে চরিত্রবান করিয়াছেন। অতঃপর যে পরিবেশে তিনি ১৭টি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন সেই পরিবেশও কুরআন ও সুন্নতের অনুসরণের একটি উল্লেখযোগ্য নমুনা ছিল। অত্র এলাকার বালু-কণা এবং আনাচে কানাচে পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরের দ্বারা উজ্জীবিত ছিল। সেখানকার পরিবেশ ছিল প্রবৃত্তি এবং সকল প্রকার মলিনতা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। এরূপ পবিত্র পরিবেশই হজরত খাজা (রঃ) এর আত্মিক সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। যে উচ্চস্থান তিনি লাভ করিয়াছিলেন নিঃসন্দেহে তাহা জীবনের প্রথম দিন হইতে ছিল তাহারই ভাগ্যে লেখা। এ ব্যাপারে হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর বানী সিদ্ধান্তের অধিকার রাখে। তিনি বলিয়াছেন

ام روزحصول این دولت غطمے وابستہ بتو جہ واخلاصی باین طبقہ علیہ نقشبند یہ است بریاضت شا قہ ومجا ھدات شدیرہ آن میرنگرداد کہ بیک صحبت ایشان حصول یابد =

অর্থাৎ বর্তমানে এই অমূল্য সম্পদ লাভ সিলসিলায়ে আলীয়া নক্বশবন্দীয়ার আন্তরিকতা এবং আগ্রহের সহিত সম্পর্কিত। তাহাদের সহিত সম্পর্কের দ্বারা যাহা লাভ করা যায় কঠিন প্রচেষ্টা এবং সাধনার দ্বারা উহা লাভ করা যায় না।

আল্লাহওয়ালাদের ইজ্জত

খানকা সিরাজীয়ার গদীনিশীন হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সাহেব বলিতেন, সিলসিয়ায়ে আলীয়া নক্বশবন্দীয়ায় তিন জন এরূপ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, যাহারা ছিলেন যাবতীয় শান শওকত, ইজ্জত ও সম্মানে অতুলনীয়, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে নামটি উল্লেখ করিতে হয় তিনি হইলেন ওবায়দুল্লাহ আহরার সাহেব। তৎকালীন ধনী ও বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাগণ তাঁহার ভক্ত ছিলেন এবং সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ তাঁহার ঐতিহ্য এবং ইজ্জতের কথা ভাবিয়া ভীত সন্ত্রস্ত থাকিতেন। হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) তাঁহার একটি বানীর এরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ "আমি যদি পীর মুরীদি আরম্ভ করিয়া দেই, তাহা হইলে দুনিয়ার আর কোন পীর সাহেব কোন মুরীদই পাইবেন না। কিন্তু আমি যেই দায়িত্ব পালন করি তাহা অন্যরূপ। এবং তাহা হইতেছে জাতীয় কল্যাণমূলক কাজ এবং ধর্মপ্রচার।"

দ্বিতীয় মর্যাদাবান ব্যক্তি হজরত খাজা সাইফুদ্দিন (রঃ)। তিনি ছিলেন কাইউমে জমান হজরত মাওলানা মাসুম সাহেবের ছেলে এবং গদীনিশীন। শাহেন শাহ্ আওরংগজেব আলমগীর তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সব সময় পত্রের আদান প্রদান ছিল। সে কারণে সাইফুদ্দিন সাহেবের মাকতুবাতের মধ্যে আওরংগজেবের নামে লেখা তাঁহার একাধিক পত্র লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের কথা সকলের মুখে ছিল। তাঁহার মুরীদ এবং খলীফাদের সংখ্যা হাজার হাজার।

তৃতীয় মহা সম্মানিত ব্যক্তি হইতেছেন হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন (রঃ)। তিনি মুসা শরীফের গদীনিশীন ছিলেন। তাঁহার বাসগৃহে সব সময়ই তিন চার শত আপনজন এবং মুরীদ থাকিতেন। শাহী মেহেমানখানার মত তাঁহার লংগরখানা সব সময়ই শান শওকতে চালু ছিল। সকল মেহেমানের পানাহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইত। এতদসত্ত্বেও তিনি নিশ্চিন্ত এবং লাপরওয়া ছিলেন। ভক্তদের এই সংখ্যা ভ্রমণে এবং বাড়ীতে একই রকম ছিল। তিনি দলবদ্ধভাবে রওয়ানা হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উষ্ট্রারোহী থাকিতেন। কোন দুনিয়াদারের দাওয়াত তিনি গ্রহণ করিতেন না। ভ্রমণের সম্পূর্ণ খরচা তিনি নিজেই বহন করিতেন।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখে তাঁহার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।" কাজেই তাঁহার জমানায় প্রত্যেক সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে এই কথা শোনা যাইত যে, যদি হজরত খাজা সাহেব আরো কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে কোন পীর সাহেব তাঁহার জমানায় গদীতে বসিতে পারিবেন না।

গ্রীষ্মকালের কয়েকটি সফর

মওসুমে গরমা অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে হজরত হাজী সাহেব (রঃ) কান্ধার যাইতেন। তখন খাজা ওসমান দামানী এবং সিরাজ উদ্দিন দামানী তাঁহার সফর সংগী হইতেন। কিন্তু পরে যখন পাসপোর্ট প্রয়োজন হইল এবং দুই মাসের মধ্যে পাসপোর্টবিহীন যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হইল, হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেব তখন তিন চারশত ভক্ত সংগে নিয়া এবোটাবাদ যাইতেন এবং সেইখানে শান শওকতের সহিত একটি রেষ্ট হাউজে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতেন। রেষ্ট হাউজ তিনি ভাড়া নিতেন। একবার তাঁহার এবোটাবাদ অবস্থানকালে কোন ব্যক্তি সেখানকার ইংরেজ ডিসির নিকট খবর দিল যে রেষ্ট হাউজে ফকিরদের একটি দল অনেক দিন যাবৎ অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের যাবতীয় খরচ নিজস্ব এবং তাহারা কাহারও দাওয়াতও গ্রহণ করেন না। এব্যাপারে তাহাদের আয় ব্যয়ের উপর নজর রাখা শহরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উচিৎ। অতএব ডিসি সাহেব নিজেই হজরতে আক্বদাসের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দাওয়াত পেশ করিলেন। খাজা সাহেব বলিলেনঃ আপনার দাওয়াত এই শর্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যতদিন আমরা এই শহরে অবস্থান করিব তার প্রত্যেক দিন সকালে এবং বিকালে আপনি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করুন এবং এই খানা আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনার বাসভবনেও পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া ঐ ইংরেজ ডিসি সাহেব অবাক হইয়া গেলেন এবং লজ্জিত হইয়া চলিয়া আসিলেন।

অভাবহীন অবস্থা

তাঁহার এবোটাবাদ অবস্থানকালে একজন পুলিশ অফিসার এক ঝুড়ি ফল হাদিয়া স্বরূপ হজরতের খেদমতে পেশ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক দিন উন্নতমানের এক ঝুড়ি ফল ঐ পুলিশ অফিসারের বাসায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন পর ঐ পুলিশ অফিসার অনুনয় বিনয়ের সহিত বলিলেন হুজুর আপনি আমার জন্য এই কষ্ট করিবেন না।

আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন (রঃ) বলিতেনঃ আমার পিতার নিকট হইতে কিছুই লাভ করিতে পারি নাই। অবশ্য তাঁহার সুহবতের বরকতে আমার অন্তর দুনিয়ার কোন কাজ কর্মে কখনও আকৃষ্ট হয় নাই এবং সেই সাথে অন্তর হইতে দুনিয়ার ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে। শত শত ভক্তের ব্যবস্থাপনা এবং তাহাদের থাকা খাওয়ার ইন্‌তেজাম কিভাবে হইবে, সেই চিন্তায় কখনও অস্থির হই নাই। সব কিছু আল্লাহর উপর ন্যস্ত করিবার পর মনের এরূপ স্থিরতা লাভ করিয়াছি যাহা দুনিয়ার কোন বাধাই নড়চড় করিতে পারিবে না।

বিশেষ পুরস্কার দান

হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব হজরত খাজা সাহেবের মুরীদদের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি খাজা সাহেবের ছেলেদের ওস্তাদও ছিলেন। একবার তিনি ডেরা ঈসমাইল খান যান। ঐ সময় শহর রক্ষার উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছিল। শহরবাসীদের নিরাপত্তার জন্য শহরের সকল প্রবেশ পথ ইশার নামাজের পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত এবং ফজরের পর খোলা হইত। হাফেজ আব্দুল্লাহ সাহেব বলেনঃ আমি হজরত কেবলার খেদমতে তাড়াতাড়ি মুসাযায়ী শরীফে পৌছাইতে চাহিয়াছিলাম। প্রবেশ পথে পুলিশ প্রহরারত ছিল। ডেরা ঈসমাইল খান হইতে মুসাযায়ী শরীফের দূরত্ব ৪০ মাইল। সূর্য্য উঠার সাথে সাথে রওয়ানা করিলে দুপুর হইয়া যাইত এবং কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত। তাই আমি আল্লাহর নাম নিয়া সেহ্‌রীর সময় শহরের একটি প্রবেশ পথ দিয়া বাহির হইলাম কিন্তু কর্মরত পুলিশ আমাকে বাধা দিল না। শহর হইতে বাহির হইয়াই পীরের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমি হজরতের ভালবাসায় মগ্ন থাকিয়া আল্লাহর যিকির করিতে করিতে যাইতেছিলাম। কয়েক মাইল যাওয়ার পর আমার পদযুগল আপনা আপনিই থামিয়া গেল। শত চেষ্টা করিয়াও সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এরূপ বোধ হইতেছিল যেন কোন অদৃশ্য শক্তি আমার দুইটি পা অবশ করিয়া দিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সামনে একটি সাপ। আমি তৎক্ষণাৎ পিছনে সরিতে চাহিলাম এবং আমার পাও ঠিক হইয়া গেল। এই অদৃশ্য ব্যবস্থার জন্য আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করিলাম। মোটকথা, হজরত খাজা সাহেবের উসিলায় এই দয়া আমার নসীব হইয়াছিল। অতঃপর মুসাযায়ী শরীফে পৌছিয়া হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি তাঁহার পবিত্র জবানে বলিলেনঃ হাফেজ সাহেব আল্লাহ্‌ তায়ালা সমস্ত পৃথিবীর

রক্ষাকারী। তিনিই বান্দাদিগকে পুলিশের ধরপাকর হইতে বাঁচান এবং সাপ হইতেও তিনিই রক্ষা করেন।

লৌকিকতা এবং আন্তরিকতার মধ্যে পার্থক্য

একজন আফগান দীর্ঘ দিন হইতে হুজুরের খেদমতে নিয়োজিত ছিল। তাহার উপর ঘোড়ার আহার যোগাড় এবং থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব ছিল। সে তাঁহার খেদমতের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য ঘোড়ার মল নিজের জামা কাপড়ে লাগাইয়া রাখিত এবং পরিষ্কারের কাজ ঐ সময় আরম্ভ করিত যখন হুজুর খানকা হইতে হাবিলীর দিকে রওয়ানা হইতেন। কিন্তু হজরত কখনও তাঁহার দিকে খেয়াল করিতেন না এবং তাহার খেদমত ও কর্ম হইতে সব সময় দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেন। একদিন মসজিদের মধ্যে হুজুর একটি চাটাই দেখিলেন। চাটাইটি খুব সুন্দরভাবে সাজান ছিল। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এ খেদমত কে করিয়াছেন? উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে একজন বলিল, হুজুর এ খেদমত আপনার অনেক পুরাতন আফগান খাদেম করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত খুশি হইলেন এবং খুশির অবস্থায় তাহার উপর দয়ার দৃষ্টি দিলেন। এ দৃষ্টিপাতে তাহার ভাগ্য খুলিয়া গেল। তাঁহার প্রথম খেদমত লোক দেখানোর জন্য ছিল বলিয়া তাহা নিঃষ্ফল হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় খেদমতের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, তাই তাহা আল্লাহর দয়া লাভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেবের অতুলনীয় ভালবাসা

হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন সাহেব (রঃ) একবার হুজুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। এই সফরে হজরত মাওলানা আবুস সায়াদ আহমদ খান এবং অন্যান্য মুরীদ শরীক ছিলেন। হজরত খাজা সাহেবের বগী করাচী পর্যন্ত রিজার্ভ ছিল এবং উহার পরের বগীতেই তাঁহার মুরীদগণ ছিলেন। করাচী পৌঁছিবার পর গার্ডরা বলিলেন, হজরতের পরের বগীটি আলাদা করিয়া দাও এবং কোয়ারিন্টাইনের জন্য পাঠাইয়া দাও। যখন রেল কর্মচারিগণ বগী পৃথক করিতে আরম্ভ করিল তখন হাফেজ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সাহেব (যিনি হজরতের ছেলেদের উস্তাদ ছিলেন) হজরতে খাজার নিকট বলিলেনঃ ক্বিয়ামতের কথাতো শুধু আল্লাহ্পাকই জানেন কিন্তু আমরা ক্বিয়ামত এখনই দেখিতেছি। যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেনঃ

وَامْتَازُ وَالْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

আল্লাহতায়ালার এই আয়াতের অর্থ অনুযায়ী আমাদেরকে আপনার নিকট হইতে পৃথক করা হইতেছে। ইহা শুনিয়া খাজা সাহেব রেলওয়ে কর্মকর্তাদের বলিলেনঃ

আমার দলের কাহাকেও কোয়ারিন্টাইনে না পাঠান হউক। অতঃপর কেহই তাঁহার মুরীদদের সহিত এব্যাপারে কোন উচ্চবাক্য করে নাই। সুব্হানাল্লাহ্, হজরত খাজা সাহেব তাঁহার নিজ মুরীদদের প্রতি দয়া ও ভালবাসার কারণে কখনো তাহাদেরকে পৃথক করা পছন্দ করিতেন না।

দুনিয়া বিমুখতা

সূফী মাওয়াজ খান সাহেব বর্ণনা করেনঃ একবার আমি হজরতে আলার সহিত খাওলা শরীফ হইতে সুনসাকীসারে হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেব (রঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। এ সময় হজরত খাজা সাহেব একটি তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঠিক ঐ সময় একজন হিন্দু সাধক হাতে একটি কলসি নিয়া আসিল এবং এক কলসি দুধ চাহিল। খাজা সাহেবের আদেশে খাদেমগণ সংগে সংগে এক কলসী দুধ সংগ্রহ করিয়া দিল। সে সেই দুধ নিয়া তাহার আস্তানা পাহাড়ের চূড়ায় চলিয়া গেল। সাধক পরের দিন দুধের সেই কলসির মধ্যে রৌপ্য ভরিয়া আনিল এবং আরজ করিল, ইহা লংগরখানার খরচার জন্য ব্যয় করা হউক। হজরত খাজা সাহেব এক কলসি পানি আনিতে বলিলেন এবং বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া ফুঁদিলেন। হজরত খাজা সাহেবের কেরামতে মাটির ঐ কলস পানিসহ স্বর্ণ হইয়া গেল।

অতঃপর খাজা সাহেব ঐ সাধুকে বলিলেনঃ তুমি দুধকে রৌপ্য বানাইয়াছ এবং আমি পানিকে স্বর্ণ বানাইয়াছি। আলহামদুল্লিাহ্ আমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কোনটারই প্রয়োজন নাই। অতএব ইহা তুমি নিয়া যাও। অবশেষে ঐ সাধু স্বর্ণ এবং রৌপ্য লইয়া সেইখান হইতে চলিয়া গেল।

বিষাক্ত সাপের আনুগত্য

সুনসাকিসারে অবস্থানকালে একদিন হজরত খাজা (রঃ) মাওলানা আবু সায়াদ আহমদ খান সাহেবকে বলিলেনঃ বন্দুক সংগে নিয়া যাও। আমরা পাহাড়ের মধ্যে একটি পুকুরে যাইব। হজরত খাজা সাহেবের সহিত আহমদ খান সাহেব ছাড়াও অন্য মুরীদগণও তাহাদের সহিত গেলেন। পুকুরের নিকট পৌছিয়া খাজা সাহেব নিজের জামা কাপড় খুলিয়া মালিক ফাতাহ্ মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট রাখিলেন। এবং লুংগি পরিয়া পুকুরে গোসল করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পর পাথরের মধ্যে খটখট শব্দ শোনা গেল এবং একটি প্রকান্ড বিষাক্ত সাপ বাহির হইয়া আসিল। এই দৃশ্য দেখিয়া মুরীদগণ ভয়ে দিশেহারা কিন্তু হজরত খাজা সাহেব সামান্যতমও বিচলিত হইলেন না। কয়েক মিনিট পর তিনি পুকুর হইতে উঠিয়া আসিলেন, নিজের জামা কাপড় পরিলেন এবং অজু করিলেন। অতঃপর সাপটির নিকট যাইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তুই প্রত্যেক দিন কোন ভেড়া, বকরি অথবা মহিষ মারিয়া ফেলিস। এইখানকার

পাহাড়ে বসবাসকারী আল্লাহর সৃষ্ট জীবগণ তোর প্রতি অসন্তুষ্ট। কেয়ামতের দিন যখন তোর নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে, তখন আল্লাহর নিকট কি জওয়াব দিবি? এখন এই পুকুরের পানি পান কর এবং ইহাতে গোসল করিয়া নিজের শরীর ঠান্ডা করিয়া নে।

হজরত খাজা সাহেবের এই উপদেশ শোনার পর সাপটি পুকুরে ঝাঁপ দিল এবং তাহার ঝাঁপ দেওয়াতে সমস্ত পানিতে ঢেউ খেলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে পুকুর হইতে উঠিয়া হজরত খাজা সাহেবের পায়ের উপর মাথা রাখিল। খাজা সাহেব বলিলেন এখন যাইতে পার। অতঃপর খাজা সাহেব এক মাইল পথও অতিক্রম করেন নাই, সাপটি পুনরায় চলিয়া আসিল ইহার পর হজরত কঠোরভাবে বলিলেনঃ তুই এই পাহাড় ছাড়িয়া অন্য কোন পাহাড়ে চলিয়া যা। আমি তোকে বিদায় দিলাম। অতঃপর সাপটি অদৃশ্য হইয়া গেল এবং খাজা সাহেব তাঁহার বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

বুজুর্গীর একটি অতুলনীয় সাক্ষ্য

হজরত খাজা ওসমান দামানী (রঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁহার ছেলে হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন মাত্র ১৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন বয়েসে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এই অল্প বয়সে খেলাফতের সুমহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কোন কোন পুরাতন খাদেম মানসিক দুশ্চিন্তায় পতিত হইলেন। কিন্তু পরে ইহারাই হজরতের মারেফতিতে যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া গেলেন। এই প্রসংগে হজরত খাজা ওসমান দামানীর খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন সাহেবের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কানপুরের বাসিন্দা এবং খানকায়ে হোসাইনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার পীরের ইন্তেকালের সময় তিনি মুসাযায়ী শরীকে অবস্থান করিতেছিলেন। পীরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা ছিল অগাধ, এই কারণে পীরের ইন্তেকালের দুঃখ ছিল তাঁহার সহ্যের বাইরে। এদিকে খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেব ছিলেন বয়সে নবীন। এছাড়া পীরের ইন্তেকালের পর পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় এইসব চিন্তা করিয়া বাইয়াত না হইয়া তিনি কানপুর চলিয়া গেলেন। তিনি এক বৎসর সেইখানে অবস্থান করিলেন। পীরের তিরোধানে মন সব সময় ব্যথিত থাকিত। এই অবস্থায় তিনি হজ্জের নিয়ত করিলেন এবং আল্লাহর ঘর জিয়ারতের মাধ্যমে মনে কিছুটা সান্ত্বনা পাইলেন। মক্কাহ্ মোকারামায় হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ সাহেব মুহাজেরে মক্কী (রঃ) এর একজন মুরীদের সাথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি মারেফাতে পারদর্শী এবং সাহেবে কাশফ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্তমানে মুসলিম জাহানে মারেফাতে কামেল পীর কে? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি

তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল দিব। পরের দিন যখন মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি বলিলেনঃ বর্তমানে মাত্র দুইজন বুর্জর্গ আছেন যাঁহারা ওলীর সুমহান আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিশরে আছেন। তিনি অত্যন্ত প্রবীন এবং দ্বিতীয় জন হিন্দুস্থানে আছেন যিনি এখন যুবক। মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব হজ্ব সমাপনান্তে হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন সাহেব মদ্দে জিল্লুহুর খেদমতে খানকায়ে মুসাযায়ী শরীফে হাজির হইলেন। তখন হজরতের মুখমন্ডলে বেশ লম্বা লম্বা দাড়ি হইয়াছিল। তিনি মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন সাহেবকে দেখিয়া পাঞ্জাবী ভাষায় বলিলেনঃ–

وت چھو یران دے ومی پے گےاو

= وت چھوراں دے وس پئے گئے او =

একটি দৃষ্টান্তমূলক সম্পর্ক

মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব (রঃ) হজরত খাজা মুহাম্মাদ ওসমান রহমাতুল্লাহর মুরীদ ছিলেন এবং মারেফাতের অনেক সবক তাঁহার মাধ্যমেই লাভ করিয়াছিলেন। হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান (রঃ) এর ইন্তেকালের পর তিনি হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিনের কাছে নক্বশবন্দীয়া তরীকার সবক নূতনভাবে নেওয়ার দরখাস্ত করিলেন। তিনি তাঁহাকে শুধু পুরাতন সবকই নয় বরং যে সকল স্তর বাকী ছিল তাহাও পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। সিলসিলায়ে আলীয়া নক্বশবন্দীয়ার সহিত তাঁহাকে অন্যান্য ত্বরীকার শিক্ষাও পূর্ণ করিয়া দিলেন। এভাবেই হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন খেলাফতে জামেয়া কামেলার অনুমতি মাওলানা হোসাইন আলী সাহেবকে দান করিলেন। হজরত খাজা সাহেবের সহিত মাওলানা হোসাইন আলীর সম্পর্ক এই জন্যই দৃষ্টান্তমূলক যে, একদিকে তিনি ইলমে দ্বীনের বহু কিতাব মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন আলী সাহেবের নিকট পড়িয়াছেন, অপর দিকে মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন সাহেবের নিকট হইতে তরীক্বার খেলাফত লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন (রঃ) মাওলানা হোসাইন আলী সাহেবের ছাত্রও ছিলেন, পীরও ছিলেন।

হজরত খাজা সাহেবের উত্তরসূরীবৃন্দ

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেব ইন্তেকালের সময় তিন পুত্র যথাক্রমেঃ (১) হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব (রঃ) (২) হজরত মাওলানা মুহাম্মদ জাহেদ সাহেব (রঃ) ও (৩) হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আরীফ সাহেব (রঃ) ছাড়াও দুই কন্যা ও অসংখ্য ভক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। হজরত খাজা মুহাম্মদ

সিরাজ উদ্দিন (রঃ) এর ইন্তেকালের পর গদীনিশীন করার সমস্যা দেখা দেয়। মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব হজরতের বড় ছেলে হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবকে গদীনিশীন মনোনীত করিয়া তাঁহার মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সকলেই তাহা মানিয়া নেন। বর্তমানে হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব খানকা শরীফের মুতাওয়াল্লী এবং যাবতীয় দায়িত্বে আধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

اَوْصَلَ ہٗ اللّٰہ تَعَالٰی اِلٰی مَقَامِ اٰبَائِہٖ الْکِرَامِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁহাকে তাঁহার সম্মানিত পিতৃপুরুষদের স্থলাভিষিক্ত করুন।

হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা মুহাম্মদ খান সাহেব দরিয়াখানে হজরত মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন (রঃ) এর বাড়ীতে বসবাস করিতেন। তিনি নিকটেই একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়া (আল্‌হামদুলিল্লাহ্) বংশীয় বুযুর্গদের ফয়েজ ও বরকতের দ্বারা ধন্য হইয়াছেন। তিনি মেহমানদের ও মুরীদদের খেদমতে থাকিয়া অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন। তৃতীয় ছেলে হজরত আহমদ খান সাহেবও ঐ গ্রামেই বসবাস করিতেন। হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন সাহেবের দুই ছেলে (আলহামদুলিল্লাহ্) এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহাদের নাম খাজা মুহাম্মদ জাহেদ সাহেব এবং খাজা মুহাম্মদ আরীফ সাহেব সাল্লামাহুল্লাহুম। তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষের তরীকার অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত আপ্যায়নশীল, সদালাপী এবং চরিত্রবান। এ সকল গুণ ছাড়া খাজা মুহাম্মদ আরীফ সাহেব একজন বিশিষ্ট কবি এবং তাঁহার কবিতা অত্যন্ত উপদেশমূলক এবং মারেফতীতে পূর্ণ।

প্রধান খলীফাগণ

(১) হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবুস সায়াদ আহমদ খান সাহেব (রঃ) কুন্দিয়ান শরীফের খানকায়ে সিরাজিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। কিতাবের নামকরণও তাঁহার নামেই হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে তাঁহার বাল্য জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। তাহা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। (২) হজরত মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব (রঃ) ওঁয়াভিচরা গ্রামের মিয়ানওয়ালীর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ আলেম এবং সেই সাথে মুহাদ্দিস ও মুফতীও ছিলেন। তিনি হজরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রঃ) এবং হজরত মাওলানা মুহাম্মদ মাজহার নানূতরীর নিকট হাদিস পড়েন। আধ্যাত্মিক শিক্ষা পূর্ণ করেন

হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান সাহেবের নিকট শুরু করিয়া খাজা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন সাহেবের নিকট। তিনি তরীকায় নকশবন্দীয়ার গদীনিশীন হন। তরীকায়ে নকশবন্দীয়া ব্যতীত অন্যান্য তরীকায়ও তিনি যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পীর খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানীর নামে লিখিত মাজমুয়া ফাওয়ায়েদে ওসমানী তিনি সংশোধন করেন এবং হাসিয়ায় লিখিত সংকেত দ্বারা তাঁহার নামের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। অনেক তরীকাপন্থী তদ্বারা উপকৃত হইয়াছেন। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাদান তাঁহার বিশেষ কাজ ছিল। অত্যন্ত কঠোরভাব তিনি বিদ্য়াতের বিরোধিতা করিতেন। সুন্নত ও একত্ববাদ প্রচারে সারা জীবন তিনি ছিলেন নিরলস। (৩) হজরত মাওলানা গোলাম হাসান (রঃ)ও হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন সাহেবের প্রসিদ্ধ খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁহাকে দ্বীন প্রচারের জন্য নির্বাচিত করিয়াছিলেন। অসংখ্য হিন্দু এবং শিখ তাঁহার উসিলায় ইসলাম গ্রহণের দ্বারা ধন্য হন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই কুরআনে হাফেজ ও আলেম হইয়াছেন। তিনি কোড়োচ খানায় একটি খানকা নির্মাণ করেন এবং তাঁহার পীরের নামে খানকার নামকরণ করেন খানকায়ে সিরাজিয়া। তাঁহার কেরামত অনেক। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁহার ফয়েজের উসিলায় বরকত ও কেরামতের সিলসিলা আজও জারী রহিয়াছে।

ইন্তেকাল

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন (রঃ) ১৮ বৎসর পর্যন্ত গদীনিশীন ছিলেন। এই সময় তিনি অগনিত মানুষকে হেদায়েতের পথ দেখাইয়াছেন। তিনি পবিত্র শরীয়াতের প্রচারের ও প্রসারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং সুন্নাতে রাসুলের উন্নতি ও প্রসারের জন্য অতুলনীয় খেদমত করেন। তিনি মুসলিম জাতিকে ইহকাল ও পরকালের উন্নতির দিকে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন। মাত্র ৩৫ বৎসর তিনি হায়াত লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষাংশে বাতে আক্রান্ত হন এবং হেকীম মুহাম্মদ আজমল খান সাহেবের নিকট দিল্লীতে চিকিৎসাধীন থাকেন। অতঃপর ২৬ শে রবিউল আউয়াল ১৩৩৩ হিজরীতে একেবারে জোয়ান বয়সে প্রকৃত প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতা হজরত খাজা মুহাম্মাদ ওসমান দামানীর নিকট দাফন করা হয়। হজরত এর এই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ইন্তেকাল একটি যুগের অবসান। কোন কোন ভক্ত তাঁহার ওফাতের তারিখ সম্বলিত কবিতা লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে রহিয়াছে মাওলানা হাকীম আব্দুর

রসূল সাহেব রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটির কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

آه اصد آه إقبلة علم = قطب اقطاب وقت شاه شهان
خواجة خوا جگان سراج الدين شمی اوج ولا يت وعرفان
خلف اسعد خليفة ارشد = غوث افاق حضرت عثان
كرد رحلت اريں جها نا گاه تير سمور صفحه داوران
دارد آن كس كه ديد حضرت را = سبنه بر يان ودمد ه
گر يان مركز فيض آن امام همام = شبرموسی زئی ست
درداماں بير تارنح وصل حضرت = بنوشتم زگلگ
خون افشان ازجيات رفته آفتاد زمين = شب غم سوخت
جان حسرتيان حال زارم چوديد هاتف غيب = كفت ستور
شد سراج جهان

—— o ——

মুজাদ্দেদে আসর, কাইউমে জামান, হজরত মাওলানা আবুস্ সায়াদ আহমদ খান কুদ্দুস সিররুহুর জীবনের ঘটনাবলী

হজরত ওয়ালার আসল নাম আহমদ খান এবং উপাধি আবুস সায়াদ। তাঁহার বংশের পুরুষানুক্রম এইরূপ ঃ আহ্‌মদ খান ইবনে মালিক মস্তি খান ইবনে মালিক গোলাম মুহাম্মদ ইবনে মালিক ফতেহ্ মুহাম্মাদ। বংশের নাম রাজপুত তালুকর। পেশা জমীদারী এবং নিজ এলাকার সরদারী। তাঁহার সম্মানিত পিতা মালিক মস্তি খান (রঃ)। তাঁহারা তিন ভাই ছিলেন। অন্য দুই ভাইয়ের নাম মালিক হাস্তি খান এবং মালিক মির্জা খান। তিন ভাইয়ের সন্তানরাই তিনটি খায়েলের সহিত প্রসিদ্ধ যথা, মস্তি খায়েল,হাস্তি খায়েল এবং মির্জা খায়েল। মস্তি খায়েলের প্রথম সরদার হজরত মাওলানা আবুস্ সায়াদ আহ্‌মদ খান সাহেব। তিনি উলুমে নববীর উত্তরাধিকারী, বিশিষ্ট ওলী ও গদীনিশীন ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা মস্তি খান (রঃ) এবং মির্জা খান (রঃ) এর সন্তান আবুস্ সায়াদ আহ্‌মদ খান এবং আবুল খলীল খান মুহাম্মদকে ওলীদের নেতৃত্ব প্রদানের জন্যই মনোনীত করিয়াছিলেন।

শুভ সংবাদের পূর্বাভাস

মালিক মস্তি খান সাহেব বাখড়া গ্রামে বাস করিতেন। নিকটেই বাস করিতেন তৎকালীন বিশিষ্ট বুজুর্গ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ সাহেব। এই বুজুর্গ আধ্যাত্মিক ভেদ ও দর্শন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখিতেন এবং খুবই প্রবীণ ছিলেন। তিনি মালিক মস্তি খান সাহেবকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। খাদেমগণকে তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ যখন মালিক মস্তি খান সাহেব আমার বাড়ীর নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিবেন, আমাকে তখন পালকিতে বসাইয়া তাঁহার সাক্ষাতের জন্য লইয়া যাইবে। কাজেই মালিক মস্তিখান যখন ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন, মাওলানা সাহেবের খাদেমগণ তখন তাঁহাকে পালকিতে উঠাইয়া তাঁহার নিকট নিয়া যাইতেন, সাক্ষাৎ হইত এবং কিছুক্ষণ পর মালিক সাহেব তাঁহার গন্তব্যস্থলে চলিয়া যাইতেন। মাওলানা সাহেব বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। মাওলানা সাহেবের খাদেমগণ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন, হজরত মাওলানা সাহেব একজন দুনিয়াদার জমীদারের এত সম্মান কেন করেন। খাদেমগণ যখন এই অবস্থা সহ্য করিতে পারিলনা তখন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিল, "আপনি একজন দুনিয়াদার জমীদারের এত সম্মান

কেন করেন? ইহার মধ্যে কি রহস্য আছে? আমাদের নিকট ইহা অসহ্য মনে হয়।" হজরত মাওলানা সাহেব বলিলেন ঃ তোমরা জাননা, আসলে আমি এমন একজন ওলীর সম্মান করি যিনি মালিক মস্তি খানের মাধ্যমে আগমন করিবেন। মালিক সাহেব যখনই এই পথ অতিক্রম করেন তখনই আমি সেই ওলীর নূরের সুগন্ধ অনুভব করি এবং অচিরেই আগমনকারী সেই মহান ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হইয়া যাই।

শুভ জন্ম

আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ রহমতে এখন ঐ শুভ সময় সমুপস্থিত। আমাদের সেই মহান ব্যক্তি বাখরা গ্রামের মিয়ানওয়ালী থানার বন্নু জেলায় মালিক মস্তি খান সাহেবের ঘরে ১২৯৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। মালিক মস্তি খান সাহেব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদের সহিত খুবই ভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতেন। এই কারণে শিশু বয়সেই হজরতে ওয়ালাকে তাঁহার অন্য ভাইয়ের সহিত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের নিকট লইয়া যান এবং দুই ভাইয়ের জন্য দোয়ার অনুরোধ করেন। হজরত মাওলানা সাহেব আহ্মদ খান সাহেবের জন্য ইল্মের দোয়া করিলেন এবং মালিক সাহেবকে বলিলেন ঃ এ ছেলেটিকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিও, কেননা এই ছেলে ধর্মীয় শিক্ষার উপযুক্ত। দ্বিতীয় ছেলে মুহাম্মাদ খান সম্পর্কে তিনি বলিলেন ঃ এই ছেলেটি বড় হইয়া পার্থিব ধন সম্পদ অধিকার করিবে। জীবনের প্রথম দিকে খুব শান-শওকতের সহিত কাটিবে কিন্তু একদিন তাহা বিলীন হইয়া যাইবে।

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন

পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, সাহেবজাদা আহ্মদ খান সাহেব জাহেরী ও বাতেনী ইলম্ (প্রকাশ্য ও গুপ্ত জ্ঞান) শিক্ষা করিয়া হজরতে কাইউমে জমান মাহবুবে রব্বুল আলামীন মাওলানা আবুস সায়াদ আহ্মদ খান নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দ্বিতীয় ভাই মালিক মুহাম্মদ খান সাহেব জাগতিক শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন এবং পরে কোয়েটায় সরকারী কর আদায়কারীর চাকুরীতে নিযুক্ত হন। কিছুকাল তিনি অত্যন্ত জাঁকজমক ও শান-শওকতের সহিত অতিবাহিত করেন। কিন্তু অতঃপর মাওলানা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই উজ্জ্বল নক্ষত্র বিলীন হইয়া যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, হিসাব নিকাশে ৩ টাকার গরমিলের জন্য তাঁহাকে চাকুরী হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল।

শিক্ষা জীবন

পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মাওলানা সায়াদ আহ্‌মদ খান সাহেব জমীদার বংশের ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুনিয়ার কাজ কর্মের সহিত দ্বীনদারীর প্রচলনও ছিল। মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ সহেব হজরতে আলাকে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁহার পিতাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই জন্য শৈশবেই তিনি স্থানীয় মসজিদে কুরআন শিক্ষা করেন। তাঁহাদের নিজেদের মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট তিনি কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁহার আরবী জ্ঞান শিক্ষা লাভের আগ্রহ হইল। কিন্তু আরবী ইল্‌ম শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে না থাকায় তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সিলওয়ান গ্রামে হজরত মাওলানা আতা মুহাম্মদ কোরাইশীর নিকট চলিয়া যান। ঐ অঞ্চলে মাওলানা সাহেবের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক সুনাম ছিল। ওস্তাদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁহাকে দেখিয়া মাওলানা সাহেব মনে করিলেন, এই ছেলে নিশ্চয়ই জমিদার বংশের হইবে এবং ভাবিলেন, জমিদার বংশের ছেলেকে আরবী পড়ানোর খেয়াল কিভাবে হইল? তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি এবং তুমি কার ছেলে?" জবাব পাইলেনঃ আমার নাম আহ্‌মদ খান। আমি মালিক মস্তি খান সাহেবের ছেলে। মাওলানা সাহেব তাঁহার পিতার নাম শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই ছেলে নিশ্চয়ই বাড়ী হইতে পালাইয়া আসিয়াছে এবং মাত্র দিন কয়েক অবস্থান করার জন্যই মাদ্রাসায় ভর্তি হইতে চায়। বড়লোকদের ছেলেরা সাধারণতঃ বড় বড় চুল রাখে। মাথা নেড়া করা মোটেই পছন্দ করিবেনা। তাই তিনি পরীক্ষা করার জন্য বলিলেন ঃ তুমি যদি সত্যই এই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করিতে চাও তাহা হইলে মাথা নেড়া করিয়া আস। কেননা, এখানে পড়াশুনা করার জন্য ইহাই প্রথম শর্ত।

মাওলানা সাহেবের ধারণা ছিল, এই ছেলে কখনও মাথা নেড়া করিবে না; বরঞ্চ এইখান হইতে চলিয়া যাইবে এবং তিনিও ঝামেলামুক্ত হইবেন। কিন্তু হজরত আলা ওস্তাদের এই আদেশ শোনা মাত্রই বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মাথা নেড়া করিয়া ওস্তাদের সামনে উপস্থিত হইলেন। ওস্তাদ আশ্চর্য্য হইলেন এবং বুঝিলেন যে, নিশ্চয়ই এই ছেলে ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে। অতএব তাঁহাকে ভর্তি করিয়া নিলেন এবং তাঁহার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। হজরত আলাও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লেখাপড়া করিতে থাকিলেন। তিনি এই ভাবিয়া বাড়ীতে কোন সংবাদ দিলেন না যে বাড়ীর লোকেরা তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারিলে হয়ত তাঁহাকে বাড়ীতে নিয়া যাইবে

এবং তাঁহার শিক্ষা অর্জন বন্ধ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ তিনি মাওলানা আতা মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট আরবী ছরফ ও নহরসহ প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়ার পর মিয়ানওয়ালী জিলার বন্দীয়ালে চলিয়া যান। সেখানে তিনি একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। হজরত মাওলানা নামী (রঃ) সেখানে শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহার নিকট তিনি শিক্ষা অর্জন আরম্ভ করিলেন। তখন পর্যন্তও তিনি বাড়ীতে কোন সংবাদ দেন নাই এবং কোন টাকা পয়সাও চান নাই। মাদ্রাসা হইতে যে আহার লাভ করিতেন, তাহাই ধৈর্য্য সহকারে খাইতেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেখানে তিনি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। হজরতে আলা স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেনঃ বন্দীয়ালে শিক্ষা অর্জনের সময় খানা প্রায়ই একদিন পর একদিন খাইতে হইত এবং তাহাও ছিল শুধু জওয়ের একটি মাত্র রুটি।

فقير خير گير بانان شعير = بسته فتر اك اوسلطان ومير

কিন্তু ইলমের পিপাসা এমনই যে জাগতিক বস্তু এবং দুনিয়াদারীর প্রয়োজনে এটা–ওটা না থাকা তাহার কাছে কিছুই না। ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি একদিন পরপর একটি রুটির উপর দিনাতিপাত করিতেন। দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষার মধ্যে দিনরাত্র এরূপ মগ্ন থাকিতেন যে খাওয়ার কথা মনেই আসিত না। হজরতে আলা প্রায়ই বলিতেন ঃ আমি পড়াশুনায় এতই মগ্ন থাকিতাম যে, আমার আশেপাশে কি হইত কিছুই অনুভব করিতে পারিতাম না।

অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকার একটি দৃষ্টান্ত

হজরতে আলা বলিয়াছেন ঃ আমার মাতাপিতা যখন জানিতে পারিলেন যে, আমি বন্দীয়ালে শিক্ষালাভ করিতেছি তখন আমার পিতা আমার ভাই মালিক মুহাম্মদ খানকে আমার অবস্থা জানার জন্য সেখানে পাঠাইলেন। তিনি ঘোড়সওয়ার হইয়া বন্দীয়ালে আসিলেন। মাদ্রাসায় পৌঁছিয়া সম্মানিত ওস্তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহ্‌মদ খান কোথায়?" সম্মানিত শিক্ষক বলিলেন, "বাহিরে হয়তো কোন গাছের নিচে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছে। শুনিয়া আমার ভাই আমার নিকট আসিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অথচ নিবিষ্টমনে পড়িতেছিলাম বলিয়া কিছু বুঝিতে পারি নাই। আমি কিতাব হইতে দৃষ্টি তুলিলে তিনি আমার সহিত কথা বলিবেন–এই প্রত্যাশায় অর্ধ ঘন্টা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। পরে তাঁহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইলে তিনি বলিলেন, যখন তোমাকে আমার দিকে ফিরিতে দেখিব তখন তোমার সহিত কথাবার্তা বলিব, এই প্রত্যাশায় আধঘন্টা যাবৎ আমি তোমার নিকট দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছি।

ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য হিন্দুস্থান যাত্রা

বন্দীয়ালে আরবীতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুস্থান গমন করেন। প্রথমে তিনি মুরাদাবাদ যান। সেখানে কিছুদিন শাহী মাদ্রাসায় পড়াশুনার পর কানপুর গমন করেন। মাওলানা আহ্মদ হোসাইন কানপুরী এবং মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব বাখরাবী সেখানে ফেকাহ এবং হাদীস শিক্ষাদান করিতেন। এই হজরতদ্বয়ের কাছেই তিনি দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ইতিপূর্বে বন্দীয়ালে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকালে তিনি কিরূপ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার বড় ভাই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অর্ধ ঘন্টা পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিলেন অথচ তিনি একটি বারও চোখ তুলিয়া তাকাইবার সময় পান নাই। ইহার দ্বারাই বুঝা যায় যে, দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়নের সময় তিনি কিরূপ মনোযোগী ছিলেন। ইহার সঠিক মূল্যায়ন কিছুটা তাহারাই করিতে সক্ষম হইবেন, যাহারা দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রদত্ত আগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছেন।

তরীকায় পূর্ণতা লাভ

মোট কথা, হজরতওয়ালা আরবী ফার্সীর পরিপূর্ণ শিক্ষা এবং কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হওয়ার পর তাঁহার প্রিয় দেশ বাখ্ড়ায় চলিয়া যান ও পরিপূর্ণরূপে শিক্ষালাভ করার পর আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে। আল্লামা হাফেজ সিরাজী যেরূপ বলিয়াছেন, তাঁহার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ ছিলঃ

کرائے یلتد نظر شاهباز سد دره نشین

نثمی ثو نه این گنج محنت آباداست

তিনি বন্দীয়ালে ছাত্র জীবনেই হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানী (রঃ) এর খলিফা হজরত সাইয়েদ পীর লা'য়াল শাহ্ (রঃ) এর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়া সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার ওজীফা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পর তাঁহার পীরের ইন্তেকাল হইলে তিনি খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানীর নিকট নূতন করিয়া বাইয়াত হওয়ার জন্য আবেদন পেশ করেন। হজরত খাজা সাহেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ঃ সাইয়েদ লায়াল শাহ্ এর সকল মুরীদই তাঁহার পীরের মুরীদ (অর্থাৎ আমার মুরীদ)। কাজেই তিনি তাঁহাকে বর্তমানে ইস্‌মে জাতের যিকির (অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ যিকির), যাহা শাহ্ সাহেবের নিকট হইতে লইয়াছেন, চালু রাখার এবং পূর্ণ ধ্যানে ইল্‌মে দ্বীন

হাসিলের জন্য ব্রতী হওয়ার পরামর্শ দিলেন। বলিলেন ঃ শিক্ষা সমাপনান্তে যদি তরিকা হাসিলের জন্য মনে প্রবল আগ্রহ অনুভূত হয়, তখন বাইয়াত হওয়ার প্রয়োজন হইবে। বাস্তবিক পক্ষে খাজা মুহাম্মদ ওসমান সাহেবেরই আন্তরিক দোয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষায় নিমগ্ন হইলেন। ইহাতে তিনি পরিপূর্ণতা অর্জন করেন। এবং খাজা সাহেবের পূর্বের উপদেশ পালনান্তে মারেফাতের জ্ঞান অর্জনের জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হইয়া হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানীর খেদমতে মুসাযায়ী শরীফে উপস্থিত হন। এখানে তিনি অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তাঁহার পরিপূর্ণতা অর্জন হইবে হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেবের নিকট। অন্তরে যিকিরের ব্যস্ততা তিনি পাইয়াছিলেন পীর লায়াল শাহ এর নিকট হইতে। উহা সমাপ্ত হইল। অতঃপর যখন ওলীত্বের প্রাথমিক পর্যায় শেষ করিলেন, তখনই হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান দামানী এই অস্থায়ী জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

পুনরায় বাইয়াত গ্রহণ

কোন পীরের ইন্তেকাল সত্যিকারের মুরীদদের জন্য একটি বিরাট দুর্ঘটনা। এই অবস্থায় মুরীদদের নিজ নিজ সঠিক স্থানে অবিচল থাকা বিশিষ্ট তরীকাপন্থীদের জন্যও কঠিন হইয়া উঠে। তিনি এরকম দুর্ঘটনার মধ্যে দ্বিতীয়বার পতিত হইয়াছিলেন। প্রথম দুর্ঘটনা ছাত্র জীবনে সংঘটিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিপর্যয় এমনই এক সময়ে আসে যখন তিনি আত্মিক সংশোধনের জন্য একজন উপযুক্ত পীরের কাছে নিজেকে ন্যস্ত করিয়া অত্যন্ত দ্রুততা ও যোশের সহিত তরীকার স্তরসমূহ অতিক্রম করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় রূহানী পৃষ্ঠপোষকের অনুপস্থিতি কত যে দুঃখজনক তাহা বর্ণনাতীত। লেখক উল্লেখ করেন ঃ আমিও আমার দুই পীরের ইন্তেকালে ঠিক এইরূপ দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আমার নিকট পৃথিবী অন্ধকার মনে হইতেছিল। দুঃখ–কষ্ট ও বেদনাদায়ক সেই দিনগুলি আমার অন্তর ও দৃষ্টিকে বিষন্ন রাখিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় প্রকৃত প্রতিপালক যদি দয়া এবং মেহেরবানী না করেন, তাহা হইলে তরীকাপন্থীরা সীমাহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া বিচার ও বিবেচনাচ্যুত হইয়া যায় এবং দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়।

যাহাই হোক, আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়ায় তিনি কোনরূপ সংশয় ও ইতস্তত ছাড়াই তাঁহার সমবয়সী পীর হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন (রঃ) এর

নিকট পুনরায় বাইয়াত হন। এইভাবে তিনি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক স্তরসমূহও অতিক্রম করিতেছিলেন।

পীরের সহিত সম্পর্ক

খাজা মুহাম্মদ ওসমানের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার পর নিজ পীরের প্রতি আলা হজরতের ভালবাসার যেরূপ মজবুত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সেই অবস্থায়ই হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন সাহেবের সহিত বিদ্যমান থাকে। মোট কথা, তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পীরের সংস্পর্শে থাকিয়া উচ্চ স্তর অর্জন করিতে থাকেন। পক্ষান্তরে, হজরত খাজা সাহেবও অত্যন্ত আদর ও আন্তরিকতার সহিত দয়া ও অনুগ্রহ দানে অকৃপন ছিলেন। আত্মিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার এরূপ অবস্থা ছিল যে, তাঁহার বারবার বাখাড়া হইতে মুসাযায়ী শরীফ পায়ে হাঁটিয়া আসা যাওয়া করা হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেবের নিকট কষ্টকর মনে হইতেছিল। তাই একদিন তিনি বলিলেন ঃ মাওলানা, আপনি পায়ে হাঁটিয়া আসা যাওয়া করিবেন না। কেননা, বাখাড়া হইতে এই পর্যন্ত আসিতে যতবার আপনি মাটিতে পদক্ষেপ করেন, ততবার তাহা আমার হৃদয়ের উপর পড়ে বলিয়া আমার বোধ হয়। এই উপদেশ অনুযায়ী তিনি ডেরা ইসমাঈল খান পর্যন্ত যানবাহনে যাওয়া আসা শুরু করিলেন। কিন্তু সেখান হইতে মুসাযায়ী শরীফ পায়ে হাঁটিয়াই যাইতে হইত। ঐ সময় সেখানে উট ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন ছিল না।

পীরের বিশেষ দৃষ্টি

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেব সায়াদ আহমদ খান সাহেবকে একান্ত আগ্রহী ও উন্মুখ দেখিয়া সর্বদা সুনজরে রাখিতেন এবং তাঁহার প্রতি স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টি প্রসারিত থাকিত। তাঁহার আগ্রহ দিন দিন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছিল, সে পরিমান আগ্রহ হজরত খাজা সাহেবের অন্তরেও বাড়িতেছিল। এই বিশেষ অবস্থার প্রকাশ হজরত খাজা সাহেব সরাসরিভাবে নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"ঐ সময় প্রকৃত মুরীদের অনুপস্থিতির কারণে আমার অন্তর নিরাশ হইয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও মনে হইত যে, পীর মুরীদি সিলসিলা বন্ধ করিয়া দেই। কিন্তু এখন মাওলানা সায়াদ আহমদ খান সাহেবের আসিবার কারণে মনের মধ্যে একটা আশার আলো দৃষ্টিগোচর হইল।"

অতঃপর হজরত সায়াদ আহমদ খান সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "মান পীরী ও মুরীদী বরায়েতু মিকুনাম" অর্থাৎ আমি এই পীর মুরীদি সিলসিলা

তোমার জন্যই চালু রাখিয়াছি। সুবহানাল্লাহ, কিরূপ আগ্রহ ছিল প্রার্থীর মধ্যে এবং কিরূপ দয়া ছিল দাতার মধ্যে।

যিকির ও তরীকার নিয়মকানুন পালনে উৎসাহ

হজরত মাওলানা আবুস সায়াদ আহমদ খান নিজ আধ্যাত্মিক জীবনে হজরত সিরাজ উদ্দিন (রঃ) এর মেহেরবানী ও দয়ার অধীনে যিকির ও ওজীফার সাধনায় এত গভীরভাবে নিমগ্ন ও ব্যস্ত ছিলেন যে আল্লাহর যিকিরের দ্বারা তাঁহার আভ্যন্তরীণ তাপ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। উহার লক্ষণ তাঁহার দেহে এরূপ প্রকাশ পাইত যে শীত মওসুমেও যদি জমাট ঘির পাত্র তাঁহার বুকর উপর রাখা হইত, তাহা হইলে সেই ঘি গলিয়া যাইত। বেশী যিকির করার কারণে তসবীহের মজবুত সূতা দুইচার দিনের মধ্যেই ছিঁড়িয়া যাইত এবং পুনরায় নতূন সূতা লাগাইতে হইত।

পীরের খেদমতের অতুলনীয় আগ্রহ

পীরের খেদমত সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি এরূপ সাহস ও মনোবলের অধিকারী ছিলেন যে, শীতের সময় সমস্ত রাত্রি শুধু একটি পাতলা কাপড়ের জামা পরিয়া পীরের দরজার সামনে যিকির ও অজীফার ব্যস্ততার মধ্যে এই আশায় প্রস্তুত থাকিতেন যে, পীর সাহেব যখন ঘর হইতে বাহিরে আসিবেন, তখন প্রথম দৃষ্টিই যেন তাঁহার উপর পড়ে এবং সেই দিনের সর্বপ্রথম খেদমত করার সুযোগ যেন তিনিই লাভ করিতে পারেন।

আশ্চর্যজনক আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক শক্তি

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন (রঃ) সুন সাকিসারের পাহাড়ী অঞ্চলেও একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে হজরত প্রায়ই সেখানে যাইতেন। মুরীদের একটি বিরাট দলও তাঁহার সহিত থাকিত। হজরত খাজা সাহেব এই দীর্ঘ এবং অত্যন্ত দুর্গম পথ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া অতিক্রম করিতেন। হজরতে আলা যাইতেন পায়ে হাঁটিয়া। তিনি মাটির কয়েকটি ঢিলা এবং পানির একটি পাত্র হাতে লইয়া হজরত খাজা সাহেবের ঘোড়ার আগে আগে দৌড়াইতেন, না জানি কখন তাঁহার প্রকৃতির প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং মাটির ঢিলা ও পানির প্রয়োজন হয়। মুরীদদের অন্য সবাই উটের সওয়ার অথবা পায়ে হাঁটিয়া যাইতেন। তাহারা অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতেন। প্রতিধাণযোগ্য এই যে, ইহা কোন দুই চার মাইল দূরত্বের সফর ছিলনা, ছিল ৩৫–৪০ মাইলের সফর। হজরতে আলা দৌড়াইয়াই এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেন।

পানি আনার খেদমত

আলা হজরত বলিয়াছেন ঃ ঐ সময় আমার এরূপ দৈহিক শক্তি ছিল যে, এক মটকা পানি আঙ্গুলের সাহায্যে উঠাইয়া নিতাম এবং মুখে লাগাইয়া পান করিতাম। সুন সাকিসারে অবস্থানকালে পাহাড়ের ঝরণা ছিল খানকা হইতে অনেক দূরে এবং নীচে ছিল দুইটি মশক। প্রতি মশকে সাত কলসি করিয়া পানি ধরিত। নীচের ঝরণা হইতে মশক ভরিয়া নিজের কাঁধে তুলিয়া খালি পায়ে দৌড়াইয়া খানকায় পৌঁছাইতাম এবং এইভাবে সম্পূর্ণ লংগরখানা ভরিয়া ফেলিতাম। অন্যরা দুই মশকতো দূরের কথা, এক মশকও তুলিবার শক্তি রাখিত না।

দরিয়াখানে অবস্থান

হজরত সিরাজ উদ্দিন (রঃ) দরিয়াখানের বাংলোতেও কখনও কখনও অবস্থান করিতেন। কোন কোন সময় হজরতে আলা তাঁহার পরিবার পরিজনসহ হজরত খাজা সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার বড় মেয়ে বলেন, তখন আমার বয়স ৪/৫ বৎসর হইবে, আমার আব্বার সহিত সেখানে যাওয়া আসার কথা আমার মনে আছে।

তরীকার গ্রন্থরাজির সবকসমূহ

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেব (রঃ) এর খেদমতে আমাদের আলা হজরত যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে মাকামাতে মুজাদ্দেদীয়ার স্তরসমূহ দ্রুত অতিক্রম করিয়াছেন, এযুগে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তিনি বিস্তারিতভাবে নকশবন্দীয়া এবং মুজাদ্দেদীয়া তরীকায় পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছেন এবং সাথে সাথে তরীকার একাধিক কিতাব হজরতে শায়েখের নিকট সবক নিয়া পড়িয়াছেন।

ইমামে রব্বাণী (রঃ) এর মকতুবাতের পাঠ

একবার হজরত খাজা সাহেব (রঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও দয়ার কারণে বলিলেন ঃ মাওলানা সাহেব, একটি ওয়াদা আমি আপনার সহিত

করিতেছি এবং আপনিও একটি ওয়াদা আমার সহিত করুন। তিনি কোন কিছু চিন্তা ভাবনা না করিয়া সংগে সংগে উত্তর দিলেন ঃ হজরত, আমার তরফ হইতে ওয়াদা করিতেছি যে, আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহা গ্রহণ করিব। অতঃপর হজরত খাজা সাহেব বলিলেন ঃ আপনি আমার সহিত এই ওয়াদা করুন যে, যতদিন পর্যন্ত মাকতুবাতে ইমামে রব্বানীর সবক শেষ না হয়, আপনি দেশে যাইতে পারিবেন না। এবং আমিও এই ওয়াদা করিতেছি যে, প্রত্যেক মাকতুবের সবকে পূর্ণ খেয়াল করিব। আলা হজরত এই সুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত খুশি হইলেন। অতএব জরুরী ভিত্তিতে হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানীর মাকতুবাতের অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। খাজা সাহেবও প্রত্যেকটি সবক শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। হজরতে আলা বলিতেনঃ প্রথম প্রথম সবক এবং খেয়ালের মধ্যে আমিও তেমন কোন বিশেষ মারেফতী চিন্তাধারা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। একদিন হজরত খাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি খবর মাওলানা সাহেব, কোন উপকার মনে হইতেছে না? না বুঝিতে পারার কথা শুনিলে হয়ত তাঁহার মন অসন্তুষ্ট হইবে, তাই বলিলামঃ জ্বি হজরত, অনেক অনেক উপকার অনুভূত হইতেছে।

হজরতে আলা আরো বলিয়াছেন ঃ তখন ওয়াদা অনুযায়ী সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া অধ্যয়ন শেষ করিয়াছি। ইহার পর হইতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০টি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ পীরের ধ্যানের সেই প্রভাব আমার উপর এখনো রীতিমত প্রকাশ পাইতেছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ, মুজাদ্দেদীয়া তরীকার সকল স্তর এবং ইমামে রব্বানীর বিশেষ বিশেষ পরিচয়ের সুফল প্রকাশ্যেই পাইতেছি।

খেলাফত দান

হজরতে আলার যখন তরীকার শিক্ষা সর্বদিক হইতে পরিপূর্ণ হয়, তখন হজরত খাজা সাহেব তাঁহাকে সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়া এবং অন্যান্য সকল তরীকার খেলাফত দান করেন। তখনও তিনি তাঁহার নিজের দেশ বাখরা গ্রামেই বসবাস করিতেছিলেন। এদেশের লোকজন ইত্যবসরে তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং আকাংখিত ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়া তরীকার ফয়েজ ও বরকতের দ্বারা ধন্য হইতে লাগিল।

সরল বিশ্বাসের একটি ঘটনা

একবার হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন (রঃ) মুরীদানদের সহিত একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। হজরতে আলা আবুস সায়াদ আহমদ খান (রঃ) তখন একজন খাদেমের ন্যায় মেহ্‌মানদারীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি রান্না ঘরে বসিয়া হজরত খাজা সাহেবের জন্য চা বানাইতেছিলেন। পক্ষান্তরে, অন্য মুরীদগণ হজরত খাজার সান্নিধ্যে লাভবান হইতেছিলেন। ইতিমধ্যে হজরতে আলার মুরীদ জনৈক মহিলা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি দেখিলেন, অনেক লোক বসিয়া আছেন এবং বড়পীর সাহেব অত্যন্ত সম্মানের সহিত সেখানে তাশরীফ রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহার চোখ তাহার নিজের পীর সাহেবকে খুঁজিতেছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার পীরও হয়ত ভিতরেই বসা আছেন। তাই তিনি বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজা ও দেয়ালের আড়াল হইতে ভিতরে দেখিতেছিলেন। কয়েকবার এই রকম উঁকিঝুঁকি দেওয়ার পর হজরত খাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই মহিলা এখানে কেন আসিয়াছেন? এক খাদেম বলিলেন, তিনি তাঁহার পীর হজরত আহমদ খান সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তখন হজরত খাজা সাহেব উচ্চস্বরে বলিলেন ঃ যাও, তোমার পীরসাহেব রান্না ঘরে চা বানাইতেছেন। সেই মহিলা সেখানে গেলেন এবং হজরতে আলাকে একনজর দেখিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার উপর হজরত খাজা সাহেব (রঃ) বলিলেন ঃ সৎ বিশ্বাস ও সত্যিকারের পীর মুরীদের সম্পর্ক এই মহিলার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ, কেননা, তিনি তাঁহার পীর ব্যতীত অন্য কাহারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও পছন্দ করেন নাই।

হজরত খাজা সাহেবের পরামর্শ

হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন কুদ্দুসুসিররুহ যখন হজরতে ওয়ালার কামালাত এবং তরীকার উপর দৃঢ়তা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি তরীকার সকল মুরীদকে পরামর্শ দিলেন যে, যাহারা দূরদূরান্তে বাস করেন এবং যাতায়াতের কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম তাহারা মুসাযায়ী শরীফে না আসিয়া হজরত মাওলানা আবুস সায়াদ আহ্‌মদ খান সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে তরীকার সবক লাভ করিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ্‌ তাহারা আমার নিকট আসিবার চাইতেও বেশী লাভবান হইবেন।

বাখড়া হইতে খাওলা শরীফে স্থানান্তর

বাখড়া গ্রাম সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সমুদ্রে প্লাবন আসিলেই এ গ্রামটি ভাসিয়া যাইত। প্লাবন থামিবার পর পুনরায় আবাদ হইত। তিনি মারেফাতে পরিপূর্ণ শিক্ষায়ত্ত করার পর পীরের অনুমতিক্রমে সেখানে যখন গদীনিশীন হন, তখন একবার প্লাবন আসিল এবং সম্পূর্ণ গ্রামটি ধ্বংস হইয়া গেল। কাজেই হজরত আলা সেই স্থান হইতে খাওলা গ্রামে গিয়া বসবাস শুরু করেন। কিছুকাল তিনি খাওলা শরীফে অবস্থানের পর যখন ঐ গ্রামও স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হইল তখন তিনি একটি নূতন এলাকা আবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন, বর্তমানে যাহা খানকা সিরাজিয়া নামে সুপরিচিত হইয়াছে।

খানকা সিরাজিয়া মুজাদ্দেদীয়ার ভিত্তি স্থাপন

খানকা সিরাজিয়া স্থাপনের কাজ সম্পর্কে বর্ণনা প্রদানের পূর্বে সংক্ষেপে ঐ সকল বর্ণনাকারী ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া উচিৎ মনে হইতেছে। তাঁহাদের স্মরণশক্তি ও মেধা প্রশংসার দাবী রাখে। ইহার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সূফী মোঃ নওয়াজ খান সাহেব ওরফে মাওয়াজ খান সম্পর্কে কিছু বলা। তাঁহার বাড়ী মিয়ান ওয়ালী জেলায়। তাঁহার নিকট হইতে এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁহার বয়স অনুমান ৯০/৯৫ বৎসর হইবে। আল্লাহ তাঁহাকে আরো হায়াত দারাজ করুন। তিনি মধ্যম শ্রেণীর একজন জমীদার ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁহার ৫ জন ছেলে ছিল। জীবদ্দশায় তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ছেলেকে ৬ একর করিয়া দেওয়ার পর নিজের জন্য ৬ একর রাখিলেন যাহাতে বাকী জীবনে তাঁহার কোন কষ্ট না হয়। তিনি হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন সাহেবকে ভাল করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত বসবাসের বরকত হাসিল করিয়াছেন। কিন্তু বাইয়াত হইয়াছেন মাওলানা আবুস সায়াদ আহমদ খান সাহেবের নিকট। বাইয়াত গ্রহণের সময় তাঁহার বয়স অনুমান ২৫/২৬ বৎসর ছিল। আলা হজরত তখন খাওলা শরীফে বসবাস করিতেন। বাখড়া হইতে খাওলা গ্রাম ২/৩ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্র উপকূল হওয়ার কারণে এই অঞ্চল সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হইত।

মিয়া মাওয়াজ খান তাঁহার মুরীদ হওয়ার ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করেনঃ তাঁহার বন্ধু হাফেজ আহমদ সাহেব একবার রমজান মাসে চাহ্‌ফাতা মুহাম্মদওয়ালী মসজিদে কুরআন শরীফ শুনাইতেছিলেন। হাজী মাওয়াজ খান সাহেবও তারাবীতে শরীক হইতেন। হাফেজ সাহেব একদিন তারাবীহ নামাজের পর শয়নের জন্য খোলা মাঠে

চৌকি পাতেন। সুফী মাওয়াজ খান সাহেবও তাঁহার নিকট শুইয়া পড়িলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, হাফেজ সাহেব গাঢ় নিদ্রা যাইতেছেন। এই রকম মনে হইতেছিল যেন কোন শিশু উচ্চ স্বরে আল্লাহ আল্লাহ বলিয়া ডাকিতেছেন। হয়ত কোন বাচ্চা আশে পাশেই আছে বলিয়া মনে হইল। তিনি এদিক ওদিক তাকাইলেন কিন্তু কোন কিছুই নজরে পড়িল না। তালাশ করিতে করিতে হাফেজ সাহেবের খাটের নিকট পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আল্লাহ, আল্লাহ শব্দটি হাফেজ সাহেবের শ্বাসের সহিত বাহির হইতেছে। তিনি অতি প্রভাবান্বিত হইলেন এবং সকালে হাফেজ সাহেবের নিকট বলিলেন, আপনি যে খানকার মুরীদ হইয়াছেন আমাকেও সেইখানের মুরীদ করিয়া দেন। আমার অন্তরেও আল্লাহ আল্লাহ যিকির করার আগ্রহ হইতেছে। হাফেজ সাহেব খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেবের মুরীদ ছিলেন। সুফী মাওয়াজ খান সাহেবের এই আবেদনক্রমে হাফেজ সাহেব বলিলেনঃ আমার পীর হজরত খাজা সাহেব এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দকে দূরত্বের কারণে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, তাহারা যেন খাওলা শরীফে গিয়া মাওলানা আহমদ খান সাহেবের নিকট বাইয়াত হন এবং তাঁহার সুহবাতের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করেন। হাজী মাওয়াজ খান সাহেব বলেনঃ এই কথা শুনিয়া অন্তরে হজরতে আ'লার প্রতি আগ্রহ জন্মাইল। আমি মালিক ফাতাহ মুহাম্মদ সাহেবের সহিত খাওলা শরীফে উপস্থিত হইয়া আলা হজরতের নিকট বাইয়াত হওয়ার আবেদন জানাইলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় আবেদন মঞ্জুর হইল এবং আমি তরীকায়ে পাকে প্রবেশ করিলাম।

খানকা শরীফের ভিত্তি স্থাপনের তৎপরতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, খাওলা শরীফ সমুদ্র উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল হওয়ার কারণে উহা স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে উপযুক্ত ছিল না। এতদ্ব্যতীত হজরতে আ'লার পৈত্রিক সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল না। যেটুকু ছিল তাহা বেশীরভাগই ফসলি জমি। এই সমস্ত সম্পত্তিতে অন্য ভাইরাও অংশীদার ছিলেন। তাঁহার আরো চার ভাই ছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন (১) মালিক মুহাম্মদ খান, (২) মালিক হাকিম খান (৩) মালিক খান মুহাম্মদ (৪) মালিক মুহাম্মদ খান (৫) মাওলানা আহ্মদ খান সাহেব অর্থাৎ আ'লা হজরত কুদ্দুসুসিররুহু।

আলা হজরতের গরীবি অবস্থা

সকল শরীকি সম্পত্তি চার ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি কোন মওসুমে উৎপন্ন ফসলের অংশ চাহিতেন না, যেন তিনি ছিলেন খাওলা শরীফের অন্যতম বড়লোক। অন্য ভাইগণই সম্পত্তির মালিক ও ভোগ দখলকার ছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে

ফসলের কিছু অংশ তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। অথচ হজরতে আ'লার সম্মানিত পিতার ফসলি জমিই ছিল তিন হাজার কেনাল। বিভিন্ন মওসুমে বিভিন্ন উপায়ে জমিতে ফসল ফলান যাইত। তাঁহার ভাগে ছয় শত কেনাল পড়ে যাহা স্থানীয় হিসাবে ছয় মোরাব্বা হয়। অথচ তাঁহাকে স্বেচ্ছায় পাঠাইয়া দেওয়া এক গুনী চনা ছাড়া আর কিছুই তিনি দাবী করিতেন না। এই সামান্য ফসল তাঁহার লংগর খানার জন্য কিছুই হইত না। কেননা ঐ টুকু ফসল একটি ঘোড়ার এক মাসও চলিত না। সে সময় তাঁহার পরিবারের লোক সংখ্যা ৪ জন এবং স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী মুরীদের সংখ্যা ১০ হইতে ১২ জন ছিল। এই জন্য ১৫/১৬ জন লোকের খাওয়া দাওয়া এবং গৃহপালিত পশুদের খাবারের খরচ বাবদ মাসে ১৫০ টাকার মত লগিত। এই সকল খরচ হজরতে আলাকেই বহন করিতে হইত এবং প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালাই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

আলা হজরত অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে এবং উচ্চ সাহসিকতার সহিত মুরীদদের আদর যত্ন এবং প্রশিক্ষণ দান করিতেন। কিন্তু কখনও ভাইদের নিকট হইতে বাসার প্রয়োজনে অথবা লংগরখানার খরচ বাবদ তাঁহার ফসলি জমির উৎপন্ন ভাগ দাবী করেন নাই। সম্পত্তি ভাগ করার প্রতিও তাঁহার কোন আগ্রহ ছিলনা। কোন কোন দরদী মুরীদ এবং একান্ত খায়েরখাহ্ লোক চাহিতেছিলেন যে, যদি উৎপন্ন ফসলের পরিপূর্ণ অংশ হুজুর পাইতেন অথবা সম্পত্তি ভাগ হইত তাহা হইলে হজরতে আ'লার পরিবারের সদস্যদের এবং সেইসাথে মুরীদদেরও একটা সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইত। তাছাড়া খাওলা শরীফ হইতে ঘর স্থানান্তরিত করিয়া কোন স্থায়ী জায়গায় নিয়া যাওয়াও একটি সমস্যা ছিল এবং উহার সমাধান ছিল একান্ত জরুরী। এই জন্য দরবার শরীফের দুইজন অত্যন্ত সাহসী মুরীদ মিয়া আল্লাহ ইয়ার তালুকর এবং সুফী মাওয়াজ খান আ'লা হযরতের নিকট সম্পত্তি ভাগ করার প্রস্তাব দিয়া বলিলেনঃ যদি সম্পত্তি ভাগ হইয়া হুজুরের অংশ পৃথক হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা আপনার কতিপয় খাদেম সেই জমিনের যাবতীয় দেখাশুনার এবং চাষাবাদের ব্যবস্থা করিব। কিন্তু তিনি তাহাদের এই আবেদনের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দিলেন না বরং মালিক আল্লাহ ইয়ার সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ মিয়া আল্লাাহ ইয়ার, দিনতো অতিবাহিত হইতেছেই, কেন শুধু শুধু অস্থিরতা খরিদ করিতেছ। তাছাড়া আত্মীয়দের মনে ব্যথা দিয়াই বা কি লাভ

কিছুদিন পর পুণরায় আল্লাহ ইয়ার সাহেব মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবকে সেই কাজের প্রতি উৎসাহিত করিলেন। তাঁহারা সাহসের সহিত সম্পত্তি বন্টনের উপর আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, হজরতে আ'লা, যখন সম্পত্তির মধ্যে আইনত

নিজের অংশ থাকে তখন উহা গ্রহণ না করিয়া সংসারের ব্যয়ভার কঠিন করিয়া তোলা নিজেরই ভুল মনে করিতে হইবে। পবিত্র শরীয়াতে ইহার উপর কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহা আপনি ভাল করিয়াই জানেন। অতএব আমাদের খেয়ালে আপনজনদের অধিকার আদায় করার জন্য শরীয়াত অনুযায়ী সম্পত্তি দখল করা একান্তই নেকের কাজ হইবে। তাছাড়া উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি। স্বয়ং পরিবার পরিজন এবং খাদেমদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান ও খানকা নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক আলোচনা এবং অনুরোধের পর শেষ পর্যন্ত হজরতে আ'লা সম্পত্তি ভাগ বন্টনের ব্যাপারে তাঁহার ভাইদের সহিত আলোচনা করার অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাওয়ার পরের দিন প্রত্যুষেই মিয়া আল্লাহ ইয়ার খান এবং মাওয়াজ খান আলা হজরতের সম্মানিত ভাই মালিক গোলাম মুহাম্মদ এর নিকট পৌঁছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাদের দুইজনের এক সংগে উপস্থিত হওয়াতে মালিক সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন এবং তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আলা হজরতের কেরামত বা বুযুর্গী

তাঁহাদের উভয়েরই আশংকা ছিল যে, সম্পত্তি বাটোয়ারার কথা শুনিয়া মালিক সাহেব ও অন্য ভাইগণ ক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারেন। তাই হজরতে আলার সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখিয়া অত্যন্ত নম্র ও আদবের সহিত বলিলেনঃ হজরত সাহেবের লংগর এবং পরিবারের খরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে যে যদি হজরতের জমীনের অংশ পৃথক করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার খাদেমদের দ্বারা আবাদ করানো হইবে। ইহা হজরতের জন্য আরামের কারণ হইবে এবং সংসারের খরচের স্বচ্ছলতা আসিবে। ইহা শুনিয়া মাওলানা মালিক গোলাম মুহাম্মদ সাহেব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তৎক্ষনাৎ বলিলেনঃ খুব ভাল কথা, আপনারা উভয়েই আমার সহিত চলুন। আমি এখনই জমি মাপিয়া চিহ্ন দিয়া দিতেছি। তিনি প্রায় ৫০০ কেনাল বকরা উচুঁ জমি এবং ১০০ কেনাল নিচু জমি মাপিয়া খুঁটি বসাইয়া দিলেন। মালিক গোলাম মুহাম্মদ খান সাহেব হজরতে আলার দুই খাদেমকেই অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। বাটোয়ারার কাজটি তাই অতিশয় সন্তুষ্টির মধ্যে সম্পন্ন হইয়া যায়। সম্পত্তি বাটোয়ারার কাজ সম্পন্ন হওয়ার সংগে সংগে মিয়া আল্লাহ ইয়ার এবং মাওয়াজ খান খাওলা শরীফে হজরতে আলার খেদমতে উপস্থিত হন।

হজরতে আলা সকল বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেনঃ হুজুর, আমরা আপনার কেরামত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জনাব মালিক গোলাম মুহাম্মদ এর

সহিত কথা হইয়াছে, এবং তিনি কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া জমি ভাগ করিয়া দিয়াছেন। আমরা সীমানা ঠিক করিয়া সেখানে খুঁটি বসাইয়া আসিয়াছি। জমি চাষাবাদের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছি যে, মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব নিজ গ্রাম হইতে ১২ খানা হাল আনিয়া বর্তমান রবি ফসলের জন্য গন্ধম এবং চনা চাষ করিয়া দিবেন।

ঘর নির্মাণ এবং কূপ খনন

হজরতে আলা কুদ্দুসু সিররুহু খাদেমদের এই কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেনঃ এখন আমাদের সর্বপ্রথম কূপ খনন এবং মসজিদ ও ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা দরকার। এই সকল নির্মাণাদির জন্য স্থান নির্বাচন করিতে হইবে। যখন এই আলোচনা হইতেছিল তখন বেলা ১০টা হইবে। মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব বলিলেনঃ হুজুর, জোহর পর্যন্ত সময় দান করুন, তাহা হইলে আমি চিন্তা ভাবনা করিয়া কিছু বলিতে পারিব। হজরতে আলা ইহা শুনিয়া বলিলেনঃ মিয়া মাওয়াজ, একটি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং তুমি মাত্র জোহরের সময় পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত সময় চাহিতেছ? মিয়া মাওয়াজ বলিলেন, হুজুর, যাহা কিছু আমার নগণ্য মতামত হইবে তাহা বলিয়া দিব। অতঃপর হজরতে ওয়ালার বরকতময় ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার মধ্যে বেশী কম করা যাইবে। হজরত বলিলেন, খুব ভাল কথা।

প্রস্তাব

মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব চিন্তা ভাবনার পর জোহরের সময় আলা হজরতের নিকট বলিলেনঃ উচুঁ তিন শত কেনালের একটা প্লট আছে। আমার মতে এইখানে খনন এবং মসজিদ ও ঘর নির্মাণ করা হইলে খুব ভাল হইবে। প্রস্তাব শুনিয়া হজরতে আলা বলিলেনঃ ভাল কথা, প্রথমে আমাকে নিয়া ঐ প্লটটি দেখাও। হজরত কেবলা অশ্বারোহী হইলেন। মিয়া আল্লাহ ইয়ার খান সাহেব এবং মাওয়াজ খান সহ সকল খাদেম দেখিতে গেলেন (বর্তমানে যেখানে খানকা শরীফ বিদ্যমান)।

অনুমোদন

প্লটটি দেখার পর হজরতে আলা প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেনঃ এই প্লটেই নির্মাণাদির কাজ হওয়া উচিৎ। তিনি মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবকে বলিলেনঃ পা দিয়া মাপিয়া বাড়ীর সীমানার জন্য সাত কেনাল জমি তুমিই ঠিক করিয়া দাও। মাওয়াজ খান সাহেব তদনুযায়ী পা দিয়া মাপিয়া জায়গাা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া বলিলেন, বাড়ীর জন্য জায়গা মাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ঘরের জন্য যে জায়গা নির্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা আমার জমিনের শেষ সীমানার কিছু অংশ ছড়িয়া নির্দিষ্ট

করিয়াছ কি? নাকি একেবারে শেষ সীমানায় চিহ্ন দিয়াছ? উত্তরে মাওয়াজ খান বলিলেন, আপনার মালিকানার শেষে চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। হজরত বলিলেনঃ ইহা ঠিক হয় নাই। সীমানা হইতে ৫০ কদম জমিন ছাড়িয়া ঘর নির্মাণ করা উচিৎ; কারণ, কখনও যদি নিজেদের কোন গরু মহিষ ছুটিয়া যায় তাহা হইলে যেন উহা নিজেদের জমিনেই হাঁটাচলা করিতে পারে, ক্ষতি করিলে যেন নিজেদেরই করে, অন্য কোন প্রতিবেশীর ক্ষেত বিনষ্ট না করে। কাজেই হজরতে আলার বরকতময় ইচ্ছা অনুযায়ী দ্বিতীয়বার মাপিয়া নিজেদের সীমানা হইতে ৫০ কদম জমিন ছাড়িয়া স্থান নির্দিষ্ট করা হইল।

খাওলা শরীফ হইতে বাসস্থান স্থানান্তর

মিয়া নামদার খান সাহেবের বর্ণনা মতে, একবার হজরতে আলা খাওলা শরীফ হইতে গুলমেরীতে আমাদিগকে এই খবর পাঠাইলেন যে, আমরা যেন তাড়াতাড়ি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হই। কাজেই আমরা ১০/১৫ জন লোক সংগে সংগে আদেশ পালনার্থে হজরতের পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তখন সমুদ্রের পানি বাড়িতেছিল এবং তিনি সমুদ্রের কিনারে হাঁটিতেছিলেন। হজরত থাকার ঘর ভাঙ্গার হুকুম দিলেন। আমরা হজরতের সকল ঘর দুয়ার ভাংগিয়া একান্ত আবশ্যকীয় জিনিষপত্র একটি নিরাপদ জায়গায় রাখিলাম। হজরত পরিবার পরিজনদের, কুতুবখানার এবং ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র মিয়া গোলাম মুহাম্মদ সাহেব কাদেরী চিস্তির খানকায় পাঠাইয়া দিলেন। রক্ষণাবেক্ষণের এই পদক্ষেপ গ্রহণের মাত্র দুই তিন দিন পরই সমুদ্রে এক ভয়াবহ প্লাবন আসিয়া গ্রামের সকল ঘরবাড়ী ভাসাইয়া নিয়া যায়। সোবহানাল্লাহ, হজরতের অভিজ্ঞ দৃষ্টি আশ্চর্যজনক দুর্ঘটনার কবল হইতে আল্লাহর ইচ্ছায় বাঁচিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। তিনি ইলম ও আদরের অমূল্য কিতাবাদি নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করাইয়াছিলেন। অন্যান্য সকল ব্যবস্থাও ঠিক সময়মত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে খাদেমগণ এবং পরিবারের অন্য সকল সদস্য সহিসালামতে ছিলেন। তাঁহার অস্থায়ী বাসস্থান গোলাম মুহাম্মদ সাহেব চিস্তি ও কাদেরীয় খানকা খানকায়ে নুর মুহাম্মদের অতি নিকটেই অবস্থিত। এখানে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার খানকার প্রস্তাবিত ঘরসমূহ, মসজিদ এবং কূপ ইত্যাদি নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উল্লেখিত নির্মাণাদির কাজ যখন শেষ হইতেছিল তখনই তিনি তাঁহার স্থায়ী বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

কূপ নির্মাণ

অতঃপর কূপের খননকাজই সর্বাধিক প্রয়োজন বোধ হইল। কেননা পানির প্রয়োজনই সর্বাধিক। এই অঞ্চলের একটি পুরাতন রেওয়াজ এই ছিল যে, যে ব্যক্তি

নিজের বাড়ীতে কূপ খনন করিতে চায় সে সকল গ্রামবাসীকে ঐ কাজের জন্য দাওয়াত দেয়। সবাই নিজ নিজ কোদাল সহ আসে এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই কূপ খনন কাজে অংশ গ্রহণ করে। এমন কি, তাহাদের রীতি অনুযায়ী নিজ নিজ আহারও বাড়ী হইতে খাইয়া আসিত। গ্রামবাসীদের খবর দেওয়া হইল যে মাওলানা আহমদ খান সাহেবের বাড়ীতে কূপ খনন করা হইবে। খবর পাওয়া মাত্রই ১২০ জন যুবক কোদাল ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। সূফী মাওয়াজ খান সাহেব তাহাদিগকে মিষ্টি মুখ করাইবার জন্য নিজ গ্রাম হইতে তিন বস্তা গুড় নিয়া আসিলেন।

কাজ আরম্ভ

আলা হজরত মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবকে বলিলেনঃ কূপের খনন কাজে প্রথম কোপ আপনিই দিবেন, ইহার পর অন্য সবাই শুরু করিবে। আদেশ অনুযায়ী মাওয়াজ খান সাহেব বিসমিল্লাহ বলিয়া প্রথম কোপ দিলেন। অতঃপর অন্য সবাই শুরু করিল। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ১২ ফুট চওড়া এবং ১০ ফুট গভীর খনন কাজ শেষ হইল। দ্বিতীয় দিন ১৮ ফুট গভীর করা হইলে পানি পাওয়া গেল। পানি অত্যন্ত মিষ্ট ছিল। সকলেই এই বরকতময় পানি পান করিল এবং সকলকে গুড় বিতরণ করা হইল।

কূপ নির্মাণ কালে

প্রথম দিন ১২০ জন লোক কূপ খনন কাজে অংশ গ্রহণ করে। ইহার পর ৮/১০ জন লোক সর্বদা কাজ করিতেছিল। এই প্রশস্ত এবং গভীর কূপ মোট ১৩ দিনে সম্পন্ন হয়। ৪/৫ দিন পর্যন্ত সবাই নিয়ম অনুযায়ী নিজ নিজ বাড়ী হইতে খাইয়া আসিত এবং আবার বাড়ী ফিরিয়া খাইত। কিন্তু হজরতে আলা নির্দেশ দিলেনঃ সকল কর্মী দুপুরের খানা আমার এখানে খাইবে। মিয়া আল্লাহ ইয়ার সাহেব ইহার ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি খাওলা শরীফ হইতে আহার রান্না করিয়া আনিতেন এবং সকল কর্মী হজরতে আলার বরকতময় দস্তরখানে আহার করিত।

বাড়ীর কাঁচা দেয়াল নির্মাণ

কূপ নির্মাণের কাজ শেষে এখন মসজিদ এবং অতঃপর বাড়ী নির্মাণের পালা। প্রথম মসজিদ এবং বাড়ীর চতুর্দিকের প্রাচীর দেওয়া হয়। সবশেষে মসজিদ এবং ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হইল। মোট ৬০ টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়।

মসজিদ নির্মাণ

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আলা হজরতের মন ও মেজাজের মধ্যে এক ধরণের বিশেষ সূক্ষ্মতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা দান করিয়াছিলেন। স্থায়ীভাবে অবস্থানের পর

তিনি একটি ছোট অথচ অতি সুন্দর ও মনোরম মসজিদ নির্মাণ করান। প্রথমে বাড়ীর ঘরসমূহ এবং কক্ষ ইত্যাদি কাঁচা তৈয়ার হইয়াছিল। পরে পাকা মসজিদের কাজ আরম্ভ করা হয়। কূপের উত্তরে মসজিদ এবং মসজিদের উত্তরে বাড়ী নির্মিত হয়। শাহপুরের অধিবাসী জালাল উদ্দিন মিস্ত্রী কূপ ও মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করেন। অনুমান পৌনে এক কেনাল উঁচু জমিনে মসজিদটি নির্মিত হয়। ভিতরের অংশ এবং বারান্দায় দুই সারি করিয়া এবং প্রত্যেক সারিতে অনুমান ১৪/১৫ জন নামাজীর নামাজ আদায়ের স্থান এবং মসজিদের বাহিরের বারান্দায় ৫/৬ টি কাতারের জায়গা করা হয়।

মসজিদের প্রাথমিক নমুনা

প্রাথমিক পর্যায়ে মসজিদের সামনে একটি ৩০-৩৫ ফুট লম্বা দালান এবং দালানের উত্তর দিকে দুইটি কাঁচা কামরা ছিল। একটি অনুমান ১৬/১৭ ফুট লম্বা এবং দ্বিতীয়টি ছিল ২৫/৩০ ফুট লম্বা। এই কামরার সহিত পূর্বদিকে আসা যাওয়ার দরজা এবং মসজিদের মাঝখানে একটু খালি জায়গা ছিল। ইহার পর দুইটি কামরা ছিল মসজিদের উত্তর দেওয়ালের সাথে। ইহার একটি ছিল কুতুবখানা এবং অন্যটি তাসবীহ খানা। এই দুই কামরার মাঝে ছিল ৪/৫ হাত প্রশস্ত একটি ছাদওয়ালা গলি। কেহ কেহ ভক্তি ও মুহাব্বতের কারণে ইহাকে বেহেস্ত গলি বলিয়া আখ্যায়িত করে। ইহার সম্মুখে একটু খালি জায়গা। গরমের দিনে আলা হজরত এখানে প্রায়ই উপবেশন করিতেন। মসজিদের দক্ষিণ দিকে একটি বারান্দা তৈরী হইয়াছিল। উহাতে স্থাপিত হইয়াছিল অজুখানা এবং গোসলখানা। এই বারান্দার সম্মুখেও ঐ দুই কামরার ন্যায় খালি জায়গা রাখা হইয়াছিল। ভিতরে এবং বাহিরে আস্তর করিয়া উপরে সাদা চুনকামের ফলে ছাদ এত সাদা এবং পরিষ্কার দেখা যাইত যে, দূর হইতে আয়নার মত মনে হইত। ছাদ কাঠের ছিল কিন্তু উহা ছিল লোহার পাত মোড়া। মিস্ত্রি জহুর উদ্দিন ও তাঁহার সাথীরা সুন্দর কারুকার্য্য এবং রং ও পলিশ এত নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছিলেন যে, দূরদূরান্ত হইতে লোকজন উহা দেখিতে আসিত। এই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আলা হজরত এবং তাঁহার পরিবার পরিজন ও সকল খাদেমের এক প্রগাঢ় প্রশান্তি ও তৃপ্তি হাসিল হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার একান্ত অনুগ্রহে সর্ব প্রকার আরামের বস্তু দান এবং সকল জিনিষের মধ্যে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। কূপ এবং খানকার নির্মাণ কাজ ১৯২০ সনে শুরু হইয়া ১৯২২ সনে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

পরিবার পরিজন

হজরতে আলার প্রথম বিবাহ খাওলা শরীফে অবস্থানকালে তাঁহার আপন চাচা মির্জা খান সাহেবের মেয়ের সহিত হইয়াছিল। এই ঘরে তাঁহার প্রথম সন্তান মাওলানা

মুহাম্মদ মাসুম সাহেব জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমা স্ত্রী একটি সন্তান রাখিয়াই মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় বিবাহও মির্জা খান সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ের সহিত হইয়াছে এবং এই ঘরে দুইটি পুত্র সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ সহ চারজন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। সাহেবজাদা মুহাম্মদ সাদেক সাহেব ছাত্র জীবনেই ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয় সাহেবজাদা মুহাম্মদ সাঈদ সাহেব বড় হইয়া এলমে দ্বীন হাসিল করেন। তিনি দুইটি বিবাহও করিয়াছিলেন। এক স্ত্রী হইতে সাহেবজাদা মুহাম্মদ আরীফ সাহেব এবং তাঁহার দুইটি বোন এবং দ্বিতীয় স্ত্রী হইতে সাহেবজাদা হাফেজ মুহাম্মদ জাহেদ সাহেব জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবও এই পৃথিবীতে অল্প হায়াত নিয়া আসিয়াছিলেন। তিনিও মাতাপিতার সামনেই ইন্তেকাল করেন। হজরতে আলার ছেলেদের মধ্যে অতঃপর শুধু বড় স্ত্রী হইতে মাওলানা মুহাম্মদ মাসূম সাহেব জীবিত থাকেন। কিন্তু তিনি বিবাহ করার পর শ্বশুর বাড়ীতে সন্মানিতা স্ত্রী তাঁহাকে অনুরোধ করিলেনঃ আপনি আর একটি বিবাহ করুন, হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন কোন নেক সন্তান দান করিবেন, যে আপনার খেদমত ও মুহব্বাতে থাকিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবে এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক গুণের অধিকারী হইবে। দুই নাতী মুহাম্মদ আরীফ ও জাহেদ তখন খুবই ছোট ছিল। মোট কথা, তিনি তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধে ও সন্তুষ্টিতে তৃতীয় বিবাহ করিলেন। তাঁহার বিবাহ বন্ধনে দুই স্ত্রী একত্রিত হইলেন।

প্রথমা স্ত্রী বড় মা হিসাবে এবং দ্বিতীয স্ত্রী কালাচিওয়ালী মা হিসাবে আখ্যায়িত হইতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইহাই মঞ্জুর ছির যে, আর কোন সন্তান জন্মলাভ করিবেন না। কাজেই কালাচিওয়ালী মা হইতে কোন সন্তান জন্ম লাভ হয় নাই। ১৩৬০ হিজরী মোতাবেক ১৯৪১ ইংরেজী সনে হজরতে আলা ইন্তেকাল করেন। কালাচিওয়ালী মা হজরতের মৃত্যুর পর কিছুদিন খানকা শরীফে অবস্থানের পর তাঁহার পিত্রালয়ে চলিয়া যান। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁহাদের সম্পর্ক সন্তোষজনক থাকে। বিভিন্ন উপলক্ষে এখনও তাঁহার খানকা শরীফে আসা-যাওয়া আছে। বড় মা ১৩৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আলা হজরতের স্ত্রীদের মধ্যে এখন শুধু কালাচিওয়ালী মা সাহেবাই জীবিত আছেন। সাল্লামাহাল্লাহু তায়ালা অ-আবৃকাহা।

একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা

আলা হজরত খাওলা শরীফে অবস্থান করার সময়কার একটি আশ্চর্য্যজনক ও অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা আলা হজরতের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা অনুমান করা যায়। সুফী মাওয়াজ খান সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্তরিকতার সহিত

আলা হজরতের যাবতীয় খেদমত আনজাম দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মুরীদ হওয়ার পর তিনি একাধারে ১৫টি বৎসর খাওলা শরীফে আলা হজরতের খেদমতের দ্বারা ধন্য হইতে থাকেন। ঐসময় তিনি এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব বর্ণনা করেন ঃ হজরত মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব (রঃ) বয়সে আলা হজরতের বড় এবং তরীকার সকল সিলসিলার পীর ছিলেন। একদিন তিনি উ'লুওয়ালী ষ্টেশনে রেলগাড়ী হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া আলা হজরতের খেদমতে খাওলা শরীফে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি খাওলা শরীফে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন হজরতে আলা মুহতরাম ভাই হাকীম খান সাহেবের নিকট যাওয়ার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিলেন। তিনি মাওলানা সাহেবের আগমনে তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং বলিলেন ঃ খুবই ভাল হইত যদি আপনি সংবাদ দিতেন। তাহা হইলে ষ্টেশনে আপনার জন্য ঘোড়া পাঠাইয়া দেওয়া যাইত। আপনি পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছেন, নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হইয়াছে। মাওলানা সাহেব বলিলেনঃ আমি এখন শুধু এইজন্য উপস্থিত হইয়াছি যে, আপনার সাক্ষাৎ আমার জন্য নাজাতের কারণ হইবে; কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার একান্ত অনুগ্রহে আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মাওলানা আহমদ খান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, সে পরকালের মুক্তির দ্বারা ধন্য হইবে এবং দোজখের আগুন তাহার জন্য হারাম হইবে। গুরুত্ব আরোপের জন্য তিনি এই কথাটি তিন বার বলিলেন। হজরতে আলা বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেনঃ হে মাওলানা সাহেব। আপনি আমার চাইতে বয়সে বড় হইবেন। অতএব আমার উচিৎ আপনার খেদমতে উপস্থিত হইয়া বরকত হাসিল করা। আলা হজরত যতই অক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিলেন, মাওলানা সাহেব ততই শপথ করিয়া ঐ শুভ সংবাদের উল্লেখ করিতেছিলেন এবং অত্যন্ত ভালবাসা ও ভক্তি দেখাইতেছিলেন। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যেই একটি আশ্চর্য্য অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং অনেকক্ষণ যাবৎ সম্পূর্ণ মজলিশে একটি অচেতন অবস্থা বিরাজ করিতেছিল।

আলা হজরত মাওলানা সাহেবের আগমনে খুশি হইয়া খাদেমকে বলিলেন ঃ আজ আমার সম্মানিত ভাই হাকীম সাহেবের ছেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মাওলানা সাহেব আসিয়াছেন, কাজেই ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া ফেল। আমরা আগামীকাল যাইব। মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব ইহা শুনিয়া বলিলেনঃ তাহা ঠিক হইবে না হজরত। আপনি আপনার সফর স্থগিত করিবেন না। বরং আমিও আপনাদের সহিত যাইব। হজরতে আলা মাওলানা সাহেবকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া পুনরায় সফরের ব্যবস্থা করিলেন। হজরতে আলা এবং মাওলানা সাহেব

ঘোড়ায় চড়িলেন এবং অন্যান্য সকল মুরীদ পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা হাকীম সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছিয়া শোক প্রকাশ ও ফাতেহা পাঠ করিলেন। অতঃপর মজলিশে অন্য আলাপ আলোচনা হইতেছিল। এক পর্যায়ে পীর মুরীদির আলোচনা উঠিল। হাকীম খান সাহেব আলা হজরতের বড় ভাই ছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু একজন জমীদার ও দুনিয়াদার হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। কথা প্রসংগে তিনি বলিলেন ঃ আপনারা নিজদেরকে পীর দরবেশ বলেন। আজ আমাদেরকে কিছু কেরামত দেখান যাহাতে আমরাও আপনাদের ভক্ত হইয়া যাই। তখন আলা হজরতের বিবেকে উত্তেজনা আসিল এবং বলিলেনঃ ভাই সাহেব! আপনি কি রকম কেরামত দেখিতে চান? হাকিম সাহেব আর কিছুই চিন্তা করিতে না পারিয়া বলিলেন যে, আপনি আমাদিগকে জ্বীন দেখান। হজরতে আ'লার সহিত আগত মুরীদগণ এবং ঘটনার বর্ণনাকারী মাওয়াজ খান সাহেবও ছিলেন। হাকীম সাহেবের এই অদ্ভুত আবেদন শুনিয়া হাত পা দিয়া ইশারা করিতেছিলেন; যাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আপনি ইহা কি চাহিতেছেন? চাহিবেন তো আল্লাহর নৈকট্য লাভ কামনা করুন। কিন্তু তিনি এই ইশারা বুঝিতে পারিলেন না এবং সেই একই আবেদন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এদিকে আ'লা হজরতের মুরীদগণ তাঁহার চেহারা মোবারক দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, আজ যাহা হজরত চাহিবেন ইনশাল্লাহ তাহাই হইবে। হাকীম সাহেবের পীড়াপীড়িতে আলা হজরত বলিলেনঃ আচ্ছা ঠিক আছে। আপনারা সবাই চোখ বন্ধ করুন। চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে সকলে দেখিল যে, সামনের বৃক্ষটির ডালে অসংখ্য জ্বীন ঝুলিতেছে। তাহারা পরস্পরকে পা দিয়া জড়াইয়া আছে। অতঃপর হজরত বলিলেনঃ আপানারা চোখ খুলুন। উপস্থিত সকলেই তখন খোলা চোখে জ্বীন দেখিতে লাগিলেন। ভয়াবহ তাহাদের চেহারা। বড় বড় মাথা, দেহ গাছের মত উঁচু এবং চোখ লম্বা লম্বা। তাহাদের চোখ ছিল মানুষের চোখের বিপরীত (উল্টা, উপরে নিচে লম্বা ছিল) ইহা দেখিয়া সবাই অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং আবেদনকারী জনাব হাকীম সাহেব ও অন্যান্য গ্রামবাসী বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্য উপস্থিত সকলেই দেখিলেন। মাওলানা হোসাইন আলী সাহেবও মজলিসে উপস্থিত ছিলেন।

অনাবৃষ্টি অতঃপর রহমাতের বৃষ্টি

একবার ভয়ানক খরা দেখা দিয়াছিল। বৃষ্টি না হওয়াতে আলাহর সৃষ্টিকুল অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। জনগণ আলা হজরতের নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়ার দরখাস্ত করিল। পীর আব্দুল্লাহ শাহ সাহেব তখন মসজিদে শুইয়াছিলেন। আলা হজরত মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব এবং অপর দুইজন সাথীকে বলিলেনঃ তোমাদের তিন জনের মধ্যে যে

কোন একজন পানির কলসি ভরিয়া ভরিয়া আব্দুল্লাহ শাহ্ সাহেবের উপর ঢালিতে থাক। উনাকে ঠান্ডা করিতে পারিলে ইনশাল্লাহ খুব বৃষ্টি হইবে। মাওয়াজ খান সাহেব বলিলেনঃ হুজরত! আমি এখনই এই কাজ করিতেছি।

আলা হুজরত বলিলেনঃ খেয়াল রাখিও যে, যদি পানি মাথার দিক হইতে ঢাল তাহা হইলে মাথার দিকেই ঢালিতে হইবে। আর যদি পায়ের দিকে ঢালা তাহা হইলে পায়ের দিকেই ঢালিতে থাকিবে। আলা হুজরতের নির্দেশ অনুযায়ী মাওয়াজ খান সাহেব ১২ কলসি পানি ভরিলেন এবং একের পর এক শাহ সাহেবের পায়ের দিকে ঢালিতে শুরু করিলেন। প্রথম বার যখন পানি ঢালা হইল, তখন শাহ সাহেব মুখের উপর হইতে চাদর সরাইয়া দেখিলেন এবং পুনরায় মুখ ঢাকিয়া বড়ই আরামের সহিত শুইয়া থাকিলেন। দিক পরিবর্তনও করিলেন না এবং ইহাও জানিতে চাহিলেন না যে এই সব কি হইতেছে? কে পানি ঢালিতেছে এবং কেন ঢালিতেছে? হয়ত বা তিনি নিজের কাশফের দ্বারাই ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শুইয়া বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতে থাকিলেন। কিছুক্ষণ পর উত্তর দিক হইতে একটি প্রবল ধুলি ঝড় আসিল এবং সংগে সংগে মেঘের আকার ধারণ করিল। অতঃপর এত জোরে বৃষ্টি নামিল যে, প্রায় সোয়া এক মাইল এলাকা প্লাবিত হইয়া গেল। আল্লাহর অনুগ্রহে অনাবৃষ্টির প্রকোপ দূর হইয়া গেল এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবকুলের প্রাণ ফিরিয়া আসিল। ইহা আর কিছুই নয়, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং তাঁহার আউলিয়াদের দোয়ার ফল।

সারহিন্দ শরীফের ঘটনা এবং কাইউমিয়াত উপাধি

সুফী মুহাম্মাদ মাওয়াজ খান সাহেব বর্ণনা করেনঃ হুজরতে আ'লা খাওলা শরীফে অবস্থানকালে একবার আল্লাহর হুকুমে হুজরতে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর মাজার শরীফে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত কয়েকজন খাদেমও গিয়াছিল। আলা হুজরত রওয়ানা হওয়ার পর মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব (যিনি আ'লা হুজরতের পক্ষ হইতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন) ঘটনাক্রমে কুতুবখানায় গেলেন। সেখানে কতকগুলি এলোমেলো কিতাবের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। একখানা কিতাব তুলিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহার উপর আলা হুজরত লিখিয়া রাখিয়াছেন, "সারহিন্দ শরীফের এই সফরে যাহারা আমাদের সংগে মুজাদ্দেদে আলফেসানীর মাজারে উপস্থিত হইবে তাহারা আল্লাহওয়ালাদের দলে গণ্য হইবে।" হুজরতে আ'লার পবিত্র হাতের লিখিত এই শুভ সংবাদ দেখিয়া মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং আত্মহারা হইয়া খাওলা শরীফ হইতে সারহিন্দ শরীফের দিকে রওয়ানা হইলেন।

এদিকে মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবও আ'লা হজরতের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছায় খাওলা শরীফের দিকে আসিতেছিলেন। পথের মধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। মাওলানা সাহেব আকুল অবস্থায় সুফী মাওয়াজ খান সাহেবের সহিত কোলাকুলি করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, হজরত কেবলা সারহিন্দ শরীফ তাশরিফ নিয়া গিয়াছেন। মাওলানা সাহেব আ'লা হজরতের লিখিত শুভ সংবাদও শুনাইলেন এবং সেই সাথে ইহাও বলিলেন যে, এই শুভ সংবাদের দ্বারা ধন্য হওয়ার জন্য আমি সারহিন্দ শরীফ যাইতেছি।

এই কথা শুনিয়া সুফী মাওয়াজ খান সাহেব বলিলেনঃ তাহা হইলে আমিই বা কেন বঞ্চিত থাকিব। এই সফরে আপনার সহিত আমিও শরীক হইব। কাজেই তিনি নিজ গ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং সফরের প্রস্তুতি নিয়া রেল যোগে লাহোর পৌঁছিলেন। অতঃপর উভয়ে লাহোর হইতে সারহিন্দের উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া সহিসালামতে সারহিন্দ শহরে পৌঁছিয়া জোহরের নামাজ আদায় করিলেন। নামাজ শেষ করিয়া রওজা শরীফের দিকে রওয়ানা করিলেন। রওজা শরীফ শহর হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বসসী এবং সারহিন্দের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন, আ'লা হজরত জোহরের নামাজ আদায়ান্তে ভক্তদের সংগে বসিয়া আছেন। আ'লা হজরত মসজিদের বাম দিকের একটি কামরায় থাকিতেন। তাঁহাদের উভয়কে আসিতে দেখিয়া খুশিতে বলিয়া উঠিলেনঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ, আরো দুইজন সাথী আসিয়াছেন।

অল্পক্ষণ পরেই তিনি উঠিলেন এবং হজরতে ইমামে রব্বানীর মাজারের চতুর্দিকের দেওয়ালের বাহিরে দুইটি মাজারে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে কয়েক মিনিট মুরাকাবা করিলেন। সেখান হইতে উঠিয়া তিনি হজরত শেখ মাখদুম আব্দুল আহাদ এর (যিনি ইমামে রব্বানীর সম্মানিত পিতা) মাজার শরীফে উপস্থিত হইলেন। হজরত মাখদুম (রঃ) এর মাজার মুবারক খানকায়ে মুজাদ্দেদীয়া হইতে দুই মাইল দুরে অবস্থিত। সেখানেও মুরাকাবা করিয়া তিনি আছরের নামাজ আদায় করিলেন। আছরের নামাজ আদায় করিয়া মাগরিবের পূর্বেই পুনরায় খানকাহ মুজাদ্দেদীয়ায় পৌঁছিলেন এবং ইমামে রব্বানীর ছেলে খাজা মুহাম্মদ মাসুম এর মাজারে কয়েক মিনিট মুরাকাবা করিয়া ইমামে রব্বানীর মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করিলেন।

মাগরিবের নামাজ শেষ করিয়া তিনি হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানীর মাজার শরীফে অনেক সময় যাবৎ মুরাকাবা করিলেন। আলা হজরতের সহিত ১২/১৩ জন সাথী ঐ সকল জায়গায় তাঁহার সহিত মুরাকাবায় শরীক ছিলেন।

হজরত ইমামে রব্বানীর মাজার শরীফে মুরাকাবার সময় সুফী মুহাম্মদ মাওয়াজ খান সাহেব এই বিশেষ ঘটনাটি দেখিলেনঃ কিছু চেয়ার এবং একটি টেবিল আনিয়া সাজান হইয়াছে। টেবিলটি ছিল সবুজ ঝালরসহ বিভিন্ন রংগের রেশমী কাপড়ে আবৃত। অতঃপর ইমামে রব্বানী তাশরীফ আনিলেন। তাঁহার হাতে ছিল একটি সুদৃশ্য এবং উচ্চমানের জুব্বা। ইমামে রব্বানী জুব্বাটি টেবিলের উপর রাখিলেন এবং আলা হজরতকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেনঃ এখানে আপনাকে ডাকিয়া আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। আসলে আমার নিকট আপনার এই আমানত ছিল। উহা আপনাকে পৌঁছান একান্ত জরুরী ছিল। এই কথা বলিয়া আ'লা হজরতকে চেয়ারের উপর দাঁড় করাইলেন এবং স্বয়ং হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) তরীক্বার সেই বিশেষ জুব্বাটি তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। জুববাটি তাঁহার গায়ে ঠিকমত লাগিয়াছিল এবং তাঁহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল। এই বরকতময় জুব্বাটির সহিত একটি কারুকার্যখচিত জরীর টুপিও ছিল। হজরতে মুজাদ্দেদে আলফেসানী উহা আলা হজরতের মাথায় পরাইয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত টেবিলের উপর এক গুছ চাবি রাখা ছিল। সেই সব চাবি আ'লা হজরতকে দেওয়া হইল। সুফী মাওয়াজ খান সাহেব এই ঘটনা দেখিয়া বুঝিতে পরিলেন যে, এই লেবাস মুজাদ্দেদীয়া তরীক্বার এবং মানসাবে কাইউমিয়াতেরই হইবে, যাহা আ'লা হজরতকে দান করা হইয়াছে। ইহার পর মুরাকাবা শেষ হইল এবং হজরতে আলা তাঁহার থাকার জায়গায় তশরীফ আনিলেন। অতঃপর সুফী মাওয়াজ খান সাহেবকে বলিলেনঃ এক লোটা পানি আন, আমি বাহিরে যাইব। মাওয়াজ খান সহেব এক লোটা পানি লইয়া আ'লা হজরতের সংগে গেলেন। তাঁহারা খানকাহ শরীফের সীমানার বাহিরে চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পর মাওয়াজ খান সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ হে মিয়া মাওয়াজ খান, কোন কিছু দেখিয়া থাকিলে বলুন। মাওয়াজ খান সাহেব মুরাকাবার সময় যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ বর্ণনা করিলেনঃ যখন আমরা সবাই হজরতে আলার সংগে হজরত খাজা মাসুম সাহেবের মাজারে মুরাকাবা করিতেছিলেন তখন আমি দেখিতে পাইলাম যে, নূরের একটি স্তম্ভ উপরে আকাশ হইতে আসিয়া নিচে হজরতে খাজা মুহাম্মদ মাসুমের পবিত্র মাজারের উপর নামিয়াছে। ইহার পর যখন হজরতে ইমামে রববানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর মাজারের মুরাকাবা হইতেছিল, তখন আপনাকে বিশেষ জুব্বা দান করার দৃশ্য দেখিয়াছি। আলা হজরত বলিলেন, তুমি ঠিকই দেখিয়াছ।

فَا لْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِ ى قَوَّضَ اِلٰى سَيِّدِ نَا شَيْخِنَا الا عْظَم هٰذَ ا الْمَقَا مِ للاَ فَخَمِ وَخَلَعَ عَلَيْـهِ خَلْعَةَ الْقَيُّو مِيَةِ وَالنِّسْبَـةِ الخَا صَةِ الْمُجَدِّ دِيَةِ وَمَاذَالِكَ عَلَى اَللّٰهِ بِـعَـزَ يْـزِ

চির নিদ্রার স্থান নির্বাচন এবং কবরস্থানের ভিত্তি স্থাপন

হজরতে আ'লা কুদ্দুসু সিররুহু খাওলা শরীফ হইতে খানকায়ে সিরাজিয়ায় চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সর্বপ্রকার শিক্ষা ও হেদায়েতের ব্যবস্থা চালু ছিল। কাছের এবং দূরের আল্লাহতায়ালার প্রেমে আত্মহারা এবং আল্লাহওয়ালাদের সহিত যোগাযোগপ্রিয় মানুষ এই মারেফাতের প্রদীপের চতুর্দিকে উলি পতঙ্গের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিতেছিল। হজরতে আলার দুই ছেলে মুহাম্মদ সাদেক ও মুহাম্মদ সাইদ গুজরাটের আন্নাহীতে পড়াশুনা করিতেছিলেন। আল্লাহতায়ালার মেহেরবানী সর্বদাই তাঁহাদের উপর ছিল এবং এমন কোন অবস্থা দেখা দেয় নাই যার জন্য কবরের স্থান নির্বাচন করা দরকার। ইতিমধ্যে হজরতে আলা সারহিন্দ শরীফ যাওয়ার নিয়ত করিলেন। মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবের বসবাস একরকম স্থায়ীভাবে খানকা শরীফেই ছিল। বাড়ীতে একান্ত কোন প্রয়োজন হইলে যাইতেন, আবার চলিয়া আসিতেন। লংগরখানার জন্য কুন্দিয়া হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা তাঁহার দায়িত্বেই ছিল। হজরতে আলা তাঁহাকে সারহিন্দ শরীফ সাথে নিয়া যান নাই। কুন্দিয়া ষ্টেশন হইতে রেলে উঠিতে হইবে, কাজেই মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবকে বলিলেনঃ সাওয়ারীর জন্য ঘোড়া প্রস্তুত কর। তিনি ঘোড়ার প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা সহ উপস্থিত হইলেন। হজরতে আলা কয়েকজন খাদেমকে সংগে নিয়া চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় একবার কুতুবখানার দিকে তাকাইলেন এবং দেখিলেন যে, মাওলানা মুহাম্মদ জামান সাহেব অধ্যয়নে ব্যস্ত আছেন। তিনি কয়েক নজর দেখিলেন এবং এই কবিতাটি পাঠ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেনঃ

در حقیقت امالك هر شئی خدا است

ایی اما نت چند روزه نز دماست

অর্থাৎ," প্রকৃত পক্ষে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ, আমাদের নিকট ইহা ক্ষণিকের আমানত স্বরূপ"। ইহা যেন রওয়ানার সময় তাঁহার প্রিয় কিতাবসমূহের সহিত বিদায় সাক্ষাৎ ছিল। হজরতে আলার সারহিন্দ শরীফ যাওয়ার পর তাঁহার ছেলে

অসুস্থ হইয়া আন্নাহী হইতে পীর আব্দুল লতীফের সহিত বাড়ী যান। বাড়ী পৌঁছিবার পর অসুস্থতা আরো বাড়িয়া গেল। তাঁহার থাকার জন্য একটি কামরা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল এবং লংগরখানার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে মাই সাহেবাকে যথেষ্ট সময় দিতে হইত। কাজেই মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব দিনরাত সাহেবজাদার খেদমতেই কাটাইতেন এবং সর্বপ্রকার দেখাশুনা করিতেন। শুধু নামাজের জন্য মসজিদে যাইতেন। একদিন এমন হইল যে, সাহেবজাদা ঘুমাইতেছিলেন এবং নামাজের সময় হইয়া গিয়াছিল। মাওয়াজ সাহেব মসজিদে নামাজ আদায় করিয়া তৎক্ষনাৎ সাহেবজাদার নিকট চলিয়া আসিলেন। তিনি চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এখনও কি নামাজের সময় হয় নাই? মিয়া মাওয়াজ খান বলিলেনঃ নামাজের সময় হইয়াছে। আপনি ঘুমে ছিলেন, সেই জন্য আপনাকে উঠাই নাই। আমি মসজিদে নামাজ পড়িয়া আসিয়াছি। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেনঃ আমাকে নামাজের জন্য কেন উঠান নাই। মাওয়াজ খান সাহেব ক্ষমা চাহিলেন এবং নামাজ পড়াইয়া দিলেন। ইহার পরের দিন জ্বর বাড়িয়া যায়। সাহেবজাদা মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবকে বলিলেনঃ আমি হুজরত কেবলার সাক্ষাতের জন্য অস্থির। আপনি আব্বা হুজুরকে টেলিগ্রাম দিয়া তাড়াতাড়ি আসিতে বলুন। মাওয়াজ খান মনে করিলেন যে, জ্বরের কারণে হয়ত তিনি এইরূপ বলিতেছেন।

যাই হোক, তিনি টেলিগ্রাম করিযা দিলেন, দ্বিতীয় দিন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আমি আপনাকে যে টেলিগ্রাম করিতে বলিয়াছিলাম তাহার কি হইল? মাওয়াজ খান বলিলেনঃ হজরত আপনার কথামত টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছি এবং তাহার জওয়াবও আসিয়াছে। তিনি খুব তাড়াতাড়িই আসিতেছেন, আপনি শান্ত থাকুন। ইহার পর জ্বরের প্রকোপ বাড়িতেই থাকিল। শেষ পর্যন্ত নিয়তির প্রহর আসিল। সুফী মাওয়াজ খান সাহেব পীর মাকে খবর দিলেন যে, হজরত সাহেবজাদার অবস্থা খুব বেশী খারাপ মনে হইতেছে। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। মাই সাহেবা বলিলেনঃ আমি ওজু করিয়া এখনই আসিতেছি। তিনি আসিয়া সুফী মাওয়াজ খান সাহেবকে বলিলেনঃ আপনি এখন মসজিদে নামাজ আদায় করুন। হজরত মাই সাহেবা সাহেবজাদার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, মহান বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন এবং সেই সাথে তাঁহার বরকতময় আত্মা দেহবন্দী হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন। এদিকে দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ হইল যে, আ'লা হজরত সাহেবজাদার অসুস্থতার খবর পাইয়া সারহিন্দ শরীফ হইতে রওয়ানার পরপরই রাদী সমুদ্রে এবং অন্যান্য সমুদ্রে ভয়ানক প্লাবন দেখা দিল। ফলে রেল লাইন ভাসিয়া গেল। ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। অতএব আলা হজরত সময় মত

খানকা শরীফে পৌছাইতে পারিলেন না। এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে সকলেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছিলেন। তদুপরি দাফন কাফনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার চিন্তাও দেখা দিল। আলা হজরতও আসিয়া পৌছান নাই। ঘরে পর্দানিশীন মাই সাহেবা এবং অন্য মেয়েরা ছিলেন, বাহিরে ছিলেন মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব এবং অন্য দুই একজন মুরীদ। আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণও আসিয়াছিলেন। কিন্তু খানকা শরীফের আদব কায়দা ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে তাহারা অবগত ছিলেন না।

মাই সাহেবা মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবকে খবর দিলেনঃ আমি পর্দানিশীন এবং হজরত সাহেব এখনও আসিয়া পৌছান নাই। কাজেই আপনাকে অনুমতি দেওয়া হইল আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবেই দাফন কাফনের ব্যবস্থা করুন। মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব বলিলেনঃ আমি ইহার উপযুক্ত নই যে, সাহেবজাদা মরহুমের দাফন কাফনের ব্যবস্থা সুন্দরভাবে করিতে পারি। হজরতে আলা আমার প্রস্তাবিত জায়গা অপছন্দ করিতেও পারেন। পরে আপনিও যদি আমার পক্ষে না থাকেন তাহা হইলে আমার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক খারাপ হইয়া যাইবে। মাই সাহেবা নিশ্চয়তা দিয়া বলিলেনঃ এইরূপ কখনও হইবেনা। এই ব্যাপারে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতঃপর মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করিলেন, অনেক রকম খেয়াল করিলেন। ভাবিলেন, খানকায়ে নূর মুহাম্মদের কবরস্থানে কিংবা নিজেদের খানকায়ে দাফন করা কি ঠিক হইবে? দাফনের স্থান বাড়ীর নিকটে হইবে না দূরে? এ–ধরণের নানান চিন্তা ভাবনায় তিনি হয়রান ও পেরেশান ছিলেন।

হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল, সাহেবজাদা মরহুম রোগের প্রকোপের কারণে ইংগিতে বলিয়াছিলেনঃ আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি এবং অসুস্থ অবস্থায় আমার সবকের সাথীরা হয়ত আমার চাইতে অনেক আগে উঠিয়া গিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে আমার টিকেট আল্লাহীর যাত্রীদের সাথে কাটাইবেন এবং মিয়ানওয়ালি হজরতদের সাথে কাটাইবেন না। এই ইংগিতের অর্থ ছিল যে, আমাকে সঠিক দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন জ্ঞানী লোকদের সাথে দাফন করা হোক। এই বিবেচনায় অনেক চিন্তা ভাবনার পর খানকা শরীফেই দাফনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। স্থানটি তাসবীহখানার একেবারে সামনে এবং হজরতে আলার যাওয়া আসার পথে। এই সিদ্ধান্তের একটি বিশেষ কারণও দৃষ্টিগোচর হইল। তাহা এই যে, আসা যাওয়ার সময় এবং তাসবীহ খানায় বসা অবস্থায় হজরতে আলার দৃষ্টি সাহেবজাদার কবরের উপরে পড়িতে থাকিবে। উহা তাঁহার মর্তবা বৃদ্ধির কারণ হইবে। এইভাবে, জানাজার নামাজ আদায় করার পর নির্ধারিত স্থানে দাফন করা হয়।

হজরতে আলা এই দুঃখজনক ঘটনার তিনদিন পর তশরিফ আনেন। তিনি সাহেবজাদা মরহুমের কবরে ফাতেহা পাঠ এবং দোয়া করিলেন। ইহার পর মিয়া মাওয়াজ খান সাহেব বলিলেনঃ হজরত, আমার নগণ্য খেয়ালে এই স্থানটি সাহেবজাদা মরহুমের জন্য উপযুক্ত মনে হইয়াছিল। আলা হজরত মিয়া মাওয়াজ খান সাহেবের স্থান নির্বাচনকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়া বলিলেনঃ মিয়া মাওয়াজ, আমার জন্যেও শেষ জায়গা নির্বাচনের চিন্তা ছিল। জাযাকাল্লাহ তুমিই আমার জন্য স্থান ঠিক করিয়া দিলে।

বিভিন্ন ঘটনা

হজরতে আলা কুদ্দুসুসিররুহু তাঁহার সময়ের সকল ওলী আল্লা ও মুত্তাক্বী এবং অতীত সকল পূণ্যবানদের এক উত্তম নমুনা ছিলেন। সকল মাকামাতে মুজাদ্দেদীয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তিনি বিস্তারিত ভ্রমণের মাধ্যমে পূর্ণ দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন। তরীকাপন্থীদের সাফল্যের সহিত ফয়েজ দানের শক্তি তাঁহার ছিল। এইরূপ গুণের অধিকারী হজরতে আলার কোন সমকক্ষ এই যুগে দেখা যায় না। যে সকল ভাগ্যবান লোক নিজেদের অন্তরের দৃষ্টিতে আলা হজরতকে দেখিয়া অন্তর উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহারা এই সত্যকে না মানিয়া পারিবেন না যে, তাঁহার জিয়ারাতের দ্বারা অতীত বুজুর্গানদের সাক্ষাতের (সলফে সালেহীন) স্মরণ তাজা হইয়া যাইত। কুতুবে এরশাদের পদ এবং কুতুবে মাদারের পদের পর তরীকায়ে মুজাদ্দেদীয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হইতে কাইউমে জমানের পদ তিনিই লাভ করিয়াছিলেন। যুগের সকল ওলীবৃন্দ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁহার ফয়েজ ও বরকতের দ্বারা লাভবান হইতেছিলেন। অলৌকিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপক, যাহাদিগকে তাসাউফের পরিভাষায় আসহাবে খেদমত বলা হয়, তাঁহারা সকলে তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এই সম্পর্কে লেখক বলেনঃ হজরত মাওলানা সাইয়েদ জামিল উদ্দিন আহমদ সাহেব আমাকে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা শুনাইয়াছেন। উল্লেখিত মাওলানা সাহেব আলেম, ফাজেল এবং দারুল উলুম দেওবন্দের ফারেগুত তাহসীল ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ভাওয়ালপুরে মাদারীসে আবাবীয়ার পরিদর্শক ছিলেন। এটা ঐ সময়কার ঘটনা যখন তিনি একটি ফাজেল মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন।

মাজযুবদের নেতৃত্ব এবং আসহাবে খেদমতের দায়িত্ব

মাওলানা জামিল উদ্দিন সাহেব বলেনঃ চাকুরী জীবনেই হজরতে আলার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিয়া আল্লাহ পাকের অনেক দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা ধন্য হইতেছিলাম বিশেষতঃ এই কারণে যে, অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেসব ঘটনা আমাকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত করিয়াছে এবং আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হই যে,

বর্তমানে আমার পীর সকল অলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অবস্থা এরূপ ছিল যে, নিজের ক্লাশের ছাত্রদের সাথেও মারেফাত ও তরীকার বিষয়াদি এবং হজরতে আলার ওলীদের কামেল হওয়া ও ফজিলাতের কথা আলোচনা করিতাম। একদিন আমার ক্লাশের কতিপয় ছাত্র বলিল যে, এখানে মাঝে মাঝে একজন পাগলকে দেখা যায়। লোকজন তাহাকে অনেক বড় ওলী মনে করে। ইহা শুনিয়া আমি ঐ ছাত্রদেরকে বলিলামঃ পুনরায় যদি তোমরা তাহাকে দেখ, তাহা হইলে আমাকে জানাইবে অথবা তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আল্লাহর ইচ্ছায় কয়েকদিন পরই ঐ পাগল একদিন স্কুলের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ছাত্রগণ তাহা আমাকে জানাইলে আমি স্কুলের বাহিরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহাকে বাড়ীতে নিয়া খানা খাওয়াইলাম। তাঁহাকে অনেকটা সুস্থ মনে হওয়ার পর আমার চিন্তাধারায় প্রশ্ন করিলামঃ বর্তমানে সব চাইতে বড় ওলী কে? সে এই প্রশ্ন শুনিয়া কিছুক্ষণ পাগলের ন্যায় বকবক করিতে থাকিল। কিন্তু এই বকবকানির মধ্যে হিন হিন (অর্থাৎ আছে আছে) করিতে করিতে বলিলেন যে, যে বুজুর্গ বর্তমানে সবচাইতে বড়, তুমি তাঁহাকে চিন এবং তাঁহার নিকট তোমার আসা যাওয়া আছে। তিনি আলা হজরতে নাম বলেন নাই কিন্তু ইংগিতের দ্বারা আলা হজরত সম্বন্ধে আমার খেয়ালের অনেকটা সমর্থন পাওয়া গেল। ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই। পরে ঘটনা ক্রমে আমি খানকা শরীফ গেলাম এবং সম্পুর্ণ ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলা হজরতের নিকট বর্ণনা করি। শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিলেন, কিছু বলিলেন না। অন্যান্য বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়া শেষ করিলেন। অনেকদিন পর আমি আবার খানকা শরীফে গেলাম এবং সেখান হইতে প্রয়োজনে মিয়ানওয়ালী গেলাম। সেখানে হঠাৎ আমি সেই পাগলকে দেখিয়া কিছু কথা বলিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আমাকে দেখামাত্র সে এই বলিয়া দৌড় দিল যে, তুমি এইখানেও আমার পিছু নিয়াছ। সেখান হইতে তুমি আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছ এখন এখান হইতেও বাহির করিতে চাও? মিয়ানওয়ালীতে কাজ শেষ করিয়া আমি খানকা শরীফে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং হজরতে আলার খেদমতে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি নিজ হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেনঃ শাহ সাহেব, যে পাগলকে আপনি ভাওয়ালপুরে দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত আর কখনও দেখা হইয়াছে কি? আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম হজরত, আজই আমি তাঁহাকে মিয়ানওয়ালীতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহার সহিত কিছু বলিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে এই বলিয়া দৌড় দিল যে, তুমি এখানেও আমার পিছনে লাগিয়াছ। তুমি আমাকে ভাওয়ালপুর হইতে বাহির করাইয়াছ, এখান হইতেও বাহির করিতে চাও?

হজরতে আলা ইহা শুনিয়া মুচকি হাসিলেন, এবং অনুমান ইহা বলিলেনঃ হ্যাঁ এখন তাহার হুঁস হইয়াছে।

সেবার আর একটি দৃষ্টান্ত

হজরতে আলা একদিন বলিলেনঃ আমার সম্মানিত ভাই মালিক মুহাম্মদ খান সাহেব কোয়েটায় তহশীলদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তাঁহার দ্বারা অর্থ বিভাগের হিসাবে তিন টাকার গড়মিল হইয়াছিল। তৎকালীন সরকার এই অপরাধ শাস্তিযোগ্য মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করাইয়া পাঁচ বৎসর কারাদন্ডের হুকুম দিল। হজরতে আলা ইহা জানিতে পারিয়া খানকা শরীফ হইতে কোয়েটায় রওয়ানা হন এবং পথে মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ সাহেব দীনপুরীর বাড়ীতে একরাত অবস্থান করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার আসল পরিচয় এত কঠোরভাবে গোপন রাখেন যে, মাওলানা সাহেব অত্যন্ত গুণী হওয়া সত্ত্বেও হজরতের সঠিক পরিচয় বুঝিতে পারেন নাই। কাজেই একজন সাধারণ পথিকের ন্যায় জবের রুটি এবং তরকারী তাঁহাকে পরিবেশন করা হয়। তিনি রাত সেখানেই কাটাইলেন। কোয়েটা পৌঁছিয়া হজরতে আলা আধ্যাত্মিকভাবে জানিতে পারিলেন যে, আইন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালনে একজন মহিলা নিযুক্ত রহিয়াছেন। কাজেই তিনি তাঁহাকে ডাকাইলেন। তিনি আসিলে হজরতে আলা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি আমার ভাইয়ের জেলের আদেশ কেন জারী করিয়াছ? সেই মহিলা ওজর পেশ করিলেনঃ হুজুর, আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে তিনি আপনার ভাই। তাঁহার কাগজ পত্র আমার নিকট পেশ করা হইয়াছিল এবং আমি তাঁহার শাস্তির হুকুমের উপর দস্তখত করিয়াছি। এখন তাঁহার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিব। কাজেই আপিল করা হইল এবং মালিক মুহাম্মাদ খান সাহেব ৮/৯ মাস পর মুক্তি পাইলেন।

জিনদের মুরীদ হওয়ার সম্পর্কে

মাওলানা জামিল উদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেনঃ বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা জানা যায় যে, অনেক মুসলমান জিনও আলা হজরতের মুরীদ ছিল। কেননা, বারবার দেখা গিয়াছে যে, মাই সাহেবার দ্বারা যখনই আলা হজরতের অপছন্দনীয় কোন কাজ হইয়া যাইত, তখনই জিনেরা হজরত মাই সাহেবাকে বিরক্ত করিতে শুরু করিত। অর্থাৎ এইরূপ ঘটনা ঘটিত যে তিনি আলু কাটিবার জন্য রাখিয়া ছুরি আনিতে ঘরের ভিতরে গেলেন, ছুরি আনিলেন তো দেখিলেন যে,আলু নাই। অতঃপর কোন কাজে অন্য কামরায় গিয়া কোনো বাক্স খুলিয়া দেখিলেন, সেই আলু ওখানে রাখা আছে। এই ভাবে জিনেরা বার

বার জিনিষপত্র এদিক সেদিক করিতে থাকিত। অতঃপর যখন উভয়ের মধ্যে মিলমিশ হইয়া যাইত, তখন জিনেরাও বিরক্ত করা হইতে বিরত থাকিত।

বিভিন্ন পারিবারিক ঘটনা

উল্লেখিত মাওলানা সাহেব আরও বর্ণনা করেনঃ একবার আলা হজরত যেকোন কারণে বলিলেনঃ আগামীকাল হইতে মুরীদদের চা বন্ধ থাকিবে। এই কথার পর হাকীম আব্দুল মজীদ (সাইফী) সাহেবের ন্যায় বিশিষ্ট এবং প্রিয় মুরীদগণ, যাহারা চায়ে একান্ত অভ্যস্ত, অভিমানের সাথে বলিলেনঃ হজরত, যদি চা না পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের দ্বারা যিকিরও হইবে না, মোরাকাবাও হইবে না। তা সত্ত্বেও পূর্বের হুকুমই বহাল থাকিল। হজরতে আলা তাঁহার খাস খাদেম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেবকে সাবধান করিয়া বলিলেনঃ মৌলভী আব্দুল্লাহজী, খেয়াল রাখিবেন যেন বাহিরে চা আসিতে না পারে। হজরত মাই সাহেবা এই হুকুম জানিতে পারিয়া বলিলেনঃ আমাদের মুরীদদিগকে চা বন্ধ করিয়া দিয়া কষ্ট দেওয়া উচিৎ হইবে না। হজরত মাই সাহেবা মুরীদদের প্রতি স্নেহময়ী মায়ের মত খেয়াল রাখিতেন এবং সর্বদা তাঁহাদের আরামের প্রতি যত্নবান ছিলেন। কাজেই তিনি বলিলেনঃ মুরীদদিগকে অবশ্যই চা দেওয়া হইবে। যখন হজরতে আলা তাঁহার অজীফা ও মুরাকাবা হইতে মুক্ত হইলেন, তখন মাই সাহেবা চা বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন। খাদেমগণ ঘরের পশ্চিম দিকের দরজা দিয়া চা নিয়া বাহিরে আসিলে মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব তাঁহাদিগকে ধমকাইয়া ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর মাই সাহেবা পূর্ব দিকে হইতে খাদেম দিগকে চা পাঠাইলেন। তখনও মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব সেই দিকে দৌড়াইয়া গেলেন এবং সেদিক হইতেও চা ফেরত পাঠাইলেন। মোট কথা, ঐদিন সকালের চা হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বাহিরে আসিতে দেন নাই। আলা হজরত এই অবস্থা জানিতে পারিয়া খুশি হইয়া মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে এই বাক্য দ্বারা সাবাসি দিলেনঃ "সাডা কোতোয়াল তাকড়া আয়ে" অর্থাৎ আমার পাহারাদার আদেশ পালনে বড়ই যত্নবান। অতঃপর তিনি যখন ঘরে গেলেন মাই সাহেবা আলা হজরতকে অনেক কিছু বলিলেন এবং হুকুম রহিত করার অনুরোধ করিলেন। ফলে কোন এক সময় আলা হজরত বলিলেনঃ ডাক্তারনী মানিতে চান না, সুতরাং চা আনিতে দেওয়া হউক।

ধ্যানের প্রভাব

একবার আলা হজরত পারিবারিক প্রসংগে কথাচ্ছলে মাওলানা জামিল উদ্দিন সাহেবের নিকট বলিলেনঃ যখন আমার দ্বিতীয় বিবাহ হইল, তখন একদিন আমার শ্বাশুড়ী সাহেবা আদেশ করিলেন, "আপনি আপনার খাস ধ্যান (তাওয়াজজুহ) আমার

মেয়ের দিকেও নিক্ষেপ করিবেন"। অতঃপর আমি তাঁর প্রতি তাওয়াজ্জুহ করিলাম কিন্তু তাহা একটু কড়া হইয়া গেল এবং বেগম সাহেবা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া আমার শ্বাশুড়ী আমার মাথার উপর হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমার বলিবার অর্থ এই ছিলনা যে আজই তুমি ওকে ওলী বানাইয়া দিবে। আস্তে আস্তে বানাও। কিছু আজ বানাও, কিছু কাল বানাও। তাঁহার এ কথা শুনিয়া ঘরের সবাই হাসিতে লাগিলেন এবং আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

আল্লামা শিব্বির আহমদের দৃষ্টিতে আলা হজরতের সম্মান ও মর্তবা

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী সাহেব (রঃ) পবিত্র কুরআনের তাফসীর লিখিয়াছিলেন। উহা মদীনা প্রেস, বিজনোর হইতে ছাপা হইয়াছিল। এই তাফসীর হজরত শায়খুল হিন্দের তরজমার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। অবশ্য ইহার মধ্যে সুরায়ে বাকারার তাফসীর হজরত শায়খুল হিন্দের লিখিত। হজরতে আলা এই তাফসীর পাঠের পর আল্লামা ওসমানী সাহেবের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি লিখিয়াছেনঃ আপনি এই তাফসীরটি লিখিয়া মুসলমানদের একটি বড় রকমের দান ও এহসান করিয়াছেন। এবং আমি তাহাজ্জাদের নামাজ পড়িয়া প্রত্যহ আপনার দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করি যেন আপনার এই ইলমের ফয়েজ সবসময় জারী থাকে।

হজরতে আলার ইন্তেকালের পর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ওরফে সানী, এবং খানকা সিরাজিয়ার কেবলা গদীনিশিন জনাব খান মুহাম্মদ সাহেব একদা বোগড়াওয়ালা এবং ডঃ মুহাম্মদ শরীফ সাহেব দেওবন্দ গেলেন। এই সময় হজরত আল্লামা ওসমানী সাহেব পেটের পীড়ায় অসুস্থ ছিলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব উল্লেখিত আল্লামার শিষ্যত্বের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার সাক্ষাৎ একান্ত বরকতের কারণ মনে করিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হজরত আল্লামা ওসমানী মেহমানদিগকে ঘরের ভিতরে ডাকাইলেন এবং আলোচনা এইভাবে শুরু করিলেনঃ আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আমাকে বেশী কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আমার অবস্থা সাধারণ মানুষ হইতে অন্যরূপ। আমার কথা বলার আগ্রহ অসুস্থ অবস্থায় অত্যধিক বাড়িয়া যায়। ইহার পর তিনি কথা প্রসংগে বলিলেনঃ কোন কোন লোক প্রকাশ্যে ইলম শিক্ষা করে কিন্তু কোন তরীকার পীরের সংশ্রবে যাইয়া উপকৃত হয় না। ফলে তাঁহারা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যান। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এরূপ লোক পূর্ণ ভরসাযোগ্য নয়। শরীয়াতের ব্যাপারে এরূপ আলেমের সমর্থনের কোন মূল্য নাই। পক্ষান্তরে, কিছু লোক দ্বীনি ইলম হইতে অন্ধ কিন্তু কোন পীরের সংশ্রবে থাকিয়া যিকির ও অজীফার আমল শুরু করিয়াছেন। ইহাদের সমর্থনও কোন গুরুত্ব রাখেনা।

অতঃপর তিনি সরাসরি মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেনঃ আপনার পীর একজন অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে শরীয়াতের সঠিক ইলম দান করিয়াছেন। তিনি পীর কামেলের নিকট মুরীদ হইয়া মারেফাতের সকল স্তর অতিক্রম করিয়াছেন। আমার তাফসীর পাঠ করার পর তিনি যে প্রশংসা পত্র আমাকে লিখিয়াছেন, তাহা আমি প্রাণাধিক প্রিয় মনে করিয়া সযত্নে রাখিয়াছি। আমার ও প্রিয়জনদিগকে একান্ত উপদেশ দিয়া রাখিয়াছি যে, মৃত্যুর পর যেন উহা আমার কবরে রাখিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে ইহার উসিলায় আমি পরকালে নাজাত পাইয়া যাই।

আল্লামা ওসমানী সাহেব আলা হজরতের পত্রের জবাব তাঁহার খেদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তরীকাপন্থীদের ঈমানী প্রেরণার জন্য আমরা হজরত আল্লামা ওসমানী সাহেবের জওয়াব পত্রটি এখানে উধৃত করিতেছিঃ

বখেদমতে জনাব মুহতারাম ও মুয়াজ্জাম মাওলানা সায়াদ আহমদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম,

সালাম বাদ জানিবেন যে, বহুদিন পূর্বেই আপনার চিঠি পাইয়াছি। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ও অসুস্থ ছিলাম। চোখে ব্যথা ছিল বলিয়া লেখাপড়ার কাজও একপ্রকার বন্ধ ছিল। এখন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হইয়াছি। আপনাদের ন্যায় বুযুর্গ ব্যক্তিদের সুদৃষ্টি এবং নেক দোয়া একান্তভাবে কামনা করি। যদি আমার কিতাব এবং ফাওয়ায়েদে কুরআনের দ্বারা আপনি উৎসাহিত হইয়া থাকেন এবং আপনার নিকট ইহা পছন্দ হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব। হয়ত আল্লাহতায়ালা ইহাকে আমার পরকালের সম্বল করিয়া দিবেন। ঈমানের সহিত মৃত্যুর জন্য দোয়া করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতে মর্জি হয়। ইতি

শিব্বির আহমদ ওসমানী
ডাভেল জিলা–সুরাত
১০ই মুহাররম ১৩৫৬ হিঃ
মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯৩৮ ইং

হজরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) এর খানকায়ে সিরাজীয়ায় শুভাগমন

হজরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) মাওলানা হোসাইন আলী সাহেবের দাওয়াতে মিয়ানওয়ালী তসরীফ আনেন। আগমনের উদ্দেশ্য ছিল শরীয়াতের বিভিন্ন মাসয়ালার আনুসংগিক বিষয়াদির উপর আলোচনা ও অনুসন্ধান করা এবং সেই

অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই সম্মেলনে মাওলানা বদরে আলম সাহেব, মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব লুধিয়ানভী, মাওলানা মূর্তজা হাসান, মাওলানা সাইয়েদ আতা উল্লাহ শাহ বোখারী সাহেব রাহি মাহুমাল্লাহুম এবং অন্যান্য বড় বড় আলেম উপস্থিত ছিলেন। হজরতে আলা মাওলানা আনোয়ার শাহ সাহেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য মিয়ানওয়ালী গেলেন এবং খানকায়ে সিরাজীয়ায় তসরিফ আনার জন্যও দাওয়াত পেশ করিলেন। শাহ সাহেব কেবলা দাওয়াত কবুল করিলেন। তখন হজরত শাহ সাহেবের সম্মুখেই মাওলানা হোসাইন আলী সাহেব বলিলেনঃ হজরত আহমদ খান সাহেব আমার পীর ভাই এবং একই তরীকাভুক্ত। কিন্তু তিনি বিদয়াতের বিরুদ্ধে কঠোর হন না। অথচ কুরআনে পাকে অগলুজ আলাইহিম এর অকাট্য প্রমাণ আছে।

হজরতে আলা বলিলেনঃ এই পবিত্র আয়াতটি জিহাদ সম্পর্কে এবং ইহার দ্বারা কাফের সম্প্রদায়ের উপর কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দ্বীন প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে "ফাকুলা লাহু কওলালা লাইয়েনা" ইরশাদ হইয়াছে। অতঃপর হজরত শাহ সাহেব কাশ্মীরী (রঃ) খানকায়ে সিরাজীয়ায় তসরিফ আনার পর তিনি তাঁহার অনুসন্ধানকৃত বিষয়াদী বিস্তারিভাবে শাহ সাহেবের খেদমতে পেশ করেন। তাহা দেখার পর হজরত শাহ সাহেব বলেনঃ এই মাসয়ালার ব্যাপারে ওলামায়ে দেওবন্দের সবসময়ই দ্বিমত রহিয়াছে তবুও আপনার এত মূল্যবান অনুসন্ধান অনুযায়ী আপনার জন্য ইহার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। হজরতে আলার অনুসন্ধানের অন্যতম বিষয় ছিল মুসলিম শরীফে কিতাবুল লিবাস ওয়াজযীনাহ অধ্যায়ে হজরত জাবের (রা.) এর বর্ণিত হাদীসঃ গাইয়েরু হাজা বিশাইইন অজতানিবুস সাওয়াদ" অর্থাৎ চুলের ঐ সাদা বর্ণকে কোন কিছু দিয়া পরিবর্তন করিয়া দাও, কাল রং হইতে বিরত থাক। এই হাদীসে আজতানিবুস সাওয়াদ কথাটি সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়। এই আলোচনার সার কথা এই যে, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী চারজন। ইহাদের মধ্যে দুইজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আজতানিবুস সাওয়াদ কথাটি দুর্বল বর্ণনাকারীদের। যখন নির্ভুল বর্ণনাকারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইলঃ যাবের (রাঃ) কি আজতানিবুস সাওয়াদ কথাটি বর্ণনা করিয়াছেন? তখন তাঁহারা বলিলেনঃ না, তিনি ইহা বর্ণনা করেন নাই। অতএব গাইয়েরু হাজা বিশাইইন এর বর্ণনা সঠিক অর্থাৎ সাদা চুলের রং পাল্টাইয়া নাও। ইহা একটি সাধারণ নির্দেশ। সাদা বর্ণের উপর কাল খেজাব অথবা মেহেদী ইত্যাদি দ্বারা রং পরিবর্তন করিয়া নেওয়া যায়।

তিনি নক্শবন্দীয়ার ইমাম

হজরতে আলার সহিত আল্লামা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হজরতে আলা একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য দেওবন্দ

গিয়াছিলেন। দেওবন্দ অবস্থানকালে একদিন হজরত আল্লামা আলোচনাকালে হজরতে আলাকে বলিলেনঃ মাওলানা সাহেব, হাদীস শরীফ পাঠদান অবস্থায় আমি কখন কখন শ্রেণীকক্ষে একটি খারাপ পরিবেশ অনুভব করি। অথচ ইহার পূর্বে হাদিসে দরস দেওয়ার সময় পরিবেশ একান্ত পাকপবিত্র ও মনোরম থাকিত। শুনিয়া হজরতে আলা শাহ সাহেব কেবলাকে বলিলেনঃ আপনার ক্লাসে কোন কোন ছাত্রের অজু ছাড়া নাপাক অবস্থায় শরীক হওয়াতে আপনি এরূপ মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন। অনুসন্ধান করার পর হজরতে আলার কথা সঠিক প্রমাণিত হইল। হজরত আল্লামা হজরতে আলার এই কথা তাঁহার সমকালীন ওলামাদের জানান। তিনি হজরতে আলার অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেনঃ হজরত মাওলানা আহমদ খান সাহেব বর্তমানে সিলসিলায়ে আলীয়া নক্শবন্দীয়ার ইমাম এবং একজন পীরে কামেল।

হজরত সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ সাহেব বোখারীর জন্য দোয়া

খানকায়ে সিরাজীয়ার গদীনিশীন হজরত খান মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেনঃ হজরত সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারী রাওয়ালপিন্ডি জেলে বন্দী ছিলেন। সেখানে মাওলানা জহুর আহমদ সাহেব বাগভী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শাহ সাহেব মাওলানা সাহেবের মাধ্যমে আলা হজরতের নিকট এই খবর পাঠান যে, আপনি জীবিত থাকিতে আমি জেলের অন্ধকার কোঠায় আবদ্ধ থাকিবে, ইহা সমীচীন মনে হইতেছে না। মুক্তির জন্য দোয়ার আবেদন করাই আমার উদ্দেশ্য। জনাব গদীনিশীন সাহেব আরো বলেনঃ আমি তখন ভেরাতে আরবী পড়াশুনা করিতেছিলাম। মাওলানা সাহেব এই খবর আমাকে দিলে আমি আলা হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং শাহ সাহেবের খবর জানাইলাম। হজরতে আলা বলিলেনঃ যদি আমি অসুস্থ না হইতাম, তাহা হইলে শাহ সাহেবকে একটি দিনও জেলখানায় থাকিতে দিতাম না। ইহার পর প্রসিদ্ধ সুধারামওয়ালা মামলার শুনানী আরম্ভ হইল এবং আলা হজরতের ধ্যান ও দোয়ার বরকতে তিনি বন্দী অবস্থায়ও ভীষণ ষড়যন্ত্রমূলক মুকাদ্দমা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

হজরত ইমামে রব্বানীর অত্যধিক ভক্তি

হজরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের কাদেরী চিস্তির খানকা খানকায়ে সিরাজিয়ার নিকটেই অবস্থিত। মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ সাহেব একবার সারহিন্দ শরীফে হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রঃ) এর রওজা শরীফে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া এই আবেদন করিলেনঃ আমাকে যে কোন একটি উপঢৌকন দান করিতে মর্জি হয়। আবেদন পেশের পর তিনি নিজের থাকার

জায়গায় চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় বার হজরতের মাজার শরীফে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, কবর মুবারকের উপর বিছান গেলাফের মাঝের অংশ উপরের দিকে উঠিয়া আছে। মাওলানা সাহেব মনে করিলেন যে, তাহার দরখাস্ত কবুল হইয়াছে এবং গেলাফের নিচে যে বস্তুটি আছে, তাহা তাঁহার জন্যই হাদীয়া। গেলাফ উঠাইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহার নীচে আছে মাটির বড় একটি চাকা। উহা তিনি তুলিয়া নিলেন এবং কয়েক দিন অবস্থানের পর নিজের খানকায় ফিরিয়া আসিলেন। যখন মাওলানা সাহেবের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল, তখন তিনি হজরতে আলাকে ডাকিলেন এবং বলিলেনঃ আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে। আপনি আমার অন্তিম আকাংখা পূর্ণ করিবেন। ইহা বলার পর তিনি হজরতে মুজাদ্দেদে আলফেসানীর মাজার মুবারক হইতে হাদিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত সেই মাটির চাকাটির কথা জানাইয়া অনুরোধ করিলেন যে, এই মাটির চাকাটি যেন মিহিন করিয়া পিষিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত সিজদার জায়গায় মালিশ করিয়া দেওয়া হয়। হজরতে আলা তাঁহার ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। আংগুলের সাহায্যে সমস্ত মাটি তাঁহার সিজদার জায়গায় লাগাইয়া দিয়াছেন এবং অবশিষ্ট অংশ পানিতে গুলিয়া বরকত স্বরূপ পান করিয়াছেন।

প্রকৃত অশান্তি চিহ্নিতকরণ

এক সময় শহীদগঞ্জ মসজিদের আন্দোলন জোরালভাবে চলিতেছিল। মুসলমানগণ ভীষণ উত্তেজিত ছিল। হজরতে আলা সে সময় মজলিসে আহরারকে একখানা চিঠিতে লেখেনঃ যদি শহীদগঞ্জের মসজিদ মুসলমানদের হাতছাড়া হইয়া যায় তাহা হইলে সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ায় পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করা যাইবে। ইহা মুসলমানদের দ্বিতীয় দায়িত্ব। ইসলামের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণই মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য। প্রকৃত ইসলাম পরিপন্থী কাজ বর্তমানে মির্জাইয়াত। তাহারা ইসলামের অস্তিত্বকে মিটাইয়া দিতে চায়। ইহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদি ইসলাম ঠিক থাকে তাহা হইলে মসজিদের অভাব থাকিবেনা। অতএব ইসলামকে টিকাইয়া রাখার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করা উচিৎ। মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব লুধিয়ানভী, হজরত আতাউল্লাহ শাহ সাহেব বোখারী (রঃ) এবং অন্যান্য আহরার প্রধানগণ বলিলেনঃ আব্দুল কাদের রায়পুরী এবং হজরতে আলা মাওলানা আহমদ খান সাহেব এবং বরকতময় ব্যক্তিত্বগণ শহীদগঞ্জ মসজিদের ব্যাপারে আমাদিগকে সঠিক পরামর্শ দিয়াছেন এবং সর্বদা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

কাজী আইয়াজ সাহেবের আরোগ্য লাভ

হজরতে আলা বলিয়াছেনঃ হুজুর (সঃ) এর চরিত্র মাধুর্য্য সম্পর্কে কাজী আইয়াজ (রঃ) এর কিতাব পাঠ করা প্রয়োজন। এই কিতাবে খাতেমুন নাবিয়ীন হুজুর (সঃ) এর

পবিত্র জীবনের সকল অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। হুজুর (সঃ) এর পবিত্র চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত বিষয়াদি সঠিক প্রমাণাদি সহ মুসলিম উম্মার সম্মুখে তুলিয়া ধরার সুবিধার্থে আলেম সম্প্রদায়ের এই কিতাব বেশী পাঠ করা উচিৎ।

মসজিদ কবুল হওয়ার ভবিষ্যদ্বানী

মিয়া নামদার খান সাহেব বর্ণনা করেনঃ খানকায়ে সিরাজীয়ার বর্তমান মসজিদ নির্মাণের শেষ পর্যায়ে ছিল এবং আমরা সকলেই হজরতে আলার নিকট বসিয়াছিলাম। আহলে মজলিশের কোন একজন বলিলেন, এই মসজিদ শহরের মধ্যে থাকিলে কতইনা ভাল হইত। একথা শুনিয়া হজরতে আলা বলিলেনঃ মসজিদ কোন শহরে হউক বা গ্রামে হউক, তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য নামাজিদের শুভাগমনেই হয়। ইনশাআল্লাহ আমাদের মসজিদ কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিবে এবং দূর দূরান্ত হইতে মানুষ ইহাকে দেখিতে আসিতে থাকিবে। এক মজলিসে হজরতে আলা একথাও বলিয়াছিলেন যে, এই মসজিদে জুম্মার নামাজও পড়া হইবে।

ধৈর্য্য ও আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকার উপদেশ

মিয়া নামদার খান বর্ণনা করিয়াছেনঃ হজরতে আলা একবার সারাহিন্দ শরীফে হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর রওজা শরীফে তসরিফ নিলেন। এদিকে সাহেবজাদা সাদেক সাহেব অসুস্থ হইয়া বাড়ীতে আসেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করেন। হজরতে আলা প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বপ্রথম মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের কবরে ফাতেহা পাঠ করেন। অতঃপর অন্তঃপুরে গিয়া শোকাহত পরিবার পরিজনকে হায়হুতাশ করিতে বারণ করিয়া বাহিরে আসেন। সে সময় আমরা ভক্তগণ মাওলানা আহমদ দ্বীন সাহেবের সহিত উল্টানো ১টি চৌকির উপর বসিয়াছিলাম। হজরতে আলা আমাদের উপবেশনের এই অবস্থা দেখিয়া মাওলানা আহমদ দ্বীন সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ হজরত আপনি আলেম ফাজেল হইয়াও দুঃখ প্রকাশ করার ইহা কোন পথ অবলম্বন করিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন, হুজুর ইহাদের এইটাই রসুম। তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলা সর্বঅবস্থায় অগ্রগণ্য মনে করিতে হইবে। এরূপ প্রথা হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা উচিৎ। অতঃপর কথা প্রসংগে বলিলেনঃ প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। চিরস্থায়ী জীবন একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তাঁহার ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকাও একটি ইবাদত এবং তাঁহার মহত্তের সামনে কাহারো কিছু বলিবার নাই।

একজনের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ

এই ঘটনাও মিয়া নামদার খান সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ একবার আলা হজরত আমার ফুফাত ভাই মুহাম্মদ বখশ এর দাওয়াতে গুলমেরী গমন করেন।

মুহাম্মদ বখশ একজন সওদাগরের নিকট ঋণী ছিলেন। সূদখোর তাঁহাকে ঋণ শোধ করার জন্য বারবার বিরক্ত করিতেছিল। হজরতে আলার উপস্থিতেও সে তাঁহাকে ধমকাইতেছিল। হজরতে আলা তাহাকে খাতাপত্র আনিতে বলিলেন। খাতাপত্র আনার জন্য বাড়ীতে পৌঁছিলে সে মারাত্মক পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হইল। ইহার পর যখন সে খাতা পত্র আনিল তখন দেখা গেল, তাহাতে মুহাম্মদ বখশের নামে আদৌ কোন হিসাব নাই। যে সকল হিসাব সে নিজহাতে লিখিয়াছিল তাহা খাতা হইতে মিটিয়া গিয়াছে। হজরতে আলা বলিলেনঃ একটি উট নিয়া যাও এবং তাহার হিসাব চুকাইয়া দাও। কিন্তু সে বারবার শুধু বলিতেছিল যে, হুজুর, আমাকে বাঁচান। আমি তাহার নিকট কিছুই চাই না। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ বখশ আলা হজরতের দোয়ার বরকতে মহাজনের এত বড় সূদের হিসাব হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

বরকতময় দৃষ্টি

হজরতে আলার অন্যতম মুরীদ আব্দুল জলীল সাহেবের নিকট হইতে সরদার আলী খান সাহেব এই ঘটনা শুনিয়াছেনঃ হজরতে আলা একবার সফরের সময় এক জায়গায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই গ্রামের জনৈক সাইয়েদ সাহেব বলিলেন যে, বর্তমানে পীর ফকীরগণ ব্যবসা শুরু করিয়াছেন এবং আল্লাহর বান্দাদিগকে বিপথগামী করিতেছেন। তাহার এই বক্তব্য আলা হজরতের কাছে পৌছান হইল। তিনি পরের দিন ১০ টায় তাহাকে সাক্ষাতের জন্য আহবান জানাইলেন। সাইয়েদ সাহেব হজরতে আলার কামরায় প্রবেশের পর আলা হজরত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সাইয়েদ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সাইয়েদ সাহেব হজরতে আলার পায়ে পড়িলেন এবং মুরীদ হওয়ার আবেদন জানাইলেন। হজরতে আলা বলিলেনঃ এখন তোমাকে মুরীদ করা হইবে না। প্রথম ইহা দেখ যে, কোন সওদা এই দোকানে পাওয়া যায় না। ইহার পর বলিলেনঃ সফরের মধ্যে তোমাকে বাইয়াত করিব না। তবে যদি খানকায়ে সিরাজীয়ায় আস তাহা হইলে সেখানে তোমাকে মুরীদ করা হইবে। পরে সাইয়েদ সাহেব খানকায়ে সিরাজীয়ার উপস্থিত হইয়া তরীকায় প্রবেশ করেন। তিনি একমাস সেখানে অবস্থান করেন এবং স্বল্প সময়ে এমন উচ্চ স্থান অর্জন করেন যাহা কয়েক বৎসর সাধনা করিয়াও হাসিল করা যায় না।

হুজুর (সঃ) এর সালামের জবাব

হজরত সাইয়েদ মুগীস উদ্দিন শাহ সাহেব বলিয়াছেনঃ হজরতে আলা হজ্জ সমাপনান্তে হুজুর (সঃ) এর রওজা শরীফ জিয়ারাত করেন। মদীনা মনওয়ারায়

অবস্থানকালে একদিন তিনি হুজুরের রওজা শরীফে এমন সময় গেলেন যখন সেখানে অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না। তিনি নবী করীম (সঃ) এর খেদমতে সালাম পেশ করিলেন। এবং হুজুর (সঃ) এর জবাব তিনি নিজ কানে শুনিলেন।

অত্যন্ত দয়া প্রবণতা

অর্ধ শতাব্দী যাবৎ খানকায়ে সিরাজীয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত সুফী আব্দুলাহ সাহেব বলেনঃ আলা হজরত জীবনের শেষ দিনগুলিতে বলিতেনঃ আমি কোন মুরীদকে বঞ্চিত রাখি নাই। প্রত্যেককেই সিলসিলায়ে আলীয়া নকসবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়ার ফয়েজ ও বরকতের দ্বারা ধন্য করা হইয়াছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যুগ পরিপূর্ণ হইয়াছে। এবং এখন আকাংখা এই যে, আল্লাহ পাক সুযোগ দান করিলে একটি নূতন যুগ শুরু হইবে। প্রথম বারের মত সত্য অন্বেষনকারীদিগকে তরীকায় প্রবেশ করাইব এবং তাহাদিগকে আল্লাহর মঞ্জিল পার করাইয়া দিব। যে মজলিশে হজরতে আলা এই কথা বলিয়াছেন, সেই মজলিশে যতজন তরীকাপন্থী উপস্থিত ছিলেন, সকলকে তিনি একই সময় তরীকা প্রচারের অনুমতি দান করিয়াছেন। ডঃ মুহাম্মদ শরীফ সাহেব এবং অন্যান্য ব্যক্তি ঐ মজলিশে উপস্থিত ছিলেন।

সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব

মিয়া নামদার খান সাহেব বলেনঃ আমি হজরতে আলার জমিনে হাল চাষ করিতেছিলাম এই সময় হজরতে আলা ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেনঃ আহমদ লাঙ্গরীকে আল্লাহ তায়ালা সন্তান দান করিয়াছেন। যদি আল্লাহ পাক তোমাকে একটি সন্তান দান করিতেন তাহা হইলে কতইনা আনন্দ হইত। আমি উত্তরে বলিলাম, ইহা হুজুরের দোওয়ার দ্বারা হইতে পারে। ঠিক ঐ সময়ই হজরতে আলার একজন মুরীদ লংগরখানার জন্য আচারের একটি বড় পাত্র মাথায় নিয়া কুন্দিয়ান হইতে আসিতেছিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেনঃ আমাদের সাথীদের পথে অনেক কষ্ট করিতে হয়। ইহার পর তিনি পশ্চিম দিকে ইশারা করিয়া করিয়া বলিলেনঃ মুরীদগণ এবং বন্ধুগণ দোয়া কর যেন এই খানে কোন রেলষ্টেশন হইয়া যায়। তাহা হইলে আসা যাওয়া সহজ হইবে। অতঃপর বর্ণনাকারী বলিতেছেনঃ আমি আলা হজরতের তিনটি কেরামত আমার নিজের চোখে দেখিয়াছিঃ (১) যেদিকে তিনি ইশারা করিয়াছিলেন, খানকায়ে সিরাজিয়ার রেল ষ্টেশন ঠিক সেই খানেই হইয়াছে, (২) আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি সন্তান দান করিয়াছেন এবং (৩) আমার সেই সন্তানটি রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার দোয়ায় আবার পরিপূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। সে এখনও পরিবার পরিজনসহ জীবিত আছে।

মিয়া নামদার খান সাহেব বলেনঃ আমি বছরের পর বছর হজরতে আলার খেদমতে ছিলাম। তিনি কোন ব্যাপারে কখনও কঠোরতা প্রকাশ করেন নাই। সর্বদা নম্রতা ও ভদ্রতা রক্ষা করিতেন। যখন কোন ব্যাপারে হজরতে আলা বলিতেন, এইরূপ হইলে খুব ভাল হইবে, তখন আমি বুঝিয়া নিতাম যে, এই নির্দেশ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হইতেছে এবং ইহা কখনও রদবদল হইবেনা।

ঈমান বৃদ্ধির কয়েকটি প্রত্যক্ষ ঘটনা

এই শিরোনামের অধীনে আমরা পাঠকবর্গকে মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেবের পরিচয় দিতে চাই। তিনি ছিলেন আলা হজরতের পীর ভাই এবং ঐ সময়কার বিশিষ্ট খাদেমগণের অন্যতম। হজরতে আলার বাখরা শরীফে অবস্থানকালে আব্দুস সাত্তার সাহেবের বয়স ছিল ১০৩ বৎসর। তিনি একজন বড় আলেম এবং পীরে কামেল ছিলেন। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি তিনি বর্ণনা করিয়াছেনঃ

হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এবং সারহিন্দ শরীফের অন্যান্য খাজা সাহেবানদের সহিত রুহানী সাক্ষাৎ

একবার আলা হজরত সারহিন্দ শরীফে হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানীর রওজা শরীফে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত মুরীদদের একটি বড় দলও ছিল। মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব সেই দলে ছিলেন। হজরতে আলা মওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেবকে সব সময়ের জন্য তাঁহার খেদমতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে একদিন খুব ভোরে তিনি হজরতে মুজাদ্দেদে আলফেসানীর মাজারে গেলেন। কিছুক্ষণ সেখানে মুরাকাবা করার পর নিজ কক্ষে চলিয়া আসিলেন। সেখানে ভক্তগণ তাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন। চা প্রস্তুত ছিল এবং পেশ করা হইল। মাওলানা অব্দুস সাত্তার সাহেব চায়ের পিয়ালা হাতে নিয়াই দেখিলেন যে, হজরতে মুজাদ্দেদে আলফেসানী, খাজা মুহাম্মদ মাসুম হুজ্জাতুল্লাহ নক্শবন্দে সানী, খাজা সাইফুদ্দীন এবং খাজা মুহাম্মদে জুবায়ের (রাহিমাহুমাল্লাহুম) রুহানী তসরীফ আনিয়াছেন। অবশ্য খাজা মুহাম্মদ জুবায়ের একটু পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মাওলানা সাহেব এই দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষানাৎ তাঁহাদের সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চায়ের পিয়ালা হাত হইতে কার্পেট এর উপর পড়িয়া গেল। হজরতে আলা এবং অন্য সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পর ঐ সকল পবিত্র আত্মা প্রস্থান করিলেন। মাওলানা সাহেব হজরতে আলাকে বলিলেন, হুজুর, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমি মুজাদ্দেদীয়া তরীকার বুযুর্গদের সম্মানে আপনার আগেই দাঁড়াইয়াগিয়াছি। ইহার উত্তরে হজরতে আলা বলিলেন, আত্মভোলা ফকীর, তুমি ঠিকই করিয়াছ, ইহাতে অসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই।

কবর আজাব রদ

মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব বর্ণনা করিয়াছেনঃ আমরা হজরত গোলাম মুহাম্মদ কাদেরী চিস্তির জানাজা লইয়া তাঁহার নিজের জমিনে দাফন করার জন্য উপস্থিত হইলাম। কবরস্থান নিকটেই ছিল। কবর খননের কাজ চলিতেছিল। কাজেই সেখানে আমরা সবাই বসিয়া পড়িলাম। আমি একটি কবরের নিকট বসিয়া মুরাকাবা করিলাম এবং লক্ষ্য করিলাম যে, কবরে দাফনকৃত ব্যক্তি আগুনে জ্বলিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার শরীর হইতে ঘাম বাহির হইল এবং মুখমন্ডলের রং পরিবর্তন হইয়া গেল। আলা হজরত নিকটেই বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং সেখানে মুরাকাবা করিলেন এবং বিশেষ ধ্যান দিলেন এবং বলিলেনঃ আল্লাহ দয়া পরবশ হইয়া এই ব্যক্তির অর্ধেক গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহার আত্মীয় স্বজনদিগকে বল যে, তাহারা যেন উহার জন্য কুরআন শরীফ খতম করাইয়া দেয়। উহাতে তাঁহার অবশিষ্ট শাস্তিটুকুও মাফ হইয়া যাইবে। তাহারা হজরতে আলার কথামত কাজ করিলেন। ইহার পর আমি পুনরায় ঐ ব্যক্তির কবরের নিকট বসিয়া মুরাকাবা করিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার উপর হইতে আল্লাহর শাস্তির অবসান হইয়াছে এবং তিনি জান্নাতেআছেন।

পীরের সম্পর্কের সঠিক স্থান

খাওলা শরীফে অবস্থানকালে আলা হজরত একবার মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেবকে গুলমেরী এবং নাগনী হইতে মুরগী আনিতে পাঠাইলেন। ঐ দুই স্থানের দূরত্ব খাওলা শরীফ হইতে ১২/১৩ মাইল ছিল। অতএব মাওলানা সাহেব অতি দ্রুততার সহিত গন্তব্য স্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। বালুময় পথ তিনি দৌড়াইয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন নূরানী চেহারার সাদা দাড়ীচুল বুযুর্গ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সালামের পর মাওলানা সাহেবের সহিত মোসাফাহা করিয়া বলিলেনঃ 'আমি খিজির (আঃ), কিছুক্ষণ আমার নিকট অপেক্ষা কর'। মাওলানা সাহেব উত্তর দিলেন, আমার খিজির (আঃ) খাওলা শরীফে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে গুলমেরী ও নাগনী হইতে মুরগী আনার জন্য হুকুম করিয়াছেন। কাজেই অনুমতি দিন, আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া সাইয়েদিনা খিজির (আঃ) বলিলেনঃ ধন্য হও, ধন্য হও। মাওলানা সাহেব উভয় গ্রাম হইতে মুরগী খরিদ করিয়া একটি টুকরীতে (যাহা তিনি সংগে নিয়া গিয়াছিলেন) ভরিয়া দ্রুতগতিতে ফেরত রওনা হইলেন। মাগরীবের নামাজ সেখানকার মসজিদে আদায় করিলেন। কিন্তু মুরগীর টুকরী সেখানে ভুলে রাখিয়া গেলেন। তিনি আলা হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হজরত

জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আব্দুস সাত্তার, তুমি আসিয়াছ কিন্তু আমার মুরগী কোথায়? মাওলানা সাহেবের তখন স্মরণ হইল যে, মুরগীর টুকরী তিনি মসজিদের নিকট ফেলিয়া আসিয়াছেন। তৎখনাৎ তিনি দৌড়াইয়া সেখানে গেলেন, টুকরী আনিলেন এবং হজরতে আলার খেদমতে পেশ করিলেন। আলা হজরত মাওলানা সাহেবকে বলিলেনঃ তোমার সফরের অবস্থা বর্ণনা কর। মাওলানা সাহেব সাইয়েদিনা খিজির (আঃ) এর সহিত সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করিলেন। আলা হজরত বলিলেনঃ খিজির (আঃ) কে এইরূপ উত্তর দেওয়ার নিয়ম তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে? মাওলানা সাহেব আকাশের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালা, আপনার উসিলায়। ইহার পর হজরতে আলা মাওলানা সাহেবকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেনঃ মারহাবা, মারহাবা।

আল্লাহর নূর বর্ষিত হওয়া

মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব আলা হজরতের জীবনী গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারে ৭ই জুলাই ১৯৭২ইং খানকায়ে সিরাজীয়ায় আগমন করেন। তিনি রাত্রে খানকায় অবস্থান করিলেন। সেহরীর সময় উঠিয়া তিনি হজরতে আলার মাজার শরীফের দিকে গেলেন। মাজারের মিনারার ভিতরে প্রবেশ করার সময় দীর্ঘদিন পর উপস্থিত হওয়ার কথা মনে পড়ায় লজ্জিত হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন হজরতে আলার কবর মুবারক হইতে এই আওয়াজ আসিলঃ হে বন্ধু আস, যেহেতু আমি তোমার। অপরিচিত মনে করিও না; কারণ যে, আমি তোমার আপনজন।

এই বানী শুনিয়া তিনি সান্তনা লাভ করেন এবং মাজারের নিকট বসিয়া সোয়া একঘন্টা মুরাকাবা করেন। মাওলানা সাহেব বলেন, হজরতে আলার মাজার মুবারকে আমি আল্লাহ তায়ালার নূরের সেই তাজাল্লি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যাহা ইতিপূর্বে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

সাহিত্য চর্চার প্রতি হজরতে আলার উৎসাহ

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হজরতে আলাকে যেমনভাবে ওলীর সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ঠিক সেইভাবে তাঁহাকে সাহিত্য চর্চায়ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। এই অমূল্য সম্পদ তিনি জীবনের প্রথম দিন হইতেই সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন। সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ প্রকৃতপক্ষে এমন একটি পবিত্র অভ্যাস যাহা সত্যিকারের ব্যথিত, উদারমনা এবং প্রেম ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিরাই হাসিল করিতে পারেন। যে হৃদয়ে ব্যথার পরশ নাই তাহার কবিতা মর্মস্পর্শী হইতে পারে না। এই অবস্থাই সর্বদা একজন রুচিবান সাহিত্যিকের আসল চিন্তাধারা। কোন বিষয়

অস্পষ্ট হইলে উন্নত মানের কবিতার সাহায্যে তাহা স্পষ্ট করা যায়। কবিতা সাধারণ বর্ণনাকেও সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলে। বর্ণনার এই বৈচিত্রের কারণে পাঠককুল ক্রমাগত সন্মুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, একনিষ্ঠতা ছিন্ন হয় না। কবিতা লেখার মধ্যে কবি যখন মনোনিবেশ করেন, তখন তিনি আশ্চর্যভাবে উহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিনা দ্বিধায় সামনে অগ্রসর হইতে থাকেন।

এই প্রসংগে আরো বলা যায় যে, হজরত হাসান বিন সাবেত (রাঃ) একজন মহান কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি হুজুর (সঃ) এর শানে অনেক নাত লিখিয়াছেন। হুজুর (সঃ) তাঁহার জন্য এইরূপ দোয়া করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ, রুহুল কুদ্দুস অর্থাৎ জিবরায়ীল (আঃ) এর দ্বারা হাসান বিন সাবেতকে সাহায্য করুন। ইহার পর তিনি হুজুর (সঃ) এর ইসলামের শানে অতিদ্রুত এবং তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা করিতেন। হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) নিজ লেখার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে আরবী ফার্সী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়া আলোচ্য বিষয়ের বক্তব্য ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্টতর করিয়াছেন। তরীকার স্তরসমুহের দুর্বোধ্যতা এবং অর্থসমূহের বর্ণনার সময় তিনি প্রায়ই এই কবিতা উদ্ধৃত করিতেন।

كَيْـفَ الْـوُصُوْلُ اِلٰى سُعَا دُوْدُوْنَـهَا = قُلَلُ الْـجِبَالِ وَدُوْ
نَـهُـنَّ خُـيُـوْفُ

অর্থাৎ প্রিয় সায়াদের দিকে কি করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব যখন উহার পূর্বে সুউচ্চ পর্বত রহিয়াছে এবং তাহার পর রহিয়াছে রেগিস্তান।

এই ভাবেই হজরত ইমামে রব্বানী (রঃ) আহলে তলব অর্থাৎ আল্লাহর আশেকগণের আল্লাহর নূরের দ্বারা পিপাসা দূর করা সত্ত্বেও পিপাসা প্রকাশ করা এবং এইরূপ অন্যান্য অনুভূতিকে এই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। যেন সাহিত্য অনুধাবনের এই পবিত্র সম্পদও মুজাদ্দেদীয়া তরীকার একটি বিশেষ অবদান। হজরতে আলার ফার্সী কবিতার ধরণও সম্পূর্ণ হজরত ইমামে রব্বানীর অনুরূপ। তাঁহার রচিত উর্দূ ও ফার্সী কবিতা অথবা হজরত আলার বরকতময় মুখ হইতে তাঁহার মুরীদগণ যেসব কবিতা শুনিয়াছেন, তাহা সুক্ষতা ও পরিচ্ছন্নতার উদাহরণস্বরূপ।

আলা হজরতের সাহিত্য চর্চা ছিল অনেক উন্নতমানের। সভায় বসিয়া কখনও কোন কবিতা পাঠ করিলে শ্রোতারা বেহুঁশ হইয়া পড়িতেন। হজরতে আলার শেষের দিকের মুরীদ মাষ্টার খুশি মুহাম্মদ সাহেব এই লেখকের নিকট বর্ণনা করিয়াছেনঃ হজরতে আলা একবার জলনধর গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে একটি সাহিত্য মজলিশে (মাষ্টার

সাহেবও উপস্থিত ছিলেন) অতি উচ্চ পর্যায়ের বিষয়সমূহের উপর বিতর্ক চলিতেছিল। সেই সময় আলা হজরত আত্মমগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর ঐ অবস্থা দূর হইলে বলিলেনঃ ভাইসব, এক আল্লাহর অস্তিত্বের সম্পর্ক রহিয়াছে দিলের সহিত। কেহ যত বড় আলেমই হোক না কেন, মাসয়ালার গভীরে পৌঁছাইতে পারিবেন না। ইমামদের সকলেরই অন্তর্দৃষ্টি ছিল। নিজ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তাঁহারা সকল সমস্যার সমাধান করিতেন। বৈঠক শেষ হওয়ার পর সকল বন্ধুবান্ধব অনুমতি নিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আলা হজরত চৌকির উপরে শুইয়া একটি কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

টোবায় অবস্থানকালে একবার হজরতে আলা মাষ্টার খুশি মুহাম্মদ সাহেবকে কোন একটি গজল শুনাইতে বলিলেন। মাষ্টার সাহেব জলীল দাফনীর একটি গজল আবৃত্তি করিলেন। তিনি কবিতা শুনিয়া বলিলেনঃ জলীল দাফনী একজন চমৎকার কবি। মাষ্টার সাহেবের কবিতা আবৃত্তি শেষ হইলে হজরতে আলা বলিলেনঃ তুমি আমার কথা খেয়ালে আনিও। উল্লেখিত মাষ্টার সাহেব বলেনঃ ইহার পর হজরতে আ'লার দোয়ায় তাঁহার প্রতি মনের খেয়াল এত বেশী হইয়াছে যে মৃত্যুর পূর্বে সেই খেয়াল কোন দিন অন্তর হইতে দূর হইবে না।

মাষ্টার সাহেব একবার এক চিঠিতে তরীকার সবক হাসিল করার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। হজরতে আ'লা তরীকার পথে চলার অসুবিধা ও বাধার কথা উল্লেখ করিয়া হজরতে আমীর খসরুর এই কবিতাটির মাধ্যমে জবাব দিলেনঃ

ین شربت عاشقی است خسروا
بے خون جگر چشیر نتوان

একবার হজরতে আ'লা কোন এক সফরে যাইতেছিলেন। গাড়ী আসিতে একটু দেরী হইতেছিল বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সকল মুরীদ এবং তরীকার সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন। এই সময় চারিত্রিক বিবেচনায় আপত্তিজনক এক মহিলা আলা হজরতের সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিল। খাদেমগণ তাহার সুরাতে হাল দেখিয়া কড়াকড়ি ভাবে তাহাকে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু আলা হজরত সকলকে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন এবং তাহাকে সামনে আসার অনুমতি দিলেন। সে নিকটে আসিয়া ব্যথার সুরে নিজের অবস্থা অনুযায়ী একটি কবিতা পাঠ করিল।

কবিতাটি শুনিয়া আলা হজরতের একটি বিশেষ অবস্থা দেখা দিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। গাড়ীতে উঠার পরও তাঁহার চোখের পানি বন্ধ হয় নাই।

সাহেবজাদা মুহাম্মদ সাঈদের সহিত আলা হজরতের বিশেষ আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তাঁহার ইন্তেকালে হজরতে আলা অত্যন্ত দুঃখ পান এবং প্রায়ই এই কবিতা পাঠ করিতেনঃ

تـور بـيـهـے جـبـكـه هم جام وسـو پـهـر هـم كـوكـيا آسـمـان
سـے باده گلـون اگـربـرساكـرے حـضـرت اعـلـى كـے پـسـنـد يـره
پـنـجابـى اشـعـا=

হজরতে আলার প্রিয় পাঞ্জাবী কবিতা

হজরতে আলার দরবারে সত্য অন্বেষণকারীদের অভাব ছিল না। তাঁহারা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আত্মার সৌন্দর্য্য এবং আত্মিক সংশোধনের জন্য আগমন করিতেন। এতদ্ব্যতীত ওলামায়ে কেরামদের জামাতও জমজমাট ছিল। কাজেই আলেমদের বৈঠকগুলি হইত বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। ফিকাহ, তাফসীর, হাদীস এবং মারেফাত প্রভৃতি মহান বিষয়াদির উপর আলোচনা হইত। হজরতে আলার সহিত এমন লোকেরাও সফর করিতেন, যাহারা সামান্য লেখাপড়া জানিতেন অথবা মোটেই জানিতেন না। তবে ইহাদের সকলেরই আলা হজরতের উপর ছিল অপরিমিত ভক্তিশ্রদ্ধা। ফার্সী–আরবী বিষয়াদি এবং তাহার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ইহাদের বোধগোম্য হইত না। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহ রববুল আলামীনের পরিচয় লাভ, এই সকল বিষয় ইহাদিগকে একমাত্র পাঞ্জাবী ভাষাতেই বুঝান সম্ভবপর ছিল। হৃদয়বান ও বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী পাঞ্জাবী কবিগণের কবিতা এই সব বিষয় সহজে বুঝাইতে সাহায্য করিত। এখানে একথা বলাও অপ্রাসংগিক হইবেনা যে, আলা হজরত কবিতা ও ইলমী যোগ্যতার সাথে সাথে পাঞ্জাবী ভাষার সাহিত্য সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখিতেন। পাঞ্জাবী কবিদের সম্পর্কে আলা হজরতের মন্তব্য বিশেষ গুরুত্ব রাখিত। খাওলা শরীফে আলা হজরতের বসবাসকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে হজরতের লেখা কবিতার প্রচুর চর্চা ছিল। খানকায়ে সিরাজীয়ার গ্রাম অঞ্চলের ভক্ত অধিবাসিগণ যখন হজরতে আলার সাক্ষাতের জন্য আসিতেন, তখন হাঁটা–চলার মধ্যে আল্লাহর ভালবাসায় উন্মাদের ন্যায় বিভিন্ন মনোজ্ঞ পাঞ্জাবী কবিতা পড়িতে পড়িতে চলাফেরা করিতেন। মিয়া নামদার খান সাহেব বলেনঃ হজরতে আলা প্রায়ই আমাদিগকে বিখ্যাত পাঞ্জাবী আধ্যাত্মিক কবি আলী হায়দারের কবিতা শুনাইতেন। তিনি আমাদের নিকট হইতেও শুনিতেন এবং বারাবার বলিতেন যে, আলী হায়দার সাহেব একজন কামেল পীরও ছিলেন। আলী হায়দার সাহেবের একটি ৪ লাইনের মন ভুলানো কবিতা আলা

হজরত নিজ বরকতময় মুখে প্রায়ই উচ্চারণ করিতেনঃ

اسی پردین نو اسان کروطن بَاسا
تین دلبر دے سا نگھے (الخے)
حضرت خوا جه غریب نواز کاارشادمبارك =

হজরত খাজা গরীব নওয়াজ এর বরকতময় উপদেশ

হজরত মাওলানা কাজী সদরউদ্দিন সাহেব মদ্দেজিল্লুহুল আলী বলিয়াছেনঃ আমি একসময় দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ দাক্কানে অবস্থান করিতেছিলাম। সেখানে হজরত মিসকিন শাহ সাহেবের এক মুরিদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার পীরের ইন্তেকালের পর ভীষন অস্থির অবস্থায় ছুটাছুটি করিতেছিলেন। হুজুর (সঃ) এর রওজায়ে পাকের জিয়ারতের দ্বারা আত্মিক উন্নতি হাসিলের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদিনা মুনাওয়ারা সফরের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা হইল, কলুষিত অন্তরে ঐ বরকতময় ও পবিত্র দরবারে যাওয়া উচিৎ নয়। অতঃপর তিনি একাধিক পীর ও আল্লাহওয়ালাদের দরবারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সান্ত্বনা ও তৃপ্তি কোথাও পাইলেন না। শেষ পর্যন্ত আজমীর শরীফ গেলেন এবং হজরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমীরী (রঃ) এর মাজারে উপস্থিত হইলেন। খাজা গরীব নওয়াজের রুহ মুবারকের বরকতের দ্বারা এই ফরমান জারী হইলঃ অমুক নদীর তীরে খাওলা খানায় একজন পীর ও বুজুর্গ আছেন। তোমার উন্নতি তাঁহার নিকটে। এবং যাওয়ার পথও বলিয়া দেওয়া হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি আলা হজরত আবুস সায়াদ আহমেদ খান সাহেবকে পীরের আসনে সমাসীন দেখিলেন। হজরত খাজা গরীব নওয়াজের আদেশ অনুযায়ী তিনি তাঁহার মুরীদ হওয়ার সম্মান লাভ করিয়া এরূপ কেরামত ও বুজুর্গী প্রত্যক্ষ করিলেন যাহা লিখিয়া শেষ করা যাইবেনা। হজরত কাজী সাহেব বলেনঃ যখন আমি তাঁহার নিকট হইতে এই ঘটনা শুনিলাম, তখন আমার অন্তরেও হজরতে আলার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার একটা দৃঢ় আগ্রহ জন্মিল। সেখানে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আলা হজরতের নিকট মুরীদ হইয়া ধন্য হইলাম।

হজরতে আলার আত্মার প্রসারতা

হজরত কাজী সদর উদ্দিন সাহেব বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আধ্যাত্মিক ভাবে উচ্চ ক্ষমতা দান করিয়াছেন এবং জাগতিক দিক হইতেও উচ্চস্থান দান করিয়াছেন। আত্মিক ও বাহ্যিক সামঞ্জস্যের দ্বারাই মানুষ "আহসানুত তাক্বাবীম"

অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছে। পরিচ্ছন্নতাও আত্মশুদ্ধির পথ। যখন আধ্যাত্মিকতা বস্তুবাদিতার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় তখন আত্মার শক্তির এত বিস্তার ও বিস্তৃতি এত বৃদ্ধি পায় যে মানবিক জ্ঞান তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। কর্ম সৎ বা সুমহান হইলে আত্মা প্রসারিত হয়। আর যদি কর্ম অসৎ বা অনুন্নত হয় তাহা হইলে সেই অনুযায়ী তাহার আত্মাও দুর্বল হইয়া যায়।

একবার উল্লেখিত কাজি সাহব আলা হজরতের আত্মার অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই বর্ণনাটি তাঁহার মুখেই শুনুনঃ আমার মুরীদ হওয়ায় শুরুতে কখনও কখনও দুনিয়ার দিকে মন চলিয়া যাইত। আমি চাহিতেছিলাম যে, ইহাও যেন না থাকে। আমি ভুলবশতঃ ইহা ভাবিতেছিলাম যে, আলা হজরতের খানকা শরীফে উত্তম সাজসজ্জা এবং মূল্যবান জিনিষপত্র আছে। পীর সাহেব সম্ভবতঃ দুনিয়াদারীর দিকে যে কোন কারণবশতঃ উৎসাহিত এবং দুনিয়াদারির দিকে আমার উৎসাহ হয়ত উহারই প্রতিচ্ছবি। কাজেই দুনিয়াদারীর উৎসাহ দূর করার জন্য একজন আল্লাহওয়ালা পাগলের নিকট গেলাম। তিনি পাহাড়ের চূড়ায় বাসিয়া থাকিতেন। বাস্তবিক পক্ষেই তিনি একজন আল্লাহর পাগল ছিলেন। তিনি খুব বড় আলেম যদিও ছিলেন না, কিন্তু উচুঁ দরের জ্ঞানীর ন্যায় কথাবার্তা বলিলেন । ঠিক এই সময় হজরতে আলা আত্মিক ভাবে (রুহানীতে) এরূপ মহান ও প্রকান্ড অস্তিত্বের সহিত দৃশ্যমান হইলেন যে, তাঁহার মাথা আসমান পর্যন্ত এবং এক হাত দক্ষিণকে ও আর এক হাত উত্তরকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার সামনে এই পাগলের অস্তিত্ব নিঃশ্চিহ্ন হইয়া গেল। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম এবং নিজ ভ্রান্ত ধারণা হইতে তওবা করিলাম। অতঃপর দয়ালু আল্লাহ আমাকে পীরের ভালবাসার সম্পর্ককে মজবুত করিয়া দিলেন।

উল্লেখিত কাজী সাহেব একবার গ্রীষ্মকালে খানকা শরীফে অবস্থানের সময় অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময় আলা হজরতও অসুস্থ ছিলেন এবং হাকীম চিনপীর সাহেব ও হাকীম আব্দুল জব্বার সাহেবের চিকিৎসাধীন ছিলেন। হজরতে আ'লা তাঁহার চিকিৎসকদেরকে বলিলেন যে, তাঁহারা যেন কাজী সাহেবের চিকিৎসার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, এখানকার গরমের কারণে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে। অতএব তাঁহারা এবোটাবাদ যাইয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। হজরতে আলা তাঁহাদিকে বলিলেনঃ আপনারা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিন এবং ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিন। ইনি এবোটাবাদ যাইয়া তাহা ব্যবহার করিবেন। উল্লেখিত কাজী সাহেব ভাবিলেন, খানকা শরীফে আর থাকা সম্ভপর না এবং এইখানে আসার উদ্দেশ্যও তাঁহার সফল হইল না। তাঁহার মনে গভীর নৈরাশ্য

দেখা দিল। এই অবস্থায় আলা হজরত কাজী সাহেবের চেহারার দিকে তাকাইয়া এক প্রকার বিশেষ দৃষ্টি দিলেন এবং দোয়া করিলেন যাহার উসিলায় কাজী সাহেবের সকল রোগ ভাল হইয়া গেল। চিকিৎসকগণ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং ভাবিলেন, এক পলকের মধ্যে সকল রোগ কিভাবে ভাল হইয়া গেল?

উল্লেখিত কাজী সাহেব সব সময় মাথা ব্যথায় কষ্ট পাইতেন। কোন অবস্থাতেই ভাল হইতেছিলেন না। তাঁহার এই অবস্থায় আ'লা হজরত দয়া করিয়া তাঁহাকে তরীকায়ে পাকের অনুমতি দান করিলেন এবং বলিলেনঃ যেভাবে আমার পীর আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন, সেইভাবেই আমিও অপনাকে অনুমতি দিলাম। উল্লেখিত কাজী সাহেব অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিলেনঃ হুজুর! আমি বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা এবং মাথা ব্যথায় বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছি। কাজেই এই দায়িত্বভার সহ্য করিতে পারিব না। হজরতে আলা ইহা শুনিয়া বলিলেনঃ চিন্তা করিবেন না। আল্লাহতায়ালা আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা ও শান্তি দান করিবেন। হজরতের এই আদেশের পর তাহার সকল শারীরিক অসুস্থতা ও মাথা ব্যথা ইত্যাদি দূর হইয়া গেল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সুস্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইলেন।

নিম্নে প্রদত্ত ঘটনাসমূহের বর্ণনা হজরতে আলার পুরাতন মুরীদ মাষ্টার খুশি মুহাম্মদ জাবের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি। বড়ই আফসোস যে, ফিকাহ, তাফসীর, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়াদির উপর প্রদত্ত আ'লা হজরতের বরকতময় উপদেশাবলী আলা হজরতের গুণীজ্ঞানী মুরীদদের অন্তরের অন্তঃস্থলে রক্ষিত ছিল কিন্তু কোন লিখিত বই আকারে ছিলনা। লিখিতভাবে সংরক্ষিত থাকিলে একটি বিরাট বই আকারে প্রকাশ করা যাইত। বর্তমানে সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ও তথ্যমূলক আলোচনা স্মরণ রাখার মত লোক খুব কমই বাঁচিয়া আছেন। যাহাই হোক, এ ব্যাপারে যতটুকু আমারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করা হইলঃ

একটি ব্যাখ্যার ইংগিত

মাষ্টার খুশি মুহাম্মদ "জার" সাহেব বর্ণনা করিয়াছেনঃ একবার খানকা শরীফে একটি মজলিশ হইতেছিল। হজরতে আলা তথায় এই আয়াতটি পাঠ করিলেনঃ

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

এবং বলিলেনঃ এই আয়াতে (হু) জমীর রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দিকে। তিনি ইহাও বলিলেনঃ ইহা ধ্যান করা এবং না করিবার ব্যাপারে প্রযোজ্য।

ইসলাম বিরোধী কাজের প্রতিবাদ

আরবী ভাষায় অনেক বড় একটি কিতাব কয়েক খাণ্ডে ছাপা হইতেছিল। হজরতে আলা সেই খন্ডগুলি ক্রয় করার জন্য হাদিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রত্যেকটি খণ্ড ছাপা হওয়ার পর হজরতের নিকট পাঠান হইত এবং তিনি তাহা পড়িতেন। একবার এমন একটি খণ্ড পাইলেন যাহাতে ইসলাম পরিপন্থী কিছু লেখা ছিল। এইকারণে হজরতে আলা সবগুলি খণ্ড ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং লিখিয়া দিলেনঃ আপনারা সকল খণ্ড ফেরৎ নিয়া নিন এবং আমি কোন হাদিয়া ফেরৎ চাই না।

কুরআন শরীফ পাঠের বিশেষ অভ্যাস

হজরতে আলা প্রায়ই জোহরের পর কুরআন পাঠ করিতেন। তাঁহার তেলাওয়াত আস্তে আস্তে হইত। কালামে পাকের এক মনজিল তিনি ৪০ মিনিটে পাঠ করিতেন এবং যেখানে চিন্তার প্রয়োজন হইত সেখানে দেরী করিতেন। আবার অনেক সময় এত দ্রুত তেলাওয়াত করিতেন যে, মনে হইত যেন তিনি কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার তাহাজ্জুদ নামাজে মোট ৪০ বার সূরায়ে ইয়াসীন পড়ার অভ্যাস ছিল।

মুজাদ্দেদীয়া তরীকার পরিচয়

দীর্ঘদিন যাবাৎ এই প্রথাটি প্রচারিত ছিল যে, আসরের পর হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ (রঃ) মাকতুবাত শরীফ সবকের ন্যায় পড়িতেন এবং অন্য মুরীদগণ পিছনে বসিয়া শুনিতেন। হজরত সাত্রী (রঃ) খুব দ্রুত পড়িতেন এবং হজরতে আলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; খুব কমই বলিতেন। একবার সবকের সময় বলিলেনঃ আব্দুল্লাহ সাহেব খুঁজিয়া দেখুন যে, মাকতুবাতে ইমামে রব্বানীর উপর সম্পূর্ণ দখল কয়টি লোকের আছে।

আল্লাহর যিকিরের বিশেষ প্রকারভেদ

মাষ্টার সাহেবের বর্ণনা মতে মাওলানা জহুর আহমদ সাহেব (বাগবী) একবার তাঁহার ভাই মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেবকে সংগে নিয়া হজরতে আ'লার নিকট খানকা শরীফে উপস্থিত হন। আলা হজরত তখন তাসবীহ খানায় ছিলেন এবং তাঁহার হাতে একটি তাসবীহ ছিল। মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেবের অন্তরে এই খেয়াল হইল যে, যদি তিনি সত্যিকারের পীর হন, তাহা হইলে তাসবীর কি প্রয়োজন? হজরতে আলা নিজের তাসবীর দিকে ইশারা করিয়া বলিলেনঃ মাওলানা সাহেব, ইহাতো বন্ধুত্ব গড়িয়া তুলিবার একটি চিহ্ন মাত্র। অতঃপর উল্লেখিত মাওলানা সাহেব খেয়াল

করিলেন যে, যদি বন্ধুত্ব করাই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সংখ্যার কি প্রয়োজন? হজরতে আ'লা একটি দানা ধরিলেন এবং তাহা নিচের দিকে টানিয়া বলিলেন হজরত, চব্বিশ হাজার হইয়া গিয়াছে। এখানে ক্লান্তি এবং গণনা নাই। মাওলানা সাহেব প্রত্যক্ষ করিলেন, আলা হজরতের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হইতেছিল। তিনি অতঃপর তরীকায়ে পাকে প্রবেশ করিলেন।

সিজদার মধ্যে পা মিলানো

মাওলানা গোলাম মহিউদ্দিন সাহেব সারগোদা জেলার একজন আহলে হাদীস আলেম ছিলেন। তাঁহার নিজস্ব কুতুবখানা ছিল। তিনি সর্বদা সংযম ও ন্যায় সংগত জীবন যাপন করিতেন। একবার তিনি হজরতে আলার খেদমতে খানকায়ে সিরাজিয়ায় আসিলেন। চার পাঁচদিন অবস্থানের পরও তিনি তাঁহার পরিচয় দেন নাই। বিদায় নেওয়ার সময় বলিলেন, আপনার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার যাহা আল্লাহ তায়ালার সহিত রহিয়াছে, তাহা আপনিই ভাল জানেন। আমি ইহা দেখিয়াছি যে, নামাজ এবং তাঁহার জরুরী বিষয়াদি পালনে আপনার আমল সম্পূর্ণ পবিত্র ও সুন্নত অনুযায়ী হইতেছে এবং এই ব্যাপারে আপনি একজন মুজাদ্দেদ হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি তবে আপনার সিজদার অবস্থায় পায়ের গোড়ালীদ্বয় মিলানো থাকেনা। ইহা হাদিসের কিতাব দ্বারা প্রমাণিত নয়। হজরতে আলা তৎখনাৎ বায়হাকী আনাইয়া নিম্নে প্রদত্ত হাদিসটি পেশ করিলেন। ইহার দ্বারা মাওলানার সন্দেহ বিদূরিত হইল। হাদিসটি এইরূপঃ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى

عن عروة من الزبير يقول قالت عائشة زوج النبى صلى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ رَسُوْلَ للّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّم وَكَانَ

مَعِيَ عَلَى فِرَاشٍ فَوجَدْ تَهُ سَاجِدًا رَآصًا عَقِبَيْهِ

مُسْتَقْبِلاً بِاَطْرَافِ اَصَا بِعِهِ اَلْقِبْلَةَ فَسَمِعْتَةَ يَقُوْلُ

اَعُوْذُ بِرِ ضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ

مِنْكَ امنى عَلَيْكَ لاَ اَبلُغُ كَلَّ مَا فِيْكَ الِى اخِرَ اَلْحَدِيْث

তরজমাঃ হজরত উরওয়া বিন যুবায়ের হইতে বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মুমীনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেনঃ আমি এক রাত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বিছানায় পাইলাম না অথচ তিনি আমার কাছেই শুইয়াছিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে সেজদার

অবস্থায় পাইলাম। তাঁহার দুই পায়ের গোড়ালী একটি আপরটির সহিত শক্তভাবে মিলান ছিল এবং পায়ের আংগুলের নখ ছিল কেবালার দিকে। আমি শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন, আয় আল্লাহ। আমি আপনার অসন্তুষ্টি হইতে সন্তুষ্টির, শাস্তি হইতে ক্ষমার এবং আপনার নিকট আমার আশ্রয় প্রার্থণা করিতেছি। আমি আপনার প্রশংসা করি। আপনার গুণাবলি কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিবেনা।

জুমার খুতবায় খোলাফায়ে রাশেদিনের আলোচনা

হুজরতে আলা এক সময় বাগড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানকার জামে মসজিদে মাওলানা নূরুল হক সাহেব খতীব ছিলেন। ঐদিন শুক্রবার ছিল। আলা হজরত মাওলানা নূরুল হক সাহেবকে জুমার খুতবা সংক্ষেপ করিতে বলিলেন। মাওলানা সাহেব খুতবা সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া খোলাফায়ে রাশেদীনের নামও ছাড়িয়া দিলেন। আলা হজরতের ইহা বড়ই অপছন্দ এবং ইহাতে তাঁহার মনে গোস্বা আসিল। তাই তিনি বলিলেনঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম উল্লেখ করা হইল সুন্নতওয়াল জামাতের একটি বিশেষ লক্ষণ এবং জুমার খুতবায় ইহা কোন অবস্থাতেই ছাড়া উচিত নয়।

সর্বশেষ

আলা হজরতের সম্মান ও যোগ্যতা বর্ণনাতীত। তাঁহার সুন্দর উপদেশ ও বক্তব্য, তরীকাপন্থীদিগকে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ , শরীয়াত অনুসরণের পরিপূর্ণ দৃঢ়তা, বিদায়াত পরিহারে উৎসাহদান, দ্বীনি ইলম বিশেষ করিয়া তাফসীর ও কুরআন সম্পর্কে একান্ত উৎসাহ, মাসয়ালার অনুসন্ধান এবং মুরীদদের সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের বাহ্যিক ও আর্থিক সংশোধনে পরিপূর্ণ ধ্যান, কিতাবের সহিত ভালবাসা ও তাহার যত্ন নেওয়া, পরিপূর্ণ অভাবহীন জীবন যাপন এবং যোগ্যতা প্রকাশ না করা, এরূপ আরো অসংখ্য সৎ গুণাবলী আছে যে তাহা লিখিয়া শেষ করা কলমের সাধ্য নাই। এজন্যই তাঁর দরিদ্র জীবনের শেষ দিনের কিছু ঘটনাবলী বর্ণনা করা হইল।

ক্রমাগত ব্যাধির আক্রমণ

আলা হজরতের শেষ জীবনে কতকগুলি শারিরীক অসুস্থতা দেখা দেয়। এই সকল রোগ ব্যাধির মাঝে একটি ছিল মনের দুর্বলতা। তার মুরিদগণের মাঝে অনেক কামেল, পন্ডিত ও বিজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন। তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুর রসূল ছিলেন ডাক্তারদের শিরোমনি। তিনি ছাড়াও অসংখ্য ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এই ধারা ক্রমাগত চলিতে লাগিল, কিন্তু পীর সাহেব রোগ হইতে মুক্তি পাইলেন না। কখনও কখনও তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইত আবার কখনও সামান্য পরিমাণ কমিয়া যাইত। কিন্তু পারিপূর্ণভাবে সুস্থ হইতেন না।

অন্ধ হাকীম আবদুল ওয়াহাব সাহেবের চিকিৎসা

হজরতে আ'লা ১৯৪০ সালে এপ্রিল মাসে তাঁহার কিছু সংখ্যক সহচরদের অনুরোধে চিকিৎসার জন্য দিল্লীতে গমন করেন। হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব, মাওলানা সৈয়দ জামিল উদ্দীন সাহেব ও অন্যান্য মুরিদও তাঁহার সফর সঙ্গী ছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি স্থির করিলেন যে অন্ধ হাকীম আবদুল ওয়াহাব সাহেবের দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। পীর সাহেব বাতেনী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাই তিনি মুরিদদেরকে বলিয়া দিলেন যে, তোমরা আমার জন্য কোন প্রকার চিন্তা করিওনা।

তিনি চিকিৎসালয়ে গমন করিলেন। তখনও হাকীম সাহেব সেখানে আসেন নাই। কিছুক্ষণ পর হাকীম সাহেব আসিলেন এবং রুগি দেখা শুরু করিয়া দিলেন। তাঁর ডানে ও বামে দুখানা তাক ও আলমিরাতে বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ রক্ষিত ছিল। ডাক্তার সাহেব রুগীদেরকে তাহাদের রুগের অবস্থা জিজ্ঞসা করিতেন এবং সর্বদা এই প্রশ্নটি করিতেন যে, আপনি কি করেন? এইভাবে রুগীদের অবস্থা জানার পর ব্যবস্থাপত্র দিতেন। কখনও কখনও তিনি ব্যবস্থা পত্রের উপর ঔষধের মূল্যটাও লিখিয়া দিতেন।

তারপর হজরতে আ'লা হাকীম সাহেবের কাছে গেলেন। হাকীম সাহেব তাঁহার অবস্থা দেখিয়া প্রশ্ন করলেন, আপনি কি করেন? উত্তরে পীর সাহেব তার মূল পরিচয় গোপন রাখিয়া একটা সাধারণ উত্তর দিয়া বলিলেনঃ আমি কৃষি কাজ করি। একথা শুনিয়া হাকীম সাহেব বলিলেনঃ হাল চাষ করার সময় কি আপনার শ্বাসনালী ফুলিয়া যায়। উত্তরে পীর সাহেব বলিলেন, আমি হাল চাষ করিনা, আমাদের হাল চাষের জন্য কর্মচারী আছে তাহারাই হাল চাষ করে। পরিশেষে হাকীম সাহেব তাঁর ববস্থাপত্র ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হজরতে আলা ঔষধ নিয়া মুরিদানদের সাথে প্রস্থান করিলেন।

হাকিম সাহেবের বিচক্ষণতা

হজরতে আলা ঔষধ নিয়া বাহির হইয়া গেলে হাকীম সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে তিনি একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহাদের পিছনে পিছনে একজন লোক পাঠাইলেন এবং বলিলেন, তাঁহারা কোথায় অবস্থান করে সেই ঠিকানা নিয়ে আসিবে। হজরতে আ'লা দিল্লীর জামে মসজিদের নিকট অবস্থান করিতেন। হাকীম সাহেব কর্তৃক প্রেরিত লোকটি হজরতের অবস্থান স্থল দেখিয়া আসিলেন।

ঔষধ ব্যবহার শেষে পীর সাহেব পুনরায় চিকিৎসালয়ে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হাকীম সাহেব বলিলেন, আমি অন্ধ ছিলাম, কিন্তু মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী

(রঃ) এর মুহব্বতে অনেক উপকৃত হইয়াছি। যার ফলশ্রুতিতে আমার অন্তরে জ্ঞানের আলোর উন্মেষ হইয়াছে। আপনি যখন প্রথমবার আমার চিকিৎসালয়ে আসিলেন তখনি বুঝিতে পারিলাম যে আপনার ভিতর ইসলামের নূর ও বরকত বিদ্যমান আছে। কিন্তু কারণটা আমার আন্দাজে আসিতেছিলনা। আপনি আপনার পরিচয় এমনভাবে গোপন করিয়াছেন যাহাতে আপনার খোদভীরুতা সামান্যতম প্রকাশ না পায়। আবার আপনি যখন আমার চিকিৎসালয় হইতে বিদায় নিলেন তখনি অনুধাবন করিতে পারিলাম যে আপনার সাথে সাথে নূর ও বরকত চলিয়া যাইতেছে। এ সময়ই আমি বুঝিতে পারিলাম যে আপনি একজন কামেল, মুত্তাকি ও পীর মাশায়েখ।

হাকীম সাহেবের মুরিদ হওয়ার তরিকা

আ'লায়ে হজরতে বিনয় ও নম্রতার সাথে বলিলেনঃ আমি মিয়ানওয়ালী জেলার অন্তর্গত কুন্দিয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রামে বসবাস করি। অতঃপর পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে কথাকর্তা হইল। তাঁহার সহিত কথোপকথনে হাকিম সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি পীর সাহেবের দোওয়া চাইলেন এবং পরিশেষে তাঁহার মুরিদ হইয়া গেলেন।

শেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা

আলা হজরত দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থান করার পর খানকা সিরাজিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। হাকীম সাহেব তাঁর প্রতি অসীম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করতঃ একটি চিঠিতে লিখিলেন, আপনার ছহবতে আমি অনেক উপকৃত হইয়াছি যাহা চল্লিশ বৎসরের সান্নিধ্যেও অর্জন করা সম্ভব হইত না।

অন্ধ হাকীম সাহেবের চিকিৎসায় পীর সাহেব সুস্থ হন নাই। অতঃপর তিনি বিভিন্ন ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা শুরু করিলেন। পরিশেষে তিনি কানপুরবাসী মুরীদদের অনুরোধে ২রা মার্চ ১৯৪১ সালে সেখানে গমন করেন। ডাঃ আবদুস সামাদ তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি হজরতে আ'লার আকিদা ও মুহাব্বতের দিক হইতে একই ছিলেন। ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসার ফলে তিনি কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর কলিকাতা গমনের আয়োজন করেন। সৈয়দ আব্দুস সালাম শাহ সাহেব তাঁর একজন মুরীদ ছিলেন। হজরত শাহ সাহেব হুজুরের কলিকাতা অবস্থানের যাবতীয় ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সেখানে গেলেন।

হজরত আ'লা কলিকাতা রওনা হওয়ার একদিন পূর্বে সেহরীর সময় হইতে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন। আহরিয়ায়ে মুতারেমা তাঁহার অজুর পানি আনিতে গেলেন।

তিনি বালিশের উপর মাথা রাখিয়া মুরাকাবায় বসিয়া গেলেন। এমতাবস্থায় কিছু সময় থাকার পর তিনি রফিকে আ'লার (আল্লাহর) সান্নিধ্য লাভ করিলেন।

হায় আফসো, হায় আফসোস! ১২ই সফর ১৩৬০ হিজরী মোতাবেক ১৯৪১ সনের ১৪ই মার্চ এলেম ও মারেফেতের উজ্জ্বল এই শিখা ৬৩ বৎসর বয়সে কানপুরে পরলোকগমন করিলেন। তিনি পূর্ণ আনুগত্য ও হেদায়েতের উপর জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিজ্ঞ জ্ঞান ও গবেষণার প্রজ্ঞাময় আলোকে বিশ্বকে আলোকিত করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

হজরত আ'লা সাহেবের বিশেষ সাগরেদ ও প্রতিনিধি মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব পূর্বেই কানপুর আগমন করেন। হুজুরের মৃত্যুর পর মাওলানা সাহেব জানাজা ও কাফনের ব্যবস্থা করিলেন এবং রেলগাড়ির একটি কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করিয়া পীর সাহেবের মরদেহ নিয়া আসিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ ছড়াইয়া পড়ায় বিভিন্ন ষ্টেশনে মুরীদদের ভীড় জমিয়া গেল এবং তাহারা গাড়ীতে উঠিয়া জানাজায় শরীক হইতে গেলেন।

১৩৬০ হিজরীর ১৪ই সফর তাঁহার লাশ মোবারক খানকায় নিয়া যাওয়া হয়। পীর সাহেবের জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য চতুর্দিক হইতে মানুষ দলে দলে আসিয়া সমবেত হয়। হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বিশাল জনসমুদ্র নিয়া নামাজে জানাজা সমাপ্ত করেন। তাঁর সুযোগ্য মুরিদগণ অশ্রুসজল চোখে, আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য কবরে শায়িত করান।

তিনি সরওয়ারে কায়েনাত হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সমতুল্য বয়সসীমা নিয়া এ ধরাতলে আগমন করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিকোন হইতে আল্লাহ তালা হজরত আ'লাকে রসুল (সাঃ) এর পুরোপুরি অনুসরণ করার তওফিক দান করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক শ্লোক গাথা

সারগোদা জেলাধীন বখরার অঞ্চলের অধিবাসী হামিক মাওলানা আঃ রসুল হজরতে আলার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য আরবী উর্দূ ও পাঞ্জাবী ভাষায় (শ্লোক গাথা) কবিতা রচনা করে।

এই কবিতাগুলির অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইলঃ

আরবী ভাষায় লিখিত শ্লোকসমূহের অনুবাদ

১। আমাদের ওস্তাদকুলের শিরমনি, যিনি পূর্বসূরীদের সৌন্দর্যের প্রতীক, যুগশ্রেষ্ঠ ওয়ালী, ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া চিরস্থায়ী বাসস্থানের দিকে যাত্রা করিয়াছেন।

বাঁ থেকে ডান দিকে– ১। হজরত সানী (রঃ) পবিত্র মাজার ২। আলা হজরত কুদ্দুস্ সিররুহুর পবিত্র মাজার ৩। হজরত বড়ি মায়ী ছাহেবার পবিত্র মাজার

দরবেশখানা

২। আবু সা'দ আহমদ, যিনি ছিলেন এলেমের সাগর, আল্লাহর নূরে নূরান্বিত, খোদাভীরুতার প্রতীক।

৩। শায়খে কামেল, হেদায়েতের পীর সাহেবের মৃত্যুতে আমাদের সামনে যেন পৃথিবীতে অন্ধকার নামিয়া আসিল।

পীর সাহেব আমাদের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া চিরস্থায়ী বেহেস্তে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শোককে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য মানুষ আর কি বর্ণনা করিতে পারে।

ফারসী ভাষায় লিখিত শ্লোকসমূহের অনুবাদ

আমাদের হজরতে কেবলা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে কর্মময় জীবনের অবসান করিয়া পরপারে যাত্রা করিলেন।

তিনি তাঁর পরহেজগারিতে ও কর্ম সাধনায় পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়া আল্লাহ তালার নৈকট্য অর্জন করিয়াছেন এ অধম বান্দা তাঁর শোককে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য কবিতা রচনা করিয়াছে।

হজরতে আলা সাহেব জান্নাতে তাঁর চিরস্থায়ী আবাসস্থল রচনা করিয়াছেন।

হজরতের মৃত্যুর শ্লোক গাথার ইতিকথা

লেখক স্বয়ং নিজেই পীর সাহেবের মাজারে গিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় কবিতা পাঠ করিতেছিলেনঃ

শত আফসোস্ জাগে মনে এমন একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুজাজ্জেদ, ওয়ালী কুলের শিরোমনীর জন্য যিনি ক্ষণস্থায়ী জগতের মায়া ত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন। আবু সায়াদ যাঁর হৃদয় সবসময় পরিপূর্ণ ছিল এলেম ও প্রজ্ঞায় ভরপুর, যিনি ছিলেন সর্বজনমান্য, মারেফতের উচ্চাসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি সুন্নতে নব্বীর চয়নকৃত পথে চলিয়াছেন, তাঁর ফয়েজ ও বরকতে জগতবাসী অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছে। তিনি ক্ষণস্থায়ী জগতের অধিবাসী ছিলেন, আল্লাহতালার মনোনীত পথে যাত্রা করার সময়ও তাঁর চোখে নূরের আলো বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তিনি সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া গিয়াছিলেন।

সফর মাসের (বার তারিখের) দ্বাদশ রজনীতে দুঃখ ভারাক্রান্ত আশেকীনদেরকে শোক সাগরে ভাসাইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁর প্রস্থানে ধরাতল যেন তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মানুষ, জীন, ফেরেস্তা, সকলই তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় ক্রন্দন

করিতে লাগিল। আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত সৃষ্টিকুল তাঁর বিচ্ছেদের শোকে ম্রিয়মান হইয়া গেল।

তাঁর ইন্তেকালের মসিবতের কথা স্মরণ করিয়া সমস্ত দেশের রাজন্যবর্গ, কর্মচারী, এবং সকল স্তরের লোকেরাই হায় হুতাশ করিতে লাগিল। এ যেন একজন রাজাবাদশাহর মৃত্যুতে প্রজাদের অভিভাবকহীন হইয়া যাওয়ার মত।

এ যেন একজন আলেমের মৃত্যুতে পৃথিবীর সকলই মূহ্যমান হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া যারা খোদাভীরু তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল। একজন আরেফের মৃত্যুতে সৃষ্টিজগৎ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কেননা, হেদায়েতের আলো বিদায় নিয়া চলিয়া গেল। শায়খুল মাশায়েখ, যিনি ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ ওয়ালী, তাঁর বিচ্ছেদে পৃথিবীতে অন্ধকার নামিয়া আসিল।

তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ আমাদের কাছে এক বিপদের আশংকা সৃষ্টি করে; কেননা, তাঁর শরীর মোবারক হইতে রুহের বিচ্ছেদ হওয়া আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য ছিল।

হজরতে আ'লার এত গুণাবলী ছিল যা আমার ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

কোন ব্যক্তি আজ আমাদের এ দুঃখ ও শোক সম্বন্ধে অবগত হইলে আমাদের এ সামান্য শোক প্রকাশকে তিনি ক্ষমার চোখে দেখিবেন। আমাদের পীর কামেল সাহেব মোহাম্মদী দ্বীনের চেরাগ বর্তিকা ছিলেন, যাঁর ইন্তেকালের স্মরণিকা স্বরূপ এই শ্লোক গাথা রচনা করা হইয়াছে।

উর্দু ভাষার শ্লোকসমূহের অনুবাদ

আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে অস্তমিত হইয়া গেল এমন একটি সূর্য, যিনি ছিলেন বিশ্ববরেণ্য ওয়ালীয়ে কামেল, শ্রেষ্ঠ খোদা ভীরু ও সর্বজনমান্য একজন সাধক পুরুষ। তিনি অনেক যোগ্য মুরিদ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কামালিয়াতের দরজায় পৌছাইয়াছিলেন। হজরতে আলার মৃত্যুতে তাঁর অনুসারীবৃন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ মানিয়া নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। হে মুরিদ, ভক্ত ও অনুসারিগণ, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর; কেননা, ধৈর্য্য ধারণ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। হজরতে কেবলার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসার মুহূর্তে তিনি বলিতেছিলেনঃ একজন অদৃশ্য সুসংবাদবাহী আমার সাথে যেন মিলিত হইতে চাহিতেছেন।

হজরতের বিদায়ে আমাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহা যথার্থই অপূরণীয়, কেননা, তিনি ছিলেন হেদায়েতকারী, সৎপথে আনয়নকারী, খোদাভীরুতার প্রতীক এবং সাথে সাথে ফয়েজ ও আমলে পরিপূর্ণ।

প্রতিনিধি নিযুক্তির সমস্যা

হজরত আ'লা (রঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রতিনিধি নির্ধারণের ব্যাপারে সকল সমস্যা সমাধান করিয়া গিয়াছিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে মৃত্যু তাঁর অতি সন্নিকটে, তখনই তিনি পরিবারবর্গ বা উত্তরসূরী ও মুরিদদের নিকট কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশবাণী রাখিয়া যান যাহাতে পরবর্তী সময়ে মুরিদ ও তাঁর উত্তর মুরীদদের মাঝে খলিফা নিযুক্তি ও অন্যান্য বিষয় নিয়া ঝগড়া বিবাদ না হইতে পারে। তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম, ছিদ্দিক ফাজেলে দেওবন্ধ হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ দেহলভীকে তিনি খলিফা বা প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে তিনি এক অসিয়াতনামা লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন যা উত্তরসূরী ও মুরিদদেরকে জানাইয়া দেওয়া হয়।

হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ কুদ্দুসুসহ সিররুহ জামেয়ুল মা'কুল ও মানকুল এবং ফাজেলে দারুল উলুম দেওবন্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন মুজাদ্দেদিয়া ও নকশে বন্দীয়া তরিকার। তিনি আলা হজরতের সকল তরীকার প্রতিনিধিও ছিলেন। শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। কখনও কখনও তাঁর ব্যবহারে শানে জালালের নির্দশাবলী লক্ষ্য করা যায়। এজন্য কিছু সংখ্যক মুরিদ আরজ করিলেন, আপনি মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে আপনার প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করুন। কেননা তিনিই এ গুরুত্বপুর্ণ পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। হজুরে কেবলার এ মনোয়ন আন্তরিক ছিল। তবে কোন কোন সময় অন্যদের মনে এরূপ সন্দেহ জাগিত যে, তাঁর মাঝে জালাল ফয়েজ থাকার কারণে এ গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালন করিতে তিনি সক্ষম হইবেন কিনা। আ'লায়ে হজরত উত্তরে বলিয়াছেনঃ এরূপ চিন্তা করিবে না। কারণ যখন তিনি এই গুরু দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিবেন, তখন তাঁর মাঝে এরূপ স্বভাব আপনা আপনিই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

একবার হজরত আ'লার মুহতারাম মাতা সাহেবা এই অভিমত পেশ করিলেন যে, খলিফা মাওলানা আব্দুল্লাহ (রহঃ) তাঁহাদের বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত নহেন। তাই অন্য কাহাকেও খলিফা নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

আ'লায়ে হজরত উত্তরে বলিলেনঃ আপনি কোন চিন্তা ভাবনা করিবেন না। কেননা আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে এ দায়িত্ব অর্পণ করিতে চাই, যিনি আপনার সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিকতর খেদমত করিবেন ইনশা আল্লাহ।

মোটকথা, আ'লায়ে হজরত সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া অসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করিলেন। তাঁর অসিয়তনামা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

হামদ ও সালাতের পর আ'লায়ে হজরত (রঃ) তাঁর পরিবারবর্গ, নিকট আত্মীয় ও মুরিদদের সামনে একটি হাদীস পেশ করিলেনঃ

নিজের ভবিষ্যত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে বিশেষ সতর্কতাসহ মৃত্যুর পূর্বেই অসিয়তনামা লিখিয়া যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

এমতাবস্থায় ফকির সা'দ আহমদ (রঃ) সাহেবের যখন জ্ঞান ও বোধশক্তি ফিরিয়া পাইলেন, তখন তিনি উত্তরসূরী, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, মুরিদান ও সহকর্মী ইত্যাদি সকলের নিকট এই সংবাদদটা পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য ওসিয়াতনামা লিপিবদ্ধ করিলেন, যেন ফকিরের মৃত্যুর পর কোন বিষয়ে তাহাদের উত্তরসূরী ও মুরিদদের মাঝে ঝগড়ার সূত্রপাত না ঘটে।

তিনি সকল সহকর্মীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, এ সকল অসিয়তনামা সঠিক, এবং এগুলো দৃঢ়চিত্তে বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং কোন বিষয়ে মতবিরোধ করিতে পারা যাইবে না।

যদি কোন মুসলমানের নিকট কোন বিষয়ে অসিয়ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে তার উচিত হইবে না, সে দুই রাত্রি অজ্ঞান অবস্থায় অতিবাহিত করিবে, আর তার কাছে অসিয়তনামা লিখিত অবস্থায় থাকিবে না।

যদি আমি কোন ভাল কাজ বা কোন সংশোধন করিতে চাই, আর যদি উক্ত কাজ করার জন্য কেহ সাহায্য সহযোগিতা না করে, তবে আমার দ্বারা (শুধু আল্লাহর উপর ভরসা বা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন ছাড়া) সে কাজ সমাধা করা সম্ভব নহে।

১। ফকির সাহেব (রহঃ) মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে খলিফা ও দায়িত্বশীল উত্তরসূরী নিয়োগ করিলেন।

ফকির সাহেব দৃঢ় বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতার জন্য তাঁহাকে নকসবন্দিয়ার সকল নিয়ম কানুন শিক্ষা দেন। আর ঐ খানককার নাম খানকায়ে মুজাদ্দেদিয়া সিরাজিয়া রাখেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি তরিকতের পথে চলেন। তাঁহার অবস্থানকালে অন্য কোন ব্যক্তি খানকা শরীফের দায়িত্বভার দাবী করিতে পারিবে না।

খানকা শরিফের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাসমূহ যেমন কুতুবখানা, তসবিহখানা, মেহমানখানা, গোসলখানা এবং বাকী পাঁচটি কামরা দরবেশ সাহেবের রাত্রি যাপনের জন্য নির্ধারিত। এসকল জায়গা মাওলানা সাহেবের কর্তৃত্বের অধীন। তিনি এসকল জিনিষ বা কামরা প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবেন। অন্য কোন ব্যক্তি ঐগুলি খরচ বা ব্যবহারের দাবী উথাপন করিতে পারিবে না।

২। ফকীর সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর কাফন, দাফন, গোসল ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজসমূহ আল্লাহর রসুল ও তাঁর সাহাবাদের নীতিমালা বা সুন্নতানুসারে করিতে হইবে।

সেখানে কোন প্রকার বেদআতীর প্রচলন করা যাইবে না। অধিক সংখ্যক লোক নিয়া মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেব জানাজার নামাজের ইমামতি করিবেন।

মৃত্যুর পর জগতের কোন নীতিমালা অহাম বা চেহলাম করা যাইবে না। এমনকি কোন প্রকার কান্নাকাটি বা মাতম, ও শ্লোক গাথা, গীতি গাওয়াও হারাম। এ সকল অনৈসলামী কাজের উপর সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্যথায় ফকির সাহেবের জিম্মাদারী বা প্রতিনিধি হিসেবে এসকল চালচলনের জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে। ফকির সাহেবের রওজা মোবারক এক সপ্তাহ পর্যন্ত কালেমায়ে তাইয়্যেবা, দরুদশরীফ, এস্তেগফার ও কোরআন খতম দ্বারা সওয়াব রেসওয়ায়ী করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কখনও কখনও সৎকাজ ও দানখয়রাতের দ্বারাও সওয়াব রেসওয়ায়ী করিবে, কিন্তু এতে কোন প্রকার গৌরব বা অহংকার থাকিতে পারিবে না।

(৩) খানকা শরীফের বিভিন্ন আয়ের উৎস লংগর শরীফের পাথেয় হিসাবে থাকিবে। আর লংগরখানার সকল পাথেয় সম্মানিত মাতার দায়িত্বে থাকিবে। তিনি উহা হইতে তাঁহার ইচ্ছানুসারে খরচ করিতে পারিবেন।

(৪) মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব (রহঃ) মসজিদের ইমামতির দায়িত্বভার পালন করিবেন। আর তিনি খানকা শরীফের মুতাওয়াল্লী হিসেবে কাজ পরিচালনা করিবেন। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হেফাজতের দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পণ করা হইল।

(৫) আল্লাহর ফজলে তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় খানকা শরীফের কুতুবখানা তৎকালীন পাঞ্জাবে প্রসিদ্ধ দ্বীনে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। উহার শান-শওকত স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে খানকা শরীফের (কুতুবখানার) সকল আলমারী ও কামরা ওয়াকফ্ করিয়া দেওয়া হইল।

এই বিশাল কুতুবখানার দায়িত্বভারও মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের উপর অর্পিত হইল। এখন হইতে এই কুতুবখানার অন্যান্য আসবাবপত্র ও কিতাবাদিতে ওয়ারিশ মালিকত্ব ও বন্টন ব্যবস্থা জারী থাকিবে না।

(৬) মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব (রহঃ) খানকা শরীফের বিভিন্ন কামরার যে কোন একটিতে অবস্থান করিতে পারিবেন। তিনি যদি পরিবারবর্গ সহ খানকা শরীফে থাকিতে চান, তবে এই খানকার বিস্তৃত স্থানের যেকোন স্থানে তিনি লঙ্গরখানার খরচে ভবন নির্মাণ করিতে পারিবেন।

(৭) মাওলানা সাহেবের অন্যান্য নিজস্ব দায়িত্ব ছাড়াও মাওলানা সাঈদ মরহুম (রহঃ) এর দুইজন সন্তান মোহাঃ আরেফ ও জাহেদ এর দ্বীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি নজর রাখা আর একটি দায়িত্ব মনে করিতে হইবে।

প্রথমতঃ তাহাদের বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। নতুবা যদি তাহাদের দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অন্য কোন পথ অবলম্বন করা হয়, তবে তৎপ্রতি মাওলানা সাহেবের সম্মতি থাকার প্রয়োজন হইবে। প্রিয় সন্তানদেরও উচিত হইবে যে, তাহাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মাওলানা সাহেবের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(৮) খানকা শরীফে অবস্থিত মাদ্রাসায়ে কোরান শিক্ষা যার খরচাদি মুরীদ সাহেবদের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়, ইহারও পরিচালনার দায়িত্ব মাওলানা সাহেবের উপর অর্পিত হইল। এই মাদ্রাসার উন্নতি, প্রসার ও প্রচারের প্রচেষ্টা সকল মুরীদকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) সমস্ত তরীকতী ভাইদের অসিয়ত এই যে, এই কোরানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ব্রত থাকা প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব হিসেবে মনে করিবেন। রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণের ক্ষেত্রে সামান্যতম পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে না, আর বেদআত হইতে সর্বদা দূরে সরিয়া থাকিবে।

(১০) পরিশেষে মাওলানা সাহেবের জন্য কিছু নসিহতঃ

প্রথমতঃ তাঁহার দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি এই তরিকার প্রচার ও প্রসারে পূর্ণ মাত্রায় মনোযোগ ও লক্ষ্য রাখিতে সচেষ্ট হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ মুজাদ্দেদিয়া ও নকশেবন্দীয়া তরিকার আদব ও শরায়েতসমূহ পুরোপুরি পালন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ সুন্নতের অনুসরণ ও বেদআত হইতে দূরে থাকাকে ফরজ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ পার্থিব জগতের রাজা বাদশাহদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ আপনার মুরীদ ও তরিকতী ভাইদের সহিত সৎ ব্যবহার ও ভাতৃত্বসুলভ আচরণ করিতে হইবে। উচ্চাকাংখা হইতে সর্বদা বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ আপনার পীর সাহেবের সন্তানদের দেখাশুনা ও তাদেরকে সৎভাবে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে।

শেষ—
অসিয়তকারী ফকীর
আবু সা'দ আহমদ

—— o ——

আ'লা হজরতের উত্তরসূরী ও খলিফাবৃন্দ

উত্তরসূরী ঃ

(ক) দুইজন সম্মানিত স্ত্রীঃ একজন মুহতারেমাহ বড় মাতা, যিনি মাওলানা মোহাম্মদ সাদেক ও মাওলানা মোহাম্মদ সাঈদ (রহঃ) এর মাতা; আর দ্বিতীয়জন ছোট মা।

(খ) একজন ছেলে, মাওলানা মোহাম্মদ মাসুম সাহেব ও তাঁহার সন্তান-সন্ততি।

(গ) চারজন সাহেবজাদী (মেয়ে)

(ঘ) দুইজন নাতি ঃ সাহেবজাদা মোঃ আরেফ ও মোঃ জাহেদ, মাওলানা মোঃ সাইদ মরহুম (রঃ) এর সন্তান।

(ঙ) একজন নাতিনী, (মোহাঃ আরেফ সাহেবের সমবয়সী)

ইহাদের ছাড়া আলা হজরত আরও অনেক মুরীদ ও খলিফা (রাঃ) রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ তেত্রিশ খলিফার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-

(১) হজরতে আ'লা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব লুদহিয়ানবী (রহঃ) ফাজেল দেওবন্দী ছিলেন। তিনি হজরতে আ'লার ইন্তেকালের পর তাঁহার অসিয়ত মোতাবেক ১৪ই সফর ১৩৬০ হিজরীতে খেলাফতে মুজাদ্দেদিয়া নকশ্ বন্দিয়া তারিকার পরিচালক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

(তুহফায়ে সাদিয়া শেষের দিকে হজরত আব্দুল্লাহ সাহেব (রহঃ) এর জীবনী বর্ণনা করা হইবে।)

(২) হজরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল্লাহ শাহ সাহেব (রঃ) আহমদপুরের অধিবাসী ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি খাজা সিরাজ উদ্দীন (রহঃ) এর কাছে বাইআত গ্রহণ করেন। তারপর খাজা সাহেব তাঁহাকে মুজাদ্দেদিয়া ও নকশ বন্দীয়া তরিকার প্রশিক্ষা গ্রহণের জন্য আ'লা হজরত (রহঃ) এর খেদমতে প্রেরণ করেন। তিনি খুবই প্রজ্ঞাবান ও সৎস্বভাবের ছিলেন। খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য তিনিই অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরতে আ'লার জীবদ্দশাতেই পরলোকগমন করেন। আ'লা হজরত তাঁর ইন্তেকালে খুবই চিন্তিত হইয়া গেলেন।

কেননা, তিনি ভবিয়াছিলেন যে তিনি শাহ সাহেব (রহঃ) কে খেলাফতের দায়িত্বভার প্রদান করিবেন।

আ'লা হজরত যতদিন মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে মুজাদ্দেদিয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকার উপর পূরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত না দেখিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার মন হইতে চিন্তা দূরীভূত হয় নাই। অর্থাৎ, যতদিন মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মত যোগ্যতা অর্জন করিতে না পরিয়াছিলেন, ততদিনই হজরতে আ'লা সাহেব খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে খুবই চিন্তা যুক্ত ছিলেন।

(৩) হজরত মাওলানা কাজী ছদরুদ্দীন সাহেব মদ্দেজিল্লুহ তা'লা ঃ তিনি আ'লা হজরতের কাছে নকশেবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরিকার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি পীর সাহেব কর্তৃক খেলাফত প্রাপ্ত হওয়ার পর জন্মভূমি হরিপুরে তশরিফ আনেন। হরিপুরের সন্নিকটে দরবেশ নামক স্থানে তাঁহার পিতা বসবাস করেন।

কিছু দিন কাজী সাহেব (রহঃ) হরিপুর রেল ষ্টেশনের কাছে খানকায়ে নকশবন্দীয়া স্থাপন করেন। যেখানে বিভিন্ন প্রকারের ভবন ছাড়াও একটি মনোরম মসজিদ ও উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি কাজী শামসুদ্দিন সাহেবের মত বুযুর্গ ছিলেন। (তাঁর নিকট ছাত্রগণ মারেফতের শিক্ষা গ্রহণ করিতেন।)

(৪) হজরত হাজী মিয়া জান মোহাম্মদ (রহঃ) ঃ তিনি মুলতান জিলার অন্তর্গত বাগের সারগানা গ্রামের অধীবাসী ছিলেন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আ'লায়ে হজরতের দরবার শরীফে উপস্থিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং একজন খাটি মুরিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরিপূর্ণ তাওয়াজ্জুহ ও সাহসিকতার সাথে পীর সাহেবের সুহবতে তিনি অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেন। আ'লা হজরত সাহেব তাঁহার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখিতেন। কামালিয়তের দরজায় পৌছার পর তিনি তরিকা নকশবন্দীয়ার খেলাফত লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে মুলতান ও বাগের এলাকাতে ফয়েজ রেসায়ির সিলসিলা জারী রাখেন। হজরতে আ'লা (রহঃ) বাগের জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকবার সফর করিয়া সেস্থান ফয়েজ ও বরকত দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। পীর সাহেব বাগের নামক অঞ্চলটিকে তাঁহার আবাসস্থল বলিয়া দাবী করিতেন। হজরত মিয়া জান সাহেবের হালকায়ে

এরাদাত মুলতান, শাহীওয়াল ও লায়েলপুরেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আ'লা হজরতের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার তরিকা ও শিক্ষার পদ্ধতি জারী রাখিয়াছিলেন। তিনি হজরত আ'লার খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত ও প্রধান খলিফা হজরতে মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর কাছে নূতনভাবে বায়আত গ্রহণ করিয়া নকশবন্দীয়া তরিকায় পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন। আর তিনি হজরত সানীর (রহঃ) চারটি তরিকারই খেলাফত লাভ করিয়াছিলেন। হজরত সানী (রঃ) এর সহিত তাঁহার সুগভীর ভালবাসা ছিল। হজরতে সানীর মৃত্যুতে তাঁহার প্রতিনিধির হালকায়ে যিকিরে শরীক হইতেন। তখন অন্যান্য মুরিদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আপনি কিভাবে তাঁহার নিকট নূতন করিয়া বায়আত গ্রহণ করিলেন? মিয়া সাহেব উত্তর দেনঃ আমি আমার মনের স্বাধীনতাকে পরিত্যাগ করার জন্য নূতন খলিফার হাতে নূতন করিয়া বায়আত গ্রহণ করিয়াছি। কেননা, তিনি হজরতে কেবলা মাওলানা আবুল খলিল খান মোহাম্মদ সাহেবের সামনে মুরীদদের ন্যায় আদব ও এহতেরামের সাথে আসিতেন এবং হালকায়ে যিকর ও মোরকাবাতেও অংশ গ্রহণ করিতেন।

হজরত মিয়া জান মোহাম্মদ সাহেবের দুই স্ত্রী ও এক ছেলে ছিলেন। সাহেবজাদা খুবই ভদ্র ও পূত পবিত্র চরিত্রের অধীকারী ছিলেন। তিনি পিতার অনুসরণে খানকা শরীফে অদ্বিতীয় ছিলেন।

(৫) মাওলানা সৈয়দ আব্দুস সালাম আহমদ শাহ (রহঃ) ঃ– তিনি ১৩২৭ হিজরীর সাবান মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সম্মানিত পিতা সৈয়দ বরকত আলী শাহ (রহঃ) হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান (রহঃ) ও হজরত খাজা সিরাজ উদ্দীন (রহঃ) এর নিকট হইতে সকল তরিকতের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তরিকতের প্রাথমিক শিক্ষার সময় কালে ১৩৪৫ হিজরীতে তাঁহার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা ও তরিকতের বিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জনের জন্য আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করেন। পরিশেষে আ'লা হজরতের খেদমতে খানকায়ে সিরাজিয়ায় উপস্থিত হন। সেখানে বায়াত গ্রহণ করিয়া তিনি মুজাদ্দেদী তরিকার শিক্ষা অর্জনে মশগুল হইয়া যান। কিছুদিন দিল্লীতে অবস্থান করার পর তিনি মাদ্রাসায়ে আব্দুর রব–এ গমণ করেন। সেখানে তিনি এলেম শিক্ষা করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। তারপর খানকায় সিরাজিয়াতে আসিয়া কিছু দিন অবস্থান করেন। আ'লা হজরতের নিকট

হইতে মুজাদ্দেদী তরিকার খেলাফত পাওয়ার পর ১৯৩২ সন হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতাতেই তরিকতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এরপর তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি ঢাকায় কলুটোলাতে কিছু দিন অবস্থানের পর নারিন্দা অঞ্চলে খানকায়ে মুজাদ্দেদিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা, যশোর ও ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তাঁহার অনেক মুরীদ আছে।

তিনি বলিতেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি আ'লা হজরতের রুহের মাগফিরাতের জন্য ১১ বার সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করিয়া এসালে সওয়াব করে তবে জীবদ্দশায় তাহাকে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবেনা। ফকীর মোহাম্মদ ইউনূছ সাহেব (রহঃ) এর লিখিত সুবুলুস সালাম গ্রন্থে তাঁহার বিস্তারিত জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে সতের বৎসর পর্যন্ত ফায়েজ ও বরকত দ্বারা তরিকতের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর ১১ই সওয়াল ১৩৮৬ হিঃ মোতাবেক ১৯৬৭ সনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

(৬) হজরত মাওলানা মুফতী আবদুল গণি সাহেব (রহঃ) তিনি মালি কুটলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি আ'লা হজরতের উচ্চ পর্যায়ের খলিফাদের অন্যতম ছিলেন। প্রশাসনিক বিদ্যা অর্জন করার পরও তিনি হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে বিশেষ পান্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। মাওলানা খলিল আহমদ সাহেব ছিলেন মুফতি মালির কুটলার প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। প্রথমেই তিনি খেটিকা মসজিদের খতিব ও ইমাম নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি মালির কুটলা আনাত কলেজের অধ্যাপক (আরবী বিষয়ের) নিযুক্ত হন।

মুখতি খলিল সাহেবের মৃত্যুর পর ফত্ওয়া বিভাগের দায়িত্বভার তাঁহার উপরই অর্পিত হয়। এ সময়েই তিনি একজন চিশতীয়া তরিকার পীর সাহেবের নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। কিছু দিন চিশতীয়া তরিকায় শিক্ষা গ্রহণ করার পর খেলাফতের অনুমতি লাভ করেন। সেই সময়েই শায়খ ইন্তেকাল করেন।

জনাব জহির উদ্দিন সাহেব মুফতী সাহেবের নিকটই অবস্থান নিয়াছিলেন। মুফতী সাহেব জহরউদ্দীন সাহেবরে দরবারে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহার হালকায়ে যেকেরে সমিল হইয়া প্রথমেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গেলেন।

তারপর তিনি খানকায়ে সিরাজিয়াতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে আ'লায়ে হজরতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই তরিকতের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেন। তরিকতের খেলাফত লাভ করার পর তিনি মালির কুটলাতে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে হাদীসের দরস দিতে শুরু করেন।

নওয়াব আহমদ আলী খান সাহেবের একজন চাচাত ভাই মরজিয়া হইয়া যান। নওয়াব সাহেব তাঁহার মেয়েকে মরজিয়া ভাইয়ের ছেলের সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। তিনি হজরত মাওলানা মুফতী সাহেবের নিকট এ বিষয়ে ফতওয়া তালাশ করিলেন। মুফতী সাহেব বলিলেন– মরজিয়া কাফের বা মুরতাদ তাহার সহিত কোন মুসলমানের মেয়ের বিবাহ প্রদান জায়েজ হইবে না।

আলা হজরতের শিক্ষার ফয়েজ এটাই ছিল যে, তার কোন খাদেম তাগুতী শক্তির সামনে হাতিয়ার ছাড়িতে পারিবে না।

পটিয়ালা অঞ্চলের এক প্রতিনিধি দল যেখানে গেলেন এবং হজরত সাহেবকে সেখানে আগমনের আহবান জানাইলেন। তিনি সেখানে গিয়া হাদীস শরীফের দরস দেওয়ার জন্য একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা আর মসজিদেও আরবী শিক্ষার একটি মাদ্রাসা চালু করেন। খুৎবা ও ইমামতির বিভিন্ন দায়িত্বাবলীর পুরাপুরি আঞ্জাম দিয়া তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসার ব্যাপক প্রসার ও প্রচার করেন। তিনি ১৯৪১ সালে গ্রীষ্মকালে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পটিয়ালা হইতে মালির কুটলায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন অতিবাহিত করার পর সেখানে তিনি পরলোক গমণ করেন।

(৭) মাওলান মুফতী মোহম্মদ শফী (রহঃ) ঃ মুফতী শফী সাহেব আ'লা হজরতের জলীল কদর সাহাবা ছিলেন। তিনি ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। আ'লায়ে হজরতের নিকট হইতে জাহেরী এলেমে নৈপুণ্য অর্জন করার পরও তিনি তরিকতের শিক্ষায় পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য আবার পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন।

মুফতী সাহেবের একটি আশ্চর্য ঘটনা লোক সমাজে প্রকাশ পাইয়াছিল। সে ঘটনাটি এই যে ঃ–

মুফতী সাহেবের স্মরণশক্তি কম ছিল। একবার আ'লায়ে হজরত (রহঃ) এর গেঞ্জি পরিস্কার করা হইয়াছিল। মুফতী সাহেব একনিষ্ঠ ভালবাসা ও বিশ্বাসের কারণে ঐ ময়লাযুক্ত পানি পান করিয়া ফেলেন। এই আমলের বরকতে তাঁহার

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। এরপর হজরত আ'লার উপর তাঁহার বিশ্বাস ও ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আলা হজরতের ছেলে মোহাম্মদ সাঈদ মরহুম (রহঃ) তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে মোহাম্মদ সাঈদ সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ আরেফ তাঁহার নিকট হাদীস শরিফের দরস নেন। তিনি তরিকতের খেলাফত প্রাপ্তির পর শিক্ষা, ওয়াজ, নসিহত, ফত্ওয়া এবং তরিকতে প্রসার লাভের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বহু সংখ্যক ছাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাকিস্তানে সকল এলাকাতেই তাঁহার শিষ্য ছিল।

(৮) হাকীম মাওলানা আবদুল রসুল সাহেব (রহঃ) ঃ হাকীম মাওলানা আবদুল রসুল সারগোদা জেলার অন্তর্গত বাখেরবার গ্রামের অধিবাসী হাকীম কমরুদ্দীন সাহেবের সুযোগ্য সন্তান ছিলেন। তিনি হজরত আ'লার সুযোগ্য মুরীদদের অন্যতম ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবী, আরবী, উর্দূ এবং ফারসী এই চার ভাষার কবি ছিলেন। পরহেজগার, মুত্তাকি ও ফজিলতের দিক হইতে তিনি ছিলেন অতি উত্তম। ডাক্তারী বিদ্যাতেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। অগণিত ডাক্তার তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মোধ্যে হাকীম আব্দুল মজিদ (রঃ) ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হাকিমী বা ডাক্তারী বিষয়ে কয়েকটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি মাওলানা গোলাম মুরতাজা (রহঃ) এর বায়আত গ্রহণ করেন। মাওলানা আব্দুল রসুল সাহেব তাঁহার জীবনীর উপর আনৃওয়ার তাজবিয়া নামক একটি পুস্তক রচনা করেন।

তিনি আ'লা হজরতের কাছে বায়আত গ্রহণ করেন এবং পরে খেলাফত লাভ করেন। হজরত আ'লার মৃত্যুর উপর তিনি ইংরেজী কবিতা এবং বিভিন্ন ভাষায় মৃত্যুর শ্লোক গাথা ও কাহিনী রচনা করেন। হজরত খাজা সিরাজ উদ্দীনের ইন্তেকালের উপরও তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন। ফারসী ভাষাতেও তিনি আ'লা হজরতের জীবনী রচনা করেন। আ'লা হজরতের ছেলে মোহাম্মদ সাইদ (রহঃ) এর সাথে তাঁহার কন্যা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাজার মোবারক বাখরার নামক স্থানের মসজিদ প্রাঙ্গনে বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত।

(৯) হজরত মাওলানা সৈয়দ মুগিস উদ্দীন শাহ (রহঃ) সাহেব ফাজেলে দেওবন্দ ঃ হজরত মাওলানা সৈয়দ মুগিস উদ্দীন সাহেব (রহঃ) সাবাখবুর জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন আ'লা হজরতের মুমতাজ খলিফা। মাদ্রাসায়ে দেওবন্দ হইতে দাওরায় হাদীস পাশ করিয়া তিনি ফেকাহ শাস্ত্র

মাওলানা এ'জাজ আলী (রহঃ) এর নিকট, তফসির শাস্ত্র মাওলানা মুফতী আজিজুর রহমান নকশবন্দীয়ার নিকট, দাওরায়ে হাদীস মাওলানা সৈয়দ আনওয়ার শাহ কাশমিরী (রহঃ), হজরত মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রহঃ) এবং হজরত মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব (রহঃ) এর নিকট, দর্শন ও মানতেক ও অন্যান্য বিষয় হজরত মাওলানা রসূল খান এবং মাওলানা ইব্রাহিম বিলয়াবী (রহঃ) এর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি হজরতে আলার কাছে বায়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্তির পর হজরতে আ'লার খেদমতে হাজির হইয়া সমস্ত তরকতি বিদ্যা অর্জন করেন এবং তরিকতের খেলাফত লাভ করেন। অতঃপর তিনি ইরাণ যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর মদীনাতে হিজরত করেন। অতঃপর তিনি হজ্ব সমাপন করিয়া পুনরায় মদীনাতে ফিরিয়া যান এবং সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সীমানা হইতে বাহির হইতেন না। তিনি প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের জন্য "আল মুতইমুল হিনদ" নামক এক হোটেল খুলিয়াছিলেন। তিনি রাত্রি যাপন করিতেন মসজিদে আলী (রাঃ) এর নিকট এবং শেষ জীবন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

তিনি অতি সাধারণ, অল্পে তুষ্ট, নরম হৃদয়ের অধিকারী মুত্তকি, পরহেজগার বুজর্গ লোক ছিলেন। মদীনা শরিফ জিয়ারতকারী খানকায়ে সিরাজিয়ার কোন লোকের সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি তাঁহার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন।

হজরত সানী (রহঃ) বা অন্য কোন হজরত কখনও হজ্জ ব্রত পালন করার জন্য মদীনায় গেলে তিনি সর্বদা তাঁহাদের খেদমতেই উপস্থিত থাকিতেন। তিনি আছরের সময় হইতে মাগরিবের নামাজের সময় পর্যন্ত মসজিদে নববীতে কোরআন তেলাওয়াত করিতেন। এভাবেই তিনি সেখানে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। পরিশেষে তিনি ১৩৯১ হিজরীর ২৯ শাবান তারিখ এ ধরাপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে চলিয়া যান। তাঁহাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

(১০) মাওলানা মোহাম্মদ জামান সাহেব (রহঃ) ঃ তিনি আ'লা হজরতের জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যায় পারদর্শী একজন খলিফা ছিলেন। হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্র আ'লা হজরতের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হরিপুর জিলার অন্তর্গত হাজাবা নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আলায়ে হজরতের নিকট

তরিকায়ে মুজাদ্দেদীয়া ও নকশবন্দীয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেন। খেলাফতের অনুমতি পাওয়ার পর তিনি সম্ভবতঃ রেখর জিলার অন্তর্গত মায়ানুওয়ালী নামক স্থানে অবস্থান করিতেন। তরিকতের খেলাফত লাভ করার পর তিনি মাত্র দেড় বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তরিকার প্রসার ও প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। খানপুরের অধিবাসী মোহাম্মদ সুফী সাহেব এবং মৌলবী খোদা বখশ কালন প্রথমতঃ তাঁহার নিকটই বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি রমজান মাস আ'লা হজরতের খদমতে অতিবাহিত করিতেন। একবার অত্যন্ত শীত মৌসুমে রমজান মাসের আগমন হয়। সেই রমজান মাসেই অসুস্থ হইয়া তিনি পরলোক গমণ করেন।। খানকাহ শরীফেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

(১১) হজরত শায়খ মোহাম্মদ মাকরানী (রহঃ)ঃ মাকরান অঞ্চল হইতে ফয়েজ হাসিল করার জন্য হজরত শায়খ মোহাম্মদ মাকরানী (রহঃ) আ'লা হজরতের খেদমতে হাজির হন। তিনি খুবই হাসিখুশি ও সুভাষী ছিলেন। খানকা শরীফে অবস্থানকালে তিনি সর্বদা আজান দিতেন। তিনি হজরতে আ'লা (রহঃ) এর নিকট হইতে তরিকায়ে নকশবন্দীয়ার খেলাফত লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত সানী (রহঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তিনি মুজাদ্দেদী তরিকার সকল মুকাম অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি চার তরিকায় পারদর্শী হইয়া জন্মস্থানে প্রত্যবর্তন করেন। সেখান হইতে প্রথমে ইরাণ এবং ইরাণ হইতে কুয়েত যান। তিনি কুয়েতে সরকারীভাবে সমজিদে ফাহি হিল এর খতীব নিযুক্ত হন। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

(১২) হজরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) ঃ হজরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) কানপুরে অবস্থিত খানকায়ে হোসায়নিয়াহ এর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আ'লায়ে হজরতের নিকট জাহেরী ও বাতিনী তরিকায় শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আ'লা হজরতের খেলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত সানী (রহঃ) এর খানকায় হালকায়ে জেকেরে সামিল হইতেন। তিনি সম্মানের উচ্চাসনে পৌছিয়াছিলেন। তিনি মানুষকে তরিকতের শিক্ষা দানে মশগুল হইয়া থাকিতেন।

(১৩) মাওলানা নাজির আহমদ আরশী দেহলবী ঃ তিনি হজরতে আলার বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। রেসালতে তুহফাতুস সাদিয়া আ'লা হজরতে জীবনেরই নির্যাস। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের কবি ছিলেন।

(১৪) হজরত সৈয়দ মুখতার আহমদ শাহ সাহেব (রঃ) ঃ তিনি আলীগড় জিলার অন্তর্গত আতরুলী অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হজরত আলার নিকট মুরীদ হইয়া খেলফত লাভ করিয়া শীর্ষ স্থানীয় পর্যায়ে পৌছাইয়াছিলেন। তৎকালীন সময়ের দরবেশদের মাঝে দৃঢ়চিত্তসম্পন্ন মুত্তাকী ও পরহেজগার হিসাবে তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি দুই এক জোড়া কাপড় নিয়াই অনেক দিন পর্যন্ত খানকা শরীফে অবস্থান করিতেন। তিনি এই তরিকায় নূর ও বরকত হাসেল করিয়া যুবক বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

(১৫) হজরত মাওলানা জামিল উদ্দীন মিরাজী ও বাহওয়ালপুরীঃ তিনি ফাজেলে দেওবন্দী ছিলেন। তিনি মালির কুটলার প্রধান মন্ত্রী মীর মোহাম্মদ ইয়ামিন সাহেবের পুত্র। তিনি খেলাফত প্রাপ্তির পর বাহওয়ালপুরে আসেন। সেখানে প্রথমে তিনি একটি সেকেন্ডারী স্কুলের আরবী শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া পরে মাদ্রাসায়ে আরাবীয়ার ইন্সপেক্টর পদে নিয়োজিত হন। তখনও তিনি আরবী শিক্ষকের কাজ চালাইতেন। আল্লাহর প্রতি ভরসা, একনিষ্ঠ চেষ্টা ও চেতনায় আ'লা হজরতের নিকট তিনি বায়আত করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই একজন একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাহার নিকট আত্মীয় ও পরিচিত বন্ধু বান্ধবদেরকে তিনি আ'লা হজরতের তরিকার মুরিদ করান। তারপর তিনি পীর সাহেবের নিকট হইতে খেলাফত প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার খেলাফত বেশী দিন স্থায়ী থাকে নাই। তিনি আলা হজরতের ফজিলত ও কামালিয়ত বর্ণনায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি নকশবন্দীয়া তরিকার ও দেওবন্দের অবস্থা ও উহার ইতিহাসের হাফেজ ছিলেন। পরিশেষে তিনি চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক পেনশন লাভ করেন। তিনি মাওলনা রুমী রচিত বিশ খন্ডে সমাপ্ত মসনবী শরীফের শরাহ মিফতাহুল উলুম রচনা করেন।

(১৬) হজরত মাওলানা পীর সৈয়দ লালা শাহ সাহেব ঃ তিনি ঝং জিলার অধিবাসী ছিলেন। আ'লা হজরতে নিকট হইতে খেলাফত লাভের পর তিনি তরিকতের সিলসিলা জারী রাখিয়াছিলেন। তিনি জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

(১৭) মাওলানা আহমদ দ্বীন সাহেব কিবলা ঃ তিনি সারগোদা জিলার অধিবাসী একজন ফকিহ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ আলেম হজরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রঃ) এর চাচা ছিলেন। তিনি আ'লা হজরতের একজন প্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন।

(১৮) হাকীম হাফেজ চুনপীর সাহেব (রঃ)ঃ তিনি সারগোদা জিলার খুশাব অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ হাকীম ও দরবেশ এবং সদালাপী ছিলেন। হজরত আ'লা (রহঃ) এর নিকট হইতে খেলাফত লাভ করিয়া তরিকতের উচ্চ চূড়ার অধিকারী ছিলেন। হজরত সানীর তৎকালীন অন্যান্য পীর সাহেবদের সাথেও তাঁহার রুহানী সম্পর্ক ছিল।

(১৯) হজরত মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব ঃ তিনি আলা হজরতের একজন খাদেম ছিলেন। তিনি আঠার বৎসর পর্যন্ত পীর সাহেবের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তারিকতের পরিপূর্ণতা অর্জনপূর্বক আ'লা হজরতের বায়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি একবার যৌবনকালে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়য়া পড়িয়াছিলেন। সকল ডাক্তার ও হাকীম তাঁহার চিকিৎসায় অপরাগতার কথা জানাইলেন। তখন মাওলানা সাহেবের মাতা খুবই চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে নিয়া হজরতের দরবারে উপস্থিত হন এবং ছেলের জন্য দোওয়ার আবেদন জানান। হজরত আ'লা (রহঃ) তাঁহার মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আবদুস সাত্তার মরিবেনা। আমার কাছে সে আমানত স্বরূপ। অতপর তিনি তাঁহাকে অলীর মর্যাদা অতিক্রম করাইয়া তরিকতের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেন। মাওলানা সাহেবের মধ্যে যওক, শওক, সত্যবাদিতা, খেদমতের প্রবণতা সব কিছুরই পরিপূর্ণতা ছিল।

একবার খুল্লা শরীফে অবস্থানের সময় এশার নামজের পর হজরত আ'লা সাহেব মাওলানা সাহেবকে বলিলেনঃ আবদুস সাত্তার, যাহারা মিয়ানাওয়ালীতে যাও ... এইটুকু বলার পর তিনি চুপ হইয়া গেলেন, তাঁহার কথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে কালকেই বিশেষ কাজে তোমাকে মিয়ানওয়ালীতে যাইতে হইবে। মাওলানা সাহেব খুল্লা হইতে মিয়ানওয়ালী গেলেন। সেখানে এক মসজিদে নফল নামায আদায় করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। সকালে হজরতে আলার নিকট বলিলেন, আজই রাত্রে সেখানে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। হজরত মুখমন্ডল রুমাল দ্বারা আবৃত করিয়া হাসিতে লাগলেন। তারপর বলিলেনঃ হে বেভুল ফকীর, জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, সেখানে গিয়া তুমি কি করিবে?

তরিকতের খেলাফত পাওয়ার পর মাওলানা সাহেব মিয়ানওয়ালী জেলার অন্তর্গত কাছিওয়ালা অঞ্চলে যান এবং সেখান বসবাস করিতে শুরু করেন। কয়েক বৎসর অবস্থান করার পর হজ্জ সমাধা করার জন্য তিনি মক্কা শরীফ যান। সেখানে তিনি কাবা শরীফ তোওয়াফ ও হযরে আসওয়াদ চুম্বন

করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার সুন্দর রুমালটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সেই সময় একজন বৃদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তির আগমন ঘটিল। তিনি হযরে আসওয়াদ চুম্বনে মাওলানা সাহেবের সাহায্য কামনা করিলেন। বলিলেনঃ আমি ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ। অতঃপর তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সেই রাতে সইয়্যেদানা হজরত ইব্রাহিম (আঃ) মাওলানা সাহেবের সাথে স্বপ্নে দেখা করিয়া বলিলেনঃ আপনার সেই রুমাল যা তওয়াফ করার সময় পড়িয়া গিয়াছিল, উহা হাতীম নামক স্থানে রাখা হইয়াছে। অতঃপর মাওলানা সাহেব এক মুরিদকে পাঠাইয়া রুমালটি আনাইয়াছিলেন।

আল্লাহ তা'লা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করিয়াছিলেন। আর তাঁহার ফয়েজ ও বরকতে মানুষ অনেক উপকৃত হইয়াছিল। আমীন।

(২০) মাওলানা সিরাজ উদ্দীন সাহেব রান্‌জাহ (রহঃ) ঃ তিনি সারগোদা জিলার অন্তর্গত পাওয়াহ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাহেরী ও বাতেনী এলেমে পারদর্শী ছিলেন। হজরত আ'লা (রহঃ) এর অনুমতিক্রমে তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি সৎ চরিত্র ও উচ্চতর সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সন্তান মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবের খানকা শরীফে এখলাস ও মুহাব্বতের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

(২১) হজরত মাওলানা নাসীর উদ্দীন সাহেব বগবী (রহঃ) ঃ তিনি সারগোদা জিলার অন্তর্গত বহিরা অঞ্চলের অধিবাসী ও একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি গবেষণা ও শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকিতেন। আল্লাহ তা'লা তাঁহাকে বাতেনী জ্ঞান দান করেন। হজরতে আলার পক্ষ হইতে তিনি তরিকতের দায়িত্ব পাইয়াছিলেন। তিনি এক দুর্ঘটনায় পরিবারবর্গ ও সন্তান সহ শহীদ হন। আ'লা হজরত তাঁহার মৃত্যু সংবাদে শোক প্রকাশ করেন। তাঁহার উত্তরসূরীদের মাঝে ছিলেন হাজী এফতেখার আহমদ সাহেব ও হাকীম বরকত আহমদ।

(২২) হজরত মিয়া আল্লাহ দাত্তা সাহেব সারগানা (রহঃ)ঃ তিনি মুলতান জেলার অন্তর্গত বাগের সারানা অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি একজন ভাল মনের অধিকারী ও কামালে রুহানিয়াতে পরিপূর্ণ ছিলেন। আলা হজরতের নিকট তিনি বায়া'ত গ্রহণ করেন। তিনি নকশ বন্দীয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন।

(২৩) হজরত ফকীর সুলতান (রহঃ)ঃ তিনি মুলতান জেলার অন্তর্গত বাগের নামক অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আলা হজরতের একজন একনিষ্ঠ মুরীদ ছিলেন।

তিনি তরিকতের জেকর ও ফেকরে মশগুল থাকিতেন। তিনি আ'লা হজরতের পক্ষ হইতে তরিকতে পন্থার অনুমতি লাভ করেন।

(২৪) হজরত মাওলানা মুফতী আমীনুল এহসান মদ্দেজিল্লুহ আ'লা (রহঃ)ঃ তিনি বাহ্যিক ও বাতেনী বিদ্যায় পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ মার্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। তিনি প্রথমতঃ কলিকাতার অধিবাসী বরকত আলী শাহ সাহেবের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর শাহ সাহেব মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর তিনি হজরতে আ'লা (রহঃ) এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন এবং তরিকতে মুজাদ্দেদীয়া ও নকশবন্দীয়ার খেলাফত লাভ করেন। তিনি ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীব ছিলেন।

(২৫) হজরত মাওলানা মেহেরদ্দীন আহমদ সাহেব (রঃ) (ঢাকা)ঃ তিনিও একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। তিনি তরিকতের খেলাফত লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তরিকতের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে ব্রত রহিয়াছিলেন।

(২৬) হজরত আলী বাহাদুর সাহেব (রঃ)ঃ তিনি বালহাগের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আলা হজরতের নিকট বায়া'ত গ্রহণ করিয়া পূর্ববর্তী জীবনের সকল কার্যাবলী হইতে তওবা করিয়া একজন পরহেজগার বান্দা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। হজরতে আলা তাঁহাকে খুব বেশী ভালবাসিতেন। তিনি খেলাফতের সম্মানও লাভ করেন।

(২৭) আলী জনাব ডাঃ মুহাম্মদ শরীফ সাহেব (রঃ) (জিলা বিন্নু)ঃ তিনি আলা হজরতের বিশিষ্ট মুরিদ এবং খলীফা ছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরী করিতেন। পরে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া খাক্‌সার আন্দোলনে শরীক হন। ইহার পাশাপাশি ওলামাদের আন্দোলনের (ফওজে মুহাম্মদী) সহিত যুক্ত হন।

মাওলানা জহর আহমদ সাহেব বাগবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার মাধ্যমেই তিনি তরীকায় প্রবেশ ও খেলাফত লাভ করেন। হজরতে আলার ইন্তেকালের পর তিনি হজরতে সানী (রঃ) এর নিকট পুনরায় বাইয়াত হন এবং পরে বর্তমান গদী নিশীন সাহেবের মুরীদদের মধ্যে সামিল হন। অতঃপর তিনি কুন্দিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হইয়া খানকা শরীফে হজরত পীর সাহেবের খেদমতে থাকিয়া যান এবং এখানেই আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দেন। খানকা শরীফের বরকতময় কবরস্তানেই তাঁহার দাফন হয়।

(২৮) জনাব মিস্ত্রী জহুর উদ্দিন সাহেব (মালিয়া কোটলা)ঃ তিনি আলা হজরতের একান্ত মুখলিস এবং পূন্যবান মুরীদদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার পেশা ছিল রাজমিস্ত্রী। খানকা শরীফের মসজিদ নির্মাণের কাজে তিনি বেশী বেশী অংশগ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তুহ্ফায়ে সায়াদীয়ায় আলা হজরতের কেরামত প্রসংগে তাঁহার উল্লেখ আছে। তিনি এই তরীকার খলীফা নিযুক্ত হন এবং তাঁহার উসিলায় মুফতী আব্দুল গনী সাহেব এবং মাওলানা নজীর আহ্মদ আরশী সাহেব এই মহান তরীকায় প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন।

(২৯) হজরত মাওলানা আহ্মদ সাহেব (রঃ)ঃ তিনি মিয়ানওয়ালী জিলার দিত্তাখিল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ আলেম। আ'লা হজরতের খেদমতে থাকিয়া বিশদভাবে তরীকার শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন এবং পরে খেলাফত লাভে ধন্য হন। অত্যন্ত সরলমনা এবং গুণী বুযুর্গ ছিলেন তিনি। কিছুকাল মাদ্রাসায়ে আরাবীয়া সায়াদীয়ায় শিক্ষকতা করেন। আলা হজরত, হজরতে সানী (রঃ) এবং বর্তমান হজরতের সহিত তিনি অধিক আত্মিক সম্পর্ক ঠিক রাখেন। তিনি ছিলেন অল্পতে তুষ্ট ও আল্লাহর প্রতি ভরসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(৩০) জনাব হাজী আব্দুল ওহাব সাহেব (চামড়ার ব্যবসায়ী, কানপুর ও কলিকাতা)ঃ তিনি কলিকাতার একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শাহ্ আব্দুস সালাম সাহেবের সুপরামর্শে খানকায়ে সিরাজীয়ার প্রতি আকৃষ্ট এবং বাইয়াতের দ্বারা ধন্য হন। কিছুদিন পর ব্যবসা বাণিজ্য ভাইদের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি তরীকার শিক্ষা পুরাপুরিভাবে হাসিল করার জন্য স্থায়ীভাবে খানকা শরীফে বসবাস শুরু করেন এবং অতি স্থিরতার ও আন্তরিকতার সহিত তরীকার স্তরসমূহ অতিক্রম করেন। হাজী সাহেবের প্রচেষ্টায় পুরাতন মসজিদটি বর্তমানের বিরাট এবং অতি সুন্দর মসজিদের আকার ধারণ করিয়াছে। বাহিরের কাজ, আস্তর এবং কারুকার্যের কাজ বাকী ছিল। ইতিমধ্যেই আলা হজরত ইন্তেকাল করেন এবং নির্মাণ কাজ স্থগিত হইয়া যায়।

(৩১) জনাব মিয়া মুহাম্মদ কোরায়শী সাহেব (লয়ালপুরী)ঃ তিনি অতি সাদাসিধা ও সরলতাপ্রিয় ছিলেন। হজরতে আলার খেদমতে থাকিয়া তিনি তরীকার শিক্ষা পরিপূর্ণ করেন। তাঁহর সম্পর্কে হজরতে সানী (রঃ) বলিতেনঃ যখন তিনি খানকা শরীফে আসেন তখন তরীকার উপর তাঁহার মোটামুটি দখল ছিল। নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকার অতিরিক্ত খাদেম ও বরকত হাসিলের জন্য তিনি আকাংক্ষিত ছিলেন।

(৩২) জনাব মালিক আল্লাহ ইয়ার সাহেব (জিলা মিয়ানওয়ালী)ঃ তিনি নিজ এলাকার অনেক বড় ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং আলা হজরতের অতি পুরাতন মুরীদদের অন্যতম ছিলেন। তিনি মুজাদ্দেদীয়া তরীকার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছান এবং খেলাফতের দ্বারা ধন্য হন। তরীকার স্বীয় অভ্যাস দৃঢ়তার সহিত ঠিক রাখেন। খানকা শরীফের সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তোলার ব্যাপারে তিনি অনেক লোককেই সহযোগিতা করিয়াছেন।

(৩৩) জনাব মিস্ত্রী নিয়াজ আহমদ সাহেব (মালিয়ার কোটলা)ঃ তিনি আলা হজরত কুদ্দুসু সিররুহুর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এবং নিষ্ঠাবান মুরীদদের অন্যতম ছিলেন। পেশায় ছিলেন রাজমিস্ত্রী। আলা হজরতের সহিত সম্পর্কের ফয়েজ ও বরকতে তিনি জাহেরী ও বাতেনী উন্নতির যোগ্যতাও হাসিল করেন। খানকায়ে পাকের প্রথম ছোট মসজিদের নির্মাণ কাজে তিনি মিস্ত্রী জহুর উদ্দিনের সহিত বিচক্ষণ কারিগরদের ন্যায় কাজ করিয়াছেন। অতঃপর বর্তমান বড় মসজিদের নির্মাণ কাজেও তিনি উপযুক্তভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৬৫ ইং সনে পাকিস্তান–ভারত যুদ্ধের সময় তিনি খানকা শরীফে আসিয়াছিলেন। তখন হজরত মাওলানা আবুল খলীল খান মুহাম্মদ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে মসজিদের আস্তর এবং কারুকার্যের কাজ চলিতেছিল। তাহাতেও তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আলা হজরতের তরফ হইতে খেলাফত লাভ এবং মালিয়ার কোটলা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তরীকার প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে সম্মানের সহিত বাঁচাইয়া রাখুন। আমীন।

— o —

কিতাব তোহ্ফায়ে সা'দিয়া

কুদওয়াতুস সালেকীন, যুবদাতুল আরেফীন, কাইউমে জমান, কুতুবে দাওরান, সাইয়েদিনা ও মুরশিদানা, হযরত মাওলানা আবুস সায়াদ আহ্মদ খান নক্শ বন্দী, মুজাদ্দেদীর জীবনের পবিত্র ঘটনাবলী এবং বরকতময় বাণী সমূহ

بسم الله الر حمن الر حيم

. نحمده ونصلى على رسو له الكر يم.

خوش قسمتی کا پهلارن

উদাসীন মানুষ সর্বদা দুনিয়ার পার্থিব উপকরণসমূহকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করে এবং উহারই আহরণ তাহার নিকট সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন আল্লাহর অনুগ্রহে সত্য উপলব্ধির চক্ষু খুলিয়া যায় তখন বুঝিতে পারে যে ইহা কেবল দুনিয়ারই উপকরণসমূহ। সেই সঙ্গে সে ইহাও জানিতে পারেঃ

"ওয়ামা হাজিহিল হায়াতুত দুনিয়া ইল্লা লাহবুন ওয়া লাইবুন"। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন খেলাধূলা ছাড়া আর কিছুই নহে।

অতঃপর এই উপলব্ধি হয় যে, দুনিয়াদারীর উপকরণ সংগ্রহ করা সত্যিকারের কোন সৌভাগ্যের কাজ নয় এবং ইহার দ্বারা উপকৃত হওয়া কোন সত্যিকারের সাফল্য নয়। বরঞ্চ এখানেও জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত সাফল্যের মূল্যবান বস্তু হইতে সে বঞ্চিত।

সৌভাগ্যের প্রথম দিন

আল্লাহ্ তায়ালার অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ আমার উপর ছিল। আমার অন্তর সারা জীবন এক আশায় এবং আকাঙ্খায় উদ্বেল হইয়া থাকিত। তাহাতে কখনও কখনও "আয়ু নাব্বিয়ুকুম বিখাইরিম মিন জালিকুম্" (অর্থাৎ তোমাকে ইহা হইতে উত্তম কোন সংবাদ দিব কি?)–এর মৃদু আওয়াজ শুনা যাইত।

আমার হৃদয় সর্বদা খেয়াল ও খুশির দিকে আকৃষ্ট এবং সন্দেহের ঘাটিতে পরিণত হইয়াছিল। উদাসীনতা ও অহংকারের আবরণ তাহার উপর উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু ঈমানী শক্তি তাহার কানে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছিলঃ "অলাল্ আখেরাতু খাইরুল লাকা মিনাল উলা" অর্থাৎ অবশ্যই তোমার পরকাল ইহকাল হইতে উত্তম। অতঃপর মঙ্গল ও পূণ্যের শক্তি সবল হইয়া অমঙ্গলের ও পাপের মাথা চাড়া দেওয়া শক্তিকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট হইতে সাহায্য লাভের সময় সমুপস্থিত হইল। সেই সময়টাকে আমি নিজের জীবনের সৌভাগ্যের প্রথম দিন বলিয়া মনে করি। এটা সেইদিন ছিল যেদিন আমার পীর ভাই মিস্ত্রী জহুর উদ্দিন সাহেব একখানা পত্রে আমাকে উপদেশ দিলেনঃ আলা হুজুর হজরত মুরশিদানা মাওলানা আবুস সায়াদ আহমদ খান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) কোটলায় উপস্থিত আছেন, আপনার এখানে আসিয়া একান্তই ফায়েজ ও বরকত হাসিল করা উচিৎ।

পরের দিনই আমি কোটলার দিকে রওয়ানা হইলাম। গাড়ীতে উঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি এইরূপ একটি অবস্থা অনুভব করিলাম যাহা কাগজে কলমে প্রকাশ করা কঠিন। ধনুলার বার্নালার যে পায়ে চলা পথে প্রত্যহ আসা যাওয়া ছিল, অদ্য জানিনা কোন জান্নাতুন নায়ীমের সহিত তাহার যোগাযোগ হইয়াছে যে, সুগন্ধযুক্ত বাতাস আমার আত্মাকে সুরভিত করিতেছিল। সফরের উদ্দেশ্য যেন চোখের সম্মুখে খুলিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল যে, পার্থিব জীবনের ব্যস্ততার নেশা অন্তরকে কলুষিত করে এবং তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণুপরমাণু হইতে যাই যাই শব্দ শ্রুত হইতেছিল। অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। চোখ অশ্রু সজল হইল। আশেপাশের লোকদের নিকট এই অবস্থা গোপন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। মুরীদ হওয়ার আগ্রহ আমাকে সেই নেক দরবারে পৌছাইয়া দিয়াছে। অন্তরে এই উপলব্ধি আসিয়াছে যে, নাদেখা ও নাজানা যে গন্তব্য স্থানের জন্য আমি বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতেছিলাম, তাহা ছিল ইহাই। দ্বিতীয় দিন বন্ধুদের অনুরোধে তরীকার সম্পর্কের দ্বারা উপকৃত হইলাম এবং পীর কেবলার প্রথম সুদৃষ্টিতেই আমার অস্থির আত্মা স্থায়ী সান্ত্বনা লাভ করিল।

কিছুদিন পূর্বে দেশে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করিয়াছিলাম। এই জন্য সেবার অনুমতি লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিলাম। স্থির করিলাম, আত্মিক প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সময়ের জন্য পুনরায় খানকা শরীফে উপস্থিত হইব। অদৃশ্য সুযোগ যখন আসিতে শুরু করে তখন কোন কিছুই কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর করে না। একজন উদাসীন ও লাচার মানুষও তখন এক অদৃশ্য আকর্ষণে সৌভাগ্যের প্রকাশ্য সড়কে চলিয়া যায়। আলহামদু লিল্লাহ, আমার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আবার কবে যাইব, এই ব্যাপারে হুজুরের নিকট হইতে একাধিক চিঠি পাইলাম। শেষ চিঠির একটি লেখা এইরূপ ছিলঃ যদিও মসজিদ নির্মাণ একটি বিরাট ফজিলাতের কাজ, কিন্তু চরিত্রিক সৌন্দর্য এবং আত্মশুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে আত্মিক অগ্রসরতার কাজ। অতএব ইহা প্রথমটির তুলনায় উত্তম এবং অগ্রগণ্য। এই উপদেশ পাইয়া আমি আর দেরী করিতে পারিলাম না। তাড়াহুড়া করিয়া খানকা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। ধনুলা হইতে লাহোর হইয়া কুন্দিয়ান জংশনের টিকেট কিনিলাম। কুন্দিয়া ষ্টেশন হইতে সেই মর্যাদাপূর্ণ খানকা শরীফ তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, সেই খানকার নাম খানকায়ে সিরাজীয়া মুজাদ্দেদীয়া।

বিশেষ অবস্থা, নিজস্ব অভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজ

হজরত পীর সাহেব কেবলার বয়স আমার ধারণায় ৫০ হইতে ৬০ বছরের মধ্যে ছিল। তাঁহার অংগপ্রত্যংগ ছিল খুবই মজবুত। আকৃতি মধ্যম ধরণের। দেহ বলিষ্ঠ। বংশ

ছিল সম্ভ্রান্ত, রাজপুত মুসলিম। পেশায় বংশপরম্পরায় জমিদারী এবং এলাকার নেতৃত্ব। নিজ বংশে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলামের পতাকা অর্থাৎ দ্বীনি শিক্ষার পতাকা উত্তোলন এবং তরীকার স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া পীরের আসন অধিকার করিয়াছেন। তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে। অবশিষ্ট জীবন তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ ও হাদীস বিশারদের ভূমিকায় ধর্মীয় আদেশ উপদেশ বিতরণে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁহার চেহারার মধ্যে একটি সহজাত বিশেষ সম্মানের ছাপ ছিল। মজলিশে তিনি চুপ থাকিলে সকলেই চুপ হইয়া যাইতেন। কেহই কথা বলিতে সাহস পাইতেন না। তিনি কিছু বলিতে শুরু করিলে প্রত্যেকেরই শ্রবণ শক্তি এবং বাক শক্তি প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকিত এই জন্য যে, তাঁহার সহিত কথা বলার সুযোগ হইয়া যাইতে পারে। তিনি যদি খুশীমনে কোন গল্প বলিতেন, তখন তাঁহার চেহারার সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতায় মজলিশ গুলশানে পরিণত হইত। এত শ্রেষ্ঠত্ব ও দীপ্তি সত্ত্বেও নিজের তাজিম ও বুযুর্গীর জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না। বরং উহা ঘৃণা করিতেন। ইহা প্রমাণের জন্য কয়েকটি ঘটনা পেশ করিতেছি।

জামাতের সহিত নামাজ আদায়ের জন্য তিনি এমন সময় মসজিদে তশরীফ আনিতেন যখন সকল মুসল্লির সুন্নত নামাজ পড়া শেষ হইত। তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী ঘরের বারান্দা হইতে বাহির হওয়াই জামাত আরম্ভ হইবার সংকেত ছিল। কাজেই তাঁহাকে দেখার সাথে সাথেই নামাজীদের মধ্যে কাতার ঠিক করার ব্যতিব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইত। একদিন জোহরের নামাজের জন্য যখন তিনি তশরীফ আনিলেন, তখন আমি মসজিদের বারান্দায় সুন্নত পড়িতেছিলাম। ইহা দেখিয়া তিনি অভ্যাসের খেলাফ চাটাইয়ের উপর আসিয়া বসিলেন। আমার সুন্নত পড়া শেষ হইলে জামাতের জন্য দাঁড়াইলেন।

তাঁহার নিজস্ব বসার অত্যন্ত সুন্দর কামরাটির নাম তসবীহ খানা। উহাতে কালীন বিছান থাকিত। উহার সামনের দিকের মুরীদদের থাকার জন্য বিরাট একটি কক্ষ যা তখনও কাঁচা ছিল। এখানে একটি চাটাই বিছানো ছিল। তিনি খাদেম ও জাকেরীনদের দেখাশুনার জন্য কখনও কখনও এই কামরায় আসিতেন এবং সেই জীর্ণশীর্ণ বালুমাখা চাটাইয়ের উপরে বিনা দ্বিধায় উপবেশন করিয়া উপস্থিত সকলকে উপদেশ দিতেন।

আমি এবং হজরতের খাস খাদেম মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব লুধিয়ানভী (ফাজেলে দেওবন্ধ) কুতুব খানায় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন চাটাইর উপর বসিয়া গ্রন্থাদি সাজাইয়া রাখার

কাজ করিতাম। একদিন হজরত আমাদের কাজ দেখার জন্য তশরীফ আনিলেন। আমরা তাঁহার জন্য একটি চাটাই খালি করিয়া দিবার পূর্বেই তিনি মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন।

আর একদিন তিনি তসবীহ্ খানায় বসিয়া কোন একটি কিতাব দেখিতেছিলেন। আমি এবং আরো কিছু লোক তাঁহার নিকট বসিয়াছিলাম। আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন ছিল। অকস্মাৎ বৃষ্টি শুরু হইল। বাহির হইতে নিজ জুতা উঠাইবার জন্য তিনি নিজেই উঠিলেন এবং এত তাড়াতাড়ি গিয়া জুতা নিয়া আসিলেন যে, কোন খাদেমই এই খেদমত করিবার সুযোগ পাইল না।

দরবেশখানার সামনে একটি চৌকি পাতা ছিল। কখনও কখনও হজরত বাহিরে হাঁটিতে আসিলে কিছুক্ষণের জন্য ঐ চৌকিতে বসিতেন। একদিন তিনি সেখানে গেলে কয়েকজন খাদেম ও জাকের তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। হজরত তাহাদের কথা ভাবিয়া চৌকিতে না বসিয়া নীচে মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন।

একবার কোন এক সফরে আমিও সঙ্গে ছিলাম। তিনি অজুর জন্য সময়মত পানি এবং নামাজের জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়ার জন্য প্রায়ই দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন। জিনিষপত্রও নিজের কাছেই রাখিতেন। পথে যত জায়গায় গাড়ী হইতে নামার প্রয়োজন হইত, তিনি কাহারো অপেক্ষা না করিয়া অতি তাড়াতাড়ি নিজেই সকল মালপত্র নামাইতে শুরু করিতেন। খাদেমদের একটি বড় দল সঙ্গে থাকিলেও কিছু না কিছু মালপত্র তিনি নিজে বহন করার জন্য পিড়াপিড়ি করিতেন। একবার খোশাব রেল ষ্টেশনে তিনি বারবার বলিতেছিলেনঃ ভাই সকল আমাকেও কিছু বহন করিতে দিন।

একবার তিনি ভেরা হইতে ভালওয়াল পর্যন্ত মোটর গাড়ীতে সফর করিলেন। যখন গাড়ী ষ্টেশনে থামিল তখন তিনি তাড়াতাড়ি সকলের আগেই নামাইতে শুরু করিলেন। আমরা অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি বিরত হইলেন না এবং বলিলেনঃ আমাদের হজরত মরহুম সিরাজউদ্দিন দামানী সাহেব খুবই বড় পীর ও মুরশিদ হওয়া সত্ত্বেও সফরের কষ্ট স্বীকার করিতেন এবং সাথীদের কাজে শরীক হইতেন। একবার মুরীদগণ প্ল্যাটফরমে তাঁহার বসিবার জন্য একটি বেঞ্চের উপরে চাদর বিছাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি সাথীদের জন্য নীচে বিছানো চাদরের উপরই উপবেশন করিয়া বলিলেনঃ বন্ধুদের সামনাসামনি বসাই ভাল।

একবার মালিক ওমান ষ্টেশনে তাঁহার মালপত্র কুলির মাথায় উঠাইয়া দেওয়া হইল। আমার ছোট একটি সুটকেস এবং বিছানা আমি নিজেই বহন করিতেছিলাম।

তিনি তাড়াতাড়ি বিছানাটা আমার নিকট হইতে নিয়া নিলেন। আমি উহা ফেরত নিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা ফেরত দিলেন না। শেষ পর্যন্ত আদব রক্ষার্থে চুপ থাকিলাম। তিনি আমার বিছানা বগলে নিয়া আগে আগে যাইতেছিলেন। আমি পিছনে পিছনে লজ্জায় ঘর্মাক্ত কলেবর হইতেছিলাম।

কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণ

সর্বাবস্থায় শরীয়ত ও মারেফাত একই উদ্দেশ্যের দুইটি ঘাঁটি, অথবা একই সত্যের দুইটি শাখা। একটি সত্য কথা অনস্বীকার্য যে, অজ্ঞ বা মুর্খ ফকির তো দূরের কথা, আলেম ও ফকীহ্ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত মারেফতি লাইনে প্রবেশ করার পর শরীয়তের গন্ডির বাহিরে চলিয়া যাইতে দেখা যায়। আস্তে আস্তে তাহারা আনুষ্ঠানিকতা ও আচার অনুষ্ঠানজনিত বিদ্‌য়াতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। লেখকের বক্তব্যঃ আমার ধারণায় শতকরা ৯০ জনই এই রোগ হইতে রেহাই পায় না। কিন্তু মাশাআল্লাহ্ আমাদের পীরে কামেল তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ ও আমল সুন্নত অনুযায়ী ছিল। পোষাক–পরিচ্ছদ, পানাহার, উঠা–বসা, কথাবার্তা, সালাম–কালাম, ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজেই শরীয়াতের নির্দেশ এইরূপভাবে তিনি মানিয়া চলিতেন যেরূপ মানিয়া চলা ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসদের উপযুক্ত। সেই সাথে তিনি তাঁহার সকল মুরীদ ও ভক্তদেরকে এইভাবে চলার নির্দেশ দিতেন।

আমাদের কোন এক বিশিষ্ট বন্ধুর নবজাত সন্তানের জন্য তিনি একটি তাবিজ লিখিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেনঃ চামড়া দিয়া বাঁধাইয়া দিবেন। কারণ শিশুদের জন্য রূপার তাবিজ জায়েজ নাই। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একবার আসিয়া বলিলেনঃ হুজরত, সালামত। তিনি বলিলেনঃ ইহা সালামের সুন্নত সম্মত তরীকা নহে। বরং বলিবেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। একবার একজন ভক্ত দেখা করিতে আসিলেন। তাহার মাথার পাগড়ীটি সুন্নত অনুযায়ী ছিল না। তাই মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব তাহাকে বলিলেনঃ হুজুরের সামনে যাইতে হইলে মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলুন কারণ, ইহা তাক্বওয়ার খেলাফ। তিনি এই অবস্থা দেখিলে অসন্তুষ্ট হইবেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব হয়ত এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন যে, তিনি প্রত্যেক আগমনকারীর হাল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন যেন তাহা সুন্নত ও শরীয়াতের বরখেলাফ না হয়। মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তি কোন পা আগে ভিতরে রাখিল এবং বাহির হওয়ার সময় কোন পা আগে বাইরে রাখিল, চায়ের পিয়ালা ডান হাতে নিল না বাম হাতে, পানি এক শ্বাসে পান করিল না

তিন শ্বাসে এবং অজুতে সমস্ত মাথা মাসাহ করিল কিনা, সেজাদায় পায়ের আংগুল কেবলামুখী কিনা ইত্যাদির প্রতিও মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব লক্ষ্য রাখিতেন।

মাওলানা হাকীম আবদুর রসূল সাহেব বলিয়াছেনঃ একবার আ'লা হজরত সরহিন্দ শরীফে ছিলেন। হজরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী (রঃ) এর মাজার শরীফে নাত পড়া হইতেছিল। তিনি কয়েকটি বালককে সুর করিয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়া আপত্তি করিলেন, তখন গদীনিশীন সাহেব বলিলেন, "না'ত পাঠকারীরা সকলেই পুরুষ এবং বালকগণ পুরুষের সহিত নাত পাঠ করিতেছে। সুতরাং তাহাদের নামাজ পড়াতে আপত্তি কি?" আ'লা হজরত তখন এরূপ পাঠ মাকরুহ হওয়ার প্রমাণ মাকতুবাতে মুজাদ্দেদীয়া হইতে পেশ করিলেন। গদীনিশিন সাহেব হজরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফেসানীর (রঃ) এর কথা শিরোধার্য করিলেন। ঐ সময় হইতে মাজার শরীফে এই প্রকারের না'ত পাঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এবাদতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মধ্যমপন্থী। একবার ফজরের নামাজে তিনি সুয়ায়ে তহা শুরু করিলেন এবং দ্বিতীয় রুকুতে শেষ করিলেন। মসজিদের দরজা বন্ধ ছিল এবং আলো জ্বলিতেছিল। সালাম ফিরাইবার পরে একজন মুকতাদী দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দরজার বন্ধ করিলেন। এই ফাঁকে আমি বাহিরের দিকে তাকাইলাম। আমার মনে হইল যে, বোধ হয় সূর্য্য উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। ফলে নামাজের ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ হইল, তবে এই মনে করিয়া সন্দেহ দূর করিলাম যে, আমার মুরশেদতো অচেতন নহেন। এই ঘটনার তৃতীয় দিন হজরত আলোচনাক্রমে বলিলেনঃ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিনা এবং তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু যখন নামাজের মধ্যে দীর্ঘ ক্বেরাত শুরু করি তখন ক্লান্ত হইনা। আমি সুযোগ পাইয়া আরজ করিলামঃ হজরত, গত পরশু ফজরের নামাজের ক্বেরাত এত দীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল যে, হয়ত সূর্য উদয় হইয়া গিয়াছিল। ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া বলিলেনঃ কি বলিলে? সূর্য্য উদয় হইয়া গিয়াছিল? তারপর নিজেই একটু শান্তভাবে বলিলেনঃ না, এমন হইতে পারেনা, আমি ঘড়ি দেখিয়া দাঁড়াই এবং সালাম ফিরাইবার পরে ঘড়ি দেখিয়া সন্দেহ দুর করিয়া নেই। তাছাড়া আমার ঘড়িও ঠিক সময় দেয়। হজরতের এই কথা শুনার পর আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না।

পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা

লেবাসে পোষাকে তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার্য জিনিষ পত্র যেমন, লাঠি, তাসবীহ, জায়নামাজ, চায়ের পিয়ালা, চশমা, বিভিন্ন জিনিষপত্র

রাখিবার বাক্স, নিজস্ব কলমদান, পকেট ঘড়ি ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিষ অতি সুন্দর এবং মূল্যবান ছিল। প্রত্যেকটি জিনিসের ক্রটিমুক্ত কিনা তা তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। তৈয়ারী কোন জিনিষ অসুন্দর অথবা ক্রটিযুক্ত হইলে উহা যত দামীই হোক না কেন তিনি তাহা রাখিতেন না। কোন অপছন্দনীয় ঘ্রাণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মেজাজ খারাপ করিয়া দিত এবং তিনি সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেন।

সমন্দরী থানায় একবার হুক্কা সম্বন্ধে তিনি এরশাদ করেনঃ ইহাকে শুধু মাকরুহ বলা একটি বিলসিতা কারণ ইহার মধ্যে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি আছে। অতঃপর বলিলেনঃ সোয়াতের ওলামাগণ ইহাকে হারাম বলেন এবং এই ব্যাপারে তাহারা এত বাড়াবাড়ি করেন যে, যে জমিতে তামাক লাগান হয় সেই জমিতে পরপর কয়েকটি ফসল না উঠা পর্যন্ত উহা পাক হয় না বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করেন। এইরূপ বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। ঘটনাক্রমে পরের দিন হজরতের কোন এক তামাক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে দাওয়াত হইল। বাড়ীর মালিক তামাকের গুদামে দস্তরখান বিছাইলেন। হজরত সেখানে আসিলেন। তামাকের গ্যাসে সকলের শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। আ'লা হজরত রুমাল দিয়া নাক ঢাকিলেন। অন্য সকলে হাঁচির পর হাঁচি দিয়া যাইতেছিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, জায়গা পরিবর্তন করা হউক। কিন্তু আলা হজরত বলিলেনঃ আপ্যায়নকারীকে এই কষ্ট দেওয়া ঠিক হইবে না। অতঃপর তিনি সহ্য করিবার খুব চেষ্টা করিলেন। শেষ পর্যন্ত অপারগ হইয়া উঠিয়া আসিলেন এবং অন্য সবাইকে বসিয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেনঃ আমি একাই যাইতেছি। এই আদেশক্রমে সকলেই বসিয়া থাকিল। শুধু মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব হজরতের জুতা নিয়া উঠিয়া আসিলেন। বাড়ীতে পৌছার পর তাঁহার স্বাস্থ্য এতই খারাপ হইল যে তার পরের বেলাও তিনি কিছু খাইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেনঃ সোয়াতের ওলামাদের ফাতওয়ার কারণ আজ বুঝিতে পারিলাম।

জ্ঞান প্রিয়তা

ইল্‌ম বা জ্ঞানের প্রতি হজরতের ভালবাসা অত্যন্ত বেশী ছিল। তাই কিতাব সংগ্রহের আগ্রহও ছিল প্রচুর। পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার বিরাট কুতুবখানাটি একমাত্র নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অর্থের দ্বারাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দিন দিন তাহার আরো শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিলেন। বিভিন্ন খন্ডকে একই খন্ড মনে করিলেও তাঁহার কুতুবখানায় মোট কিতাবের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। তাফাসীর বিষয়ে তাফসীরে ইবনে জরীর, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে রুহুল ময়ানী, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে দুরের মানসুর এবং তাফসীরে খাজেন, তফসীরে মায়ালিম, তাফ্‌সীরে

নিশাপুরী, তাফসীরে বাইজাবী, তাফসীরে জামাল এবং আরো অনেক তাফসীর মওজুদ আছে। হাদীস বিষয়ে সহীহ্ বোখারী শরীফ বিভিন্ন প্রেসে ছাপা এবং বিভিন্ন টিকা সহকারে উত্তম হইতে উত্তম, বিরাট আকারের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা যথা– আইনী ১১ খন্ড, আসক্বালানী ১৩ খন্ড, কেসতোলানী ১২ খন্ড, এই সকল কিতাব সংগ্রহ করা আছে। অবশিষ্ট সিহা সিত্তার ব্যাখ্যার উপরে লিখিত সব কিতাব বই কুতুবখানায় সাজানো আছে। সিহাসিত্তা ব্যতীত অন্যান্য হাদিসের কিতাব যথা মুসতাদরাকে হাকীম, সুনানে কুবরা, বাইহাকী, মাস্নাদে দারে কুত্নী, মস্নাদে দারেমী, মাসনাদে তোয়ালিসী, মাসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ), শরহে মায়ানী, আসারে তহাবী, নাইলুল আওতার ইত্যাদি কিতাবসমূহ কুতুবখানার সংগ্রহে আছে। মাসনাদে হুমায়দী হাদীসের একটি প্রসিদ্ধ কিতাবেরও কিছু এখনও ছাপা হয় নাই, একটি হাতে লেখা কপি সংগ্রহ করা হইয়াছে। আসমায়ে রিজালের কিতাবসমূহও অতি চমৎকারভাবে সাজানো আছে। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য আল্ আসবাহ ইবৃনে হাজর, তাজীবুত তাহজীব ১২ খন্ডে ইত্যাদি। আরও আছে ফিকাহে হানাফীর বর্তমান সব কিতাব যথা শরহে বেক্বায়াহ্, হেদায়াহ, আলমগীরী, শামী, আল বাহরুর রায়েক এবং ফাতহুল কাদীর। এইরূপ অনেক কিতাবও আছে যাহা সাধারণ আলেমগণের কাছে আকর্ষণীয়, যথা শরহে সিয়ারে কবীর, ৪ খন্ডে সারাখসী, ৩০ খন্ডে কিতাবুল মাবসুত ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া ফিকাহে শাফেরী, ফিকাহে–মালেকী, এবং ফিকাহে হাম্বলী বড় বড় এবং প্রচুর কিতাব যথা ৭ খন্ডে কিতাবুল উম ফিকাহে শাফেয়ী, ৯ খন্ডে শরহুল মাহ্জাব, ফিকাহে জাহেরী আল মাহাল্লী, কাশাফুল ক্বানা, মুগ্‌নী ইবনে কাদামা, কয়েক খন্ডে ফিকাহে হাম্বলী সংগ্রহ করা আছে। এইভাবে অবশিষ্ট ইলম ও বিভিন্ন বিষয় যথা– উসুলে হাদীস ও ফিকাহ্, আকায়েদ ও কালাম, সিয়ার ও মাগাজী, তাসাওউফ ও সূলুক, ত্বীব ও হিকমত, লোগাত ও আদব, সরফা ও নহু, মায়ানী ও বয়ান ইত্যাদি বিষয়ের কিতাবসমূহের ব্যাপক সমাহার আছে। আলফিয়া ইবনে মালিকের ৮ খানা বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপর লিখিত গ্রন্থ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। লোগত (অভিধান) বিষয় ক্বামুস অতি উচ্চ মানের বলিয়া স্বীকৃত। এখানে তাঁহার শরাহ তাজুল উরুস ১৪ খন্ডে মওজুদ আছে। তাসাওউফ ও আখ্‌লাক বিষয়ক, ইয়াহ্ইয়াউল উলুম একটি সমুদ্রের ন্যায়, এখানে তাহারও শরাহ ইত্তেহাফুস সায়াদতুল মুত্তাকীন নামে ১০ খন্ডে বিদ্যমান আছে। কোন কোন কিতাব এইরূপও আছে যাহার কারণে এই কুতুবখানা বিশ্ব কুতুবখানা হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এসব গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে পৌনে চারশত বৎসর পূর্বে লেখা মোল্লা হোসাইন ওয়ায়েজ কাশেফীর

জাওয়াহিরুত তাফাসীর যাহার শুধু নামই শুনিয়া আসিয়াছি। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ১০টি কপি এখানে সযত্নে রাখা আছে। একবার হজরত মাওলানা সাইয়েদ শাহ্ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মেরী (রঃ) (শায়খুল হাদীস দেওবন্দ) মিয়ানওয়ালীর কোন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তশরীফ আনিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি খানকা কাশরীফে মেহমান হইলেন, কুতুবখানা দেখিয়া তিনি খুবই মুগ্ধ হইলেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কুতুবখানা পরিদর্শন করিলেন। এই সময় নাওয়াদিরুল উসূল হাকীম তিরমীজী নামক এক খানা কিতাবের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি বলিলেনঃ এই কিতাবখানা আমি বহুদিন যাবৎ খুঁজিতেছি কিন্তু কোথাও পাইতেছিলাম না। অতঃপর তিনি তাহা সংগে করিয়া নিয়া গেলেন। দেওবন্দ ফিরিয়া তিনি পত্র লিখিলেনঃ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমি আপনারদের ওখানে বেশীদিন থাকিতে পারি নাই কারণ রমযান মাস আসিয়া পড়িয়াছিল, নতুবা আরো কিছুদিন থাকিতাম। তবুও যতটা সময় আমি সেখানে কাটাইয়াছি তাহা আমি আমার জীবনের সুবর্ণ সময় বসিয়া মনে করি।

একদিন আলা হজরত বলিলেনঃ আমি আমার কর্মময় জীবনের প্রথম দিকে একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলাম। এরূপ অসুস্থ হইলাম যে বাঁচিবার আশাই ছিল না। এক বুযুর্গ ব্যক্তি আমাকে দেখার জন্য আসিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং বলিলামঃ আমার মৃত্যুর জন্য কোন দুঃখ নাই। শুধু এই জন্য দুঃখ হইতেছে যে, সিহা সিত্তা ক্রয় করিতে পারিলাম না।

একবার তিনি বলিলেনঃ ৮ খন্ডে ৮০০ শত পৃষ্ঠার শরহে বেসাল কাশিরিয়া শায়খুল ইসলাম হজরত মাওলানা জাকারিয়া মাতবুয়া (মিশর)—এর মূল্য ১০/১২ টাকা হইবে। আমার উহা ক্রয় করার একান্ত আগ্রহ হইল। বোম্বাইর একজন কিতাব ব্যবসায়ীর নিকট আমি এই কিতাবটির অর্ডার দিলাম। উত্তর আসিল যে, এই কিতাব পাওয়া যাইবে না। মাত্র একখানা কিতাব আছে যাহা ৪০ টাকার কমে বিক্রি করা সম্ভব নয়। ঘটনাক্রমে তখন আমার নিকট মাত্র ৫টি টাকাই ছিল। আমি তাহা অগ্রিম পাঠাইয়া দিলাম এবং লিখিলাম যে কিতাবটি যেন অন্য কাহাকেও না দেওয়া হয়। এবং আমি অবিশিষ্ট টাকা পাঠাইলে কিতাবটি যেন আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আর একবার কাজী আয়াজ লিখিত মাশারিকুল আনোয়ার কিতাবটি আমি খুঁজিতেছিলাম। তখন আমি মুলতানের কিতাব ব্যবসায়ী মাওলানা আব্দুত তোয়াবের নিকট কিতাবটির অর্ডার দিলাম। উত্তর আসিল যে, কিতাবের বর্তমান কপিগুলির দাম অনেক বেশী হইবে। আগামী কিস্তি মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমি লিখিলাম, অপেক্ষা করা

মুশকিল হইবে, বেশী দামের জন্য পরওয়া করিনা। দাম যাহাই হোক কিতাবটি পাঠাইয়াদিন।

এই সময় একরাত্রে তিনি বলিতেছিলেনঃ মুয়াত্তা ঈমামে মালেকের অমুক অমুক শরাহতো আমার নিকট আছে, শুধু মুসাসাফা এবং হজরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রঃ) রচিত মুসাওয়া শরহে মুয়াত্তা অনেক খোঁজা সত্বেও পাই নাই। আমি (লিখক) আরজ করিলামঃ এই কিতাব দুইখানা আমার নিকট আছে। আমি বাড়ী যাইয়া তাহা ডাক যোগে পাঠাইয়া দিব। হজরত বলিলেন যে এত অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য কাহার আছে? এখনই কোন লোককে ধনুলায় পাঠাইয়া দেওয়া হোক। আগামীকালের মধ্যে নিয়া আসিবে। কাজেই ঐ সময়ই মিস্ত্রী জহুর উদ্দিন সাহেবকে ধনুলায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কিতাব পাঠের আগ্রহ

কোন কোন আলেমের মধ্য মূল্যবান গ্রন্থাদি সংগ্রহ করার উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু পড়ার আগ্রহ কম থাকে। কেহ যদি পড়েনও তাহা হইলে উহা এইরূপ যে, নূতন কিতাব আনার পর দুই চার দিন তাহা দৃষ্টির সামনে রাখা হয়। অতঃপর কিছু প্রথম দিক হইতে দেখেন, কিছু শেষ দিক হইতে দেখেন। এবং তারপর উহা আলমারীতে সাজাইয়া রাখেন। কিন্তু আমাদের আলা হজরত প্রত্যেকটি নূতন কিতাব প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। একদিন তিনি বলিলেনঃ তাফসীরে ইবনে জরীর তিবরী আনার পর উহার ১০ খন্ডই কয়েক মাসে শেষ করিয়া স্বস্তি লাভ করিয়াছি।

তিনি আরও বলিয়াছেনঃ শায়খুল ইসলাম হজরত জাকারীয়া সাহেবের লিখিত শরহে কাশিরীয়ার চার খন্ড মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছি। এভাবেই তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, তাসাওউফ ইত্যাদি কোন বিষয়ের কিতাবই পড়া ব্যতীত তুলিয়া রাখেন নাই। গ্রন্থ পাঠের সময় যেখানেই কোন বিশেষ আলোচনা অথবা আকর্ষণীয় কোন মাসয়ালা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত তখনই তিনি উহার পৃষ্ঠা নম্বর এবং স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিতেন। লেখক বলেনঃ আমি দেখিয়াছি যে, এই প্রকারের স্মরণিকায় প্রত্যেক কিতাবের সাদা কাগজ কাল হইয়া যাইত।

আলা হজরত একদিন বলিলেন, "আমি ১৩১৩ হিজরীতে পড়াশুনা শেষ করিয়া দেশে ফিরিলাম। তখন হইতেই রীতিমত কিতাব দেখার অভ্যাস চালু করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত সেই আগ্রহ বহাল রাখিয়াছি। এই ব্যাপক পড়াশুনার দ্বারা আমার জ্ঞানের পরিধি অস্বাভাবিক বাড়িয়া গিয়াছিল।" আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, যখনই কোন সমস্যা

দেখা দিয়াছে তখনই তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার সাগরের আলোকে সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

সকাল সন্ধ্যার বৈঠকগুলিতে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলিত। দুঃখের বিষয় সেই বক্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। মাত্র একটি ঘটনা স্মরণ আছে। একদিন কুতুবখানার তালিকা লিখিবার সময় তবাক্বাতে ইবনে সায়াদ এর খন্ডগুলি আমার সম্মুখে ছিল। কিতাবের নাম, লেখকের নাম এবং মৃত্যুর সময় তারিখ লিখিতেছিলাম। আলা হজরত বলিলেন, এই কিতাবটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। আমি বলিলাম, নিঃসন্দেহে হজরত! আল্লামা শিবলী নোমানীও ইহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিলেনঃ ইবনে স'য়াদ ওয়াকীদির শাগরীদ। আমি বলিলাম, হজরত! তাঁহারতো অনেক বদনাম আছে। হজরত বলিলেনঃ না, তিনি সিক্বা অর্থাৎ সত্যবাদী, কেননা ইবনে তাইমিয়ার ন্যায় তিনি কঠোর এবং হুঁশিয়ার মুহাদ্দিস। আচ্ছারিমুল মাসলূলে তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণনা আছেঃ

তিনি যুদ্ধসমূহের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনার সর্বাধিক বড় আলেম এবং সাহাবীর ন্যায় উচ্চ দৃষ্টিসম্পন্ন মুহাদ্দিস। তাঁহার সম্পর্কে দার ওয়ারদি হইতে এই কথা নকল করেন যে, হুয়া আমীরুল মুয়মীনীনা ফিল হাদীস অর্থাৎ তিনি হাদীস বিষয়ের বাদশা। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, অনেক অনেক মুহাদ্দিস ওয়াকীদিকে দুর্বল এবং মিথ্যাবাদী পর্যন্ত বলিয়াছেন। তবে তাঁহার সম্বন্ধে এই বিতর্ক শুধু হাদীস এবং হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে প্রযোজ্য। সিরাত এবং যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার ইমাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতি দোষারোপ করার কারণ এই নয় যে, তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজন মিথ্যাবাদী ছিলেন। বরং সমালোচনা বিচারের মাপকাঠির মৌলিক প্রথা অনুযায়ী হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস বর্ণনা ছাড়া কোন অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা নিন্দনীয়। এ কারণেই তাঁহাকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত হইতে হইয়াছিল। অসহায় ওয়াকীদিকে শুধু এটুকু অপরাধের জন্যই বদনামী হইতে হইয়াছে যে, তিনি হাদীস বর্ণনাকারী হইয়াও কিভাবে চরিত্র বিষয় এবং যুদ্ধ বিষয়ে ব্যস্ত হইলেন। যা হোক, তিনি এই ব্যস্ততার কারণে হাদীস বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু সিরাত ও যুদ্ধ বিষয় তাঁহার স্থান সকলের চাইতে উপরে।

অতঃপর তিনি বলিলেনঃ সত্য কথা এই যে, আসমায়ুর রিজালের অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা ও বিচারের মাপকাঠিও বড় সূক্ষ্ম এবং বড়ই অদ্ভুত। কোন কোন মুহাদ্দিস ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টির কারণে অন্যদের সমালোচনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কোন অনুসন্ধান ছাড়াই কেবল অপ্রয়োজনীয় সন্দেহের উপর সমালোচনা

করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, একজন মুহাদ্দিস কোন এক শায়েখের নিকট হাদীস শোনার জন্য গিয়া দেখিলেন যে, তিনি ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া উহাকে ছুটাইতেছেন। শুধু এই কারণেই তাহাকে দোষী স্যব্যস্ত করিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন যে, ঘোড় দৌড়ের সাথে মুহাদ্দিসের কি সম্পর্ক আছে? আর একজন কোন এক শায়খুল হাদীস-এর শহরে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার মহল্লা হইতে বাঁশির আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। অনুসন্ধান ও খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়াই তিনি মনে করিলেন যে বাঁশির এই আওয়াজ তাঁহার গৃহ হইতেই আসিতেছে। তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে সমালোচনা শুরু করিয়া দিলেন, ইমাম মালেক এর মুয়াত্তার যখন খুব সুনাম ছড়াইয়া পড়িল তখন তাঁহার ওস্তাদ ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক লোকদের নিকট বলিলেনঃ

هَاتُوْ اعِلْمَ مَالِك فَانَامَطَارُ

অর্থাৎ মালেকের কিতাব আমাকে দেখাও, আমি তাহার শিরা ইমাম। মালেক এই কথা জানিতে পারিয়াস অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেনঃ

ذَلِكَ دَجَّالُ الدجَاجِلَةِ وَنَحْنُ اَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْمَدِ يْنَةِ

অর্থাৎ "সে হইল বড় দজ্জাল এবং এইজন্য আমরা তাহাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি।"

কথা হইতেছে এই যে, ওয়াকিদী যুদ্ধসমূহের ঘটনাগুলি এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যে, অনেকেরই মেধা ও স্মরণশক্তিতে উহা ধারণ করা সাধারণভাবে অসম্ভব ছিল। এইজন্য অনেকের সন্দেহ হইত যে, তিনি বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। আসলে ইহা তাঁহার প্রতি শুধু শুধু মন্দ ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। ঐ সময়ের লোকদের স্মরণ শক্তির কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, ওয়াকিদীর ব্যাপার তাহাদের তুলনায় কিছু মাত্র অতিরঞ্জিত নয়। হাদীসের হাফেজ তাঁহাকেই বলা হয় যাঁহার কমপক্ষে ১ লক্ষ হাদীস সনদ সহ স্মরণ থাকে। হাফেজ ইবনে হাজার, হাফেজ সূয়ুতী, হাফেজ ইবনে জাওযী, হাফেজ ইবনে কাইয়ূম, হাফেজ মুগলতায়ী প্রমুখ এই কারণেই হাফেজ আখ্যায়িত হইয়াছেন যে, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। এরূপ হাফেজে হাদীস অতীত যুগে অসংখ্য ছিলেন। বর্তমানে এরূপ কোন আলেম আছে কি যাহার লক্ষ বা হাজার তো দূরের কথা ১০০ বা ২০০ হাদীসও সনদ সহ মুখস্ত আছে?

ওয়াকিদীর স্মরণ শক্তির সমালোচনা বর্তমান যুগের স্মরণ শক্তির মাপকাঠিতে করা সুবিচার হইবে না। ইহার পর আলা হজরত দেওয়ানে মুতানাব্বির শরাহ আকবরী

(যাহা সম্মুখেই রাখা ছিল) হাতে নিয়া সেখান হইতে আবুল আলা মুয়াররার অবস্থা উপস্থিত লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন যাহার সার কথা এই যে, আবুল আলা অন্ধ ছিলেন। ছোটকালেই তাঁহার সুনাম চুতর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইস্তাফীয়ার একটি কুতুবখানার প্রধান পরিচালক তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য কোন একটি অপ্রসিদ্ধ এবং কঠিন কিতাবের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইয়া দিলেন। অতঃপর আবুল আলা সেই শোনা পৃষ্ঠাগুলি দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছিলেন। হজরত অতঃপর বললেনঃ যখন ইসলামের মধ্যে এইরূপ উন্নত মেধাবী লোক অতীতে ছিলেন তখন ওয়াকিদীর প্রতি মানুষ এত আশ্চর্য্য কেন হয়।

আলা হজরতের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পরিধিতে দৃষ্টান্তমূলক দৃষ্টি ছিল। একটি বিশেষ গ্রন্থের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগাযোগ ছিল সর্বাধিক। গ্রন্থটি হইতেছে মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী (রঃ)। এই কিতাবের সকল বিষয়ই তাঁহার এক প্রকার মুখস্ত ছিল। গ্রন্থে সকল ঘটনার উপর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। বেশীরভাগ তরীকার আলোচনার সময় তিনি সনদ হিসাবে মাকতুবাতে রব্বানী পেশ করিতেন এবং গ্রন্থ হইতে অনায়াসে সেসব অংশ বাহির করিয়া শুনাইয়া দিতেন। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল এই যে, তিনি মাকতুবাত শরীফ নিজ পীর সাহেব কেবলার নিকট পরিপূর্ণরূপে সবক নিয়া একাধিকবার পাঠ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠের জন্য নির্ধারিত একটি বিশেষ সময় এবং নির্জনতার ব্যবস্থা ছিল। ইহার শিক্ষা অন্যান্য কিতাবের ন্যায় শুধু বলার উপর নির্ভর ছিল না। বরং উহাতে ছিল হাল এবং বাতেনী শক্তির প্রভাব। হজরতে শায়েখ প্রত্যেক সবকে ধ্যান দিতেন। এই কারণেই তিনি মাকতুবাতের শুধু হাফেজই নহেন বরং আল্লাহপাক এই কিতাবের মূল্যবান উপদেশ ও বিশেষ বিশেষ স্থানের ভেদ ও ব্যাখ্যা বিশেষ করিয়া তাঁহার অন্তরে আমানত রাখিয়াছেন।

হজরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রঃ) এর একজন খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ বাকের লাহরী সাহেব মাকাতীরে সিত্তার সার কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি নকশবন্দী সিলসিলার পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহা ছাপা হইয়াছিল আমাদের হজরতের লিখিত টিকা সহ অমৃতসরে মাওলানা নূর আহমদ সাহেব মরহুমের ব্যবস্থাপনায়। তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি বক্তব্যের এবং প্রত্যেকটি মাস্য়ালার সূত্র টিকার মধ্যে এমনভাবে প্রদান করিয়াছেন যে, উহা মাকতুবাতের কোন খন্ড এবং কোন অধ্যায় হইতে নেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। এতদ্বারা আলা হজরতের হাফেজে

মাকতুবাত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি দক্ষ হাফেজও কেননা কোন হাফেজই তাঁহার ন্যায় কুরআনের সকল আয়াতের স্থান সঠিকভাবে বলিতে পারে না।

হাদীসের পাঠ

আমি এই নগণ্য লেখক গত বৎসর খানকা শরীফে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম আলা হজরত তিরমীজী শরীফ পাঠদান শুরু করিয়াছেন। বেশ কিছু সংখ্যক সনদপ্রাপ্ত আলেম পাঠগ্রহণে শরীক হইতেছেন। বস্তুতঃ হাদীস বর্ণনা সম্পর্কে বিতর্ক, বর্ণনার সঠিক নিয়ম, মাজহাবসমূহের উপর আলোচনা এবং হাদীসের আলোকে ধর্মীয় বিধান নির্ণয় ইত্যাদির উপর তিনি এরূপ অনুসন্ধানমূলক ও সূক্ষ্ম বর্ণনা দিতেন যাহা শুনিয়া আমরা নবীর প্রতি দরুদ এবং আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করিতে বাধ্য হইতাম। মাওলানা গোলাম রসূল যিনি স্বয়ং বহুবার সিহাসিত্তা পড়াইয়াছেন, বলেন যে, এইরূপ তাহ্কীকের সহিত পাঠ দান হিন্দুস্তানের খুব কম মাদ্রাসাতেই হইয়া থাকে। একদিন কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, বোখারী শরীফের হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শীয়া, খারেজী, ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকও আছে নাকি? তিনি বলিলেন, অবশ্যই আছে কিন্তু ইহার দ্বারা সহীহ্ বোখারীর মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা দেয় নাই। সেই সময়কার শীয়াগণ বর্তমান যুগের শীয়াদের ন্যায় ছিলেন না। তাহারা বাড়াবাড়ি করিতেন না। হিংসুক ও সম্প্রদায়িক ছিলেন না। এক্ষণে তাহাদের এবং ইহাদের মধ্যে শুধু নামেরই সম্পর্ক আছে।

অতঃপর তিনি বলিলেনঃ যেক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচারের বেলায় রাফেজী ও খারেজীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং হাদীস বর্ণনা হইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না কেন? তিনি আরও বলিলেনঃ বর্তমানে আমাদের দেশে পরস্পরকে কাফের বলার সাধারণ একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। সামান্য সামান্য ব্যাপারে একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফের আখ্যায়িত করিতেছেন। সেই সময়ের শীয়া ও খারেজীগণ এরূপ সাম্প্রদায়িক ও বাড়াবাড়িপ্রিয় ছিল না। সেই বরকতময় জমানার মুসলমানগণ অপর মুসলমান ভাইকে চট করিয়া কাফের সাব্যস্ত করিতেন না।

অতঃপর হজরত স্মিত হাস্যে বলিলেনঃ এখনকার সময়ে সম্ভবত এজন্য তাড়াহুড়া করিয়া পরস্পরকে কাফের বলা হইতেছে যে, মুসলমানদের সংখ্যা এখন বাড়িয়া গিয়াছে। অতীতে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তাই সংখ্যালঘু হওয়ার ভয়ে তাহারা কাহাকেও কাফের সাব্যস্ত করিত না। পক্ষান্তরে, বর্তমানে সামান্য সামান্য অপরাধের সাথে সাথেই কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়। এই কারণে এখন কুফুরীর

গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কাহাকেও কাফের বলা হইলেও তাহার কোন দুঃখবোধ হয়না।

লেখক বলিতেছেনঃ একদিন শিক্ষাগ্রহণের সময় আমি বলিলাম যে, ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন যে, যখন কোন সহীহ্ হাদীস আমার কথার বিপরীত পাও তখন হাদীসের উপর আমল কর এবং আমার কথাকে বাদ দাও। অথচ ইহার উপর কেহ আমল করেনা। আলা হজরত বলিলেনঃ আমল করা উচিৎ এবং একান্তই উচিৎ। কিন্তু ইহার জন্য হাদীস বুঝা এবং ফেকাহ্ জানা প্রয়োজন এবং যে ব্যক্তি এইসব গুণে গুণবান তাহার উচিৎ হাদীসকে ফেকাহ্ হইতে অগ্রগণ্য মনে করা।

শান্ত স্বভাব

উত্তম চরিত্র এবং মনোরম ব্যবহার তাঁহার মেজাজের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধাসিধা কথাবার্তা এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ব্যতীত অন্য সর্বপ্রকার আলোচনা সবসময় স্মিত হাস্যে করিতেন। রূপকের মাধ্যমেও আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি আমাকে কুতুবখানার তালিকা লেখার আদেশ দিলেন এবং পূর্বের তালিকা দেখাইয়া বলিলেনঃ এইটা অমুক মাওলানা সাহেব লিখিয়াছিলেন কিন্তু ঠিক হয় নাই। শুধু কিতাবের নাম লিখিয়াছিলেন এবং এত বড় কুতুবখানাটিকে মাত্র ২৫/৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে গুটাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আর্জি পেশ করিলামঃ হুজুর! ইহাতো তিনি এক প্রকারের গুণের কাজ করিয়াছেন। একটি সমুদ্রকে তিনি লোটার ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমার আর্জি শুনিয়া স্মিতহাস্যে তিনি বলিলেনঃ এই গুণ গ্রহণযোগ্য নহে বরং এখানে সরিষার পাহাড় গড়িয়া তোলা প্রয়োজন ছিল।

মাওলানা নূর আহমদ সাহেব একজন সুপন্ডিত আলেম এবং দারুল উলুম দেওবন্দের সনদপ্রাপ্ত ও তৎকালীন দেওবন্দের একজন বিজ্ঞ শিক্ষকের মুরীদ ছিলেন। সেই সাথে তিনি ঐ সকল জান্নাতবাসীদের উত্তম আদর্শ ছিলেন, যাহাদের কর্ম ও কথা সকলের জন্য আদর্শস্থানীয় ছিল। একবার তিনি উপস্থিত হইলে হজরত আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া বলিলেনঃ এই মাওলানা সাহেব একজন সম্মানিত আলেম। ক্লাশে একজন অতি আপন শিক্ষক এবং বন্ধুদের মহাফিলে আনন্দদায়ক (ঠিক ইয়াকূত পাথরের ন্যায়)। আমি আলা হজরতের খানকা শরীফে অবস্থানকালে আমার লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে তালীমুন নিসার প্রত্যেকটি খন্ড তাঁহাকে দেখাইলাম। দেখিয়া তিনি যারপর নাই খুশি হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ প্রথম কিতাবের পূর্বে কায়েদার প্রয়োজন ছিল না? আমি বলিলাম, কায়েদা ছাপান হইয়াছে কিন্তু আমি তাহা আনি নাই। তখন আ'লা হজরত বলিলেনঃ তাহা হইলে এইটা একটা বেকায়দার কাজ হইল।

একবার আলা হজরতের জন্য জুতা প্রস্তুত হইয়া আসিল। জুতা জোড়ায় জরীর উত্তম কারুকার্য ছিল। কিন্তু জুতার আসল গঠন তাঁহার পছন্দ হয় নাই। তাই বলিলেনঃ 'তউকে জরী হামাদর গরদানে খরে বিনাম" অর্থাৎ জরীর মালাগুলি মনে হইতেছে গাধার গলায় পড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ধৈর্য ধারণ ও স্থিরতা

পর্বতের বিরাটত্ব এবং উহার স্থিরতা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কিন্তু তাহা মানুষের হস্তক্ষেপের দ্বারা খন্ড বিখন্ড এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া হইতে রেহাই পায় না। তেমনই আমাদের হজরতের ব্যক্তিত্ব ও বিরাটত্ব সাধারণ মূর্খ্য ও অভদ্র মানুষের মনকে ঘায়েল করিতে সক্ষম। আমি বহুবার দেখিয়াছি যে, যখন কোন খাদেমের উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা উদাসীনতা দেখা দিয়াছে যাহা অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ ঘটায় তখনও তিনি সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া হাসিয়া হাসিয়া রূপকথার ন্যায় এইরূপ কিছু বলিতেন যাহাতে খাদেমের অন্তর ব্যথিত না হয়। অথচ বিবেকবানগণ বুঝিতে পারিতেন যে, ইহা সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারীও বটে। কিন্তু অবুঝদের দৃষ্টিতে ইহা ঠাট্টা মশকারীর ন্যায়। আবার কখনও কখনও তিনি সাধারণ মানুষের মত অসন্তুষ্ট হইতেন তবে তাহা অনুভব করা সহজ ছিল না। কোন বিশিষ্ট মনস্তত্ববিদ বিবেক ও অনুভবের মাধ্যমে এই অসন্তুষ্টির অবস্থা এইরূপ অনুভব করিবেন যে, অসন্তুষ্টির ও মলিনতার একটি অতি হালকা মেঘ উজ্জ্বল চাঁদের উপরে ছায়াপাতের সাথে সাথে উবিয়া গেল।

আতিথেয়তা এবং খাদেমদের প্রতি সুদৃষ্টি

আ'লা হজরত তাঁহার মেহমানদের আরামের প্রতি বড়ই খেয়াল রাখিতেন। তাঁহাদের থাকা খাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা খুবই সুচারুরূপে করিতেন। খানকার জাকেরীনদের অনেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তরীকার সবক পূর্ণ করার জন্য অবস্থান করিতেন। তাহাদের জন্য সহজ ও সাধারণ পোষাক এবং সাদাসিধা খাবার প্রদান করা তরীকার নিয়ম ছিল। তাহারা ব্যতীত যে সকল বিশিষ্ট মেহমান কিছুদিনের জন্য দরগাহ শরীফে উপস্থিত হইতেন তাঁহাদের মেহমানদারী জিয়াফতের ন্যায় প্রচলিত নিয়মানুযায়ী করা হইত। কিন্তু নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট সময় সাধারণ মেহমান হোক কিংবা বিশিষ্ট মেহমমান হোক হজরতের ধ্যানের সাগর হইতে সকলেই সমান লাভবান হইতেন। তাঁহার স্নেহ, আদর এবং সহানুভূতি সকলের জন্যই

সমান থাকিত। একদিন আমি বলিলাম, হজরত! আমি মাকতুবাত শরীফ ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণটা পড়িতে চাই। আপনি অমৃতসরে চিঠি লিখিয়া দিলে হজরতের খাতিরে হয়তবা কম দামে পাওয়া যাইবে। জবাবে তিনি বলিলেনঃ টাকা খরচ করিবার কি প্রয়োজন। এখানকার কুতুবখানায় ৫ খন্ড রাখা আছে তাহার এক খন্ড পড়ার জন্য আপনি নিয়া যান। আমি আরজ করিলাম, হজরত! আমার কুতুবখানাতেও তাহা থাকা দরকার। হজরত বলিলেনঃ ভাল কথা, চিঠি লিখিয়া দিব। কিছুক্ষণ পরে তিনি খাদেম পাঠাইয়া আমাকে ডাকাইলেন এবং মাকতুবাত শরীফের একটি চমৎকার কপি, যাহা চার খন্ডে চামড়া দিয়া বাঁধানো, আমাকে দিয়া বলিলেনঃ হজরত মির্জা জান জামান (রঃ) তাঁহার মুরীদ হজরত মাওলানা নাইমউল্লাহ ভরাভিকে বিদায়ের সময় মাকতুবাত শরীফের একটি কপি দান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহা আমার পক্ষ হইতে তোমার জন্য হাদিয়া স্বরূপ এবং সর্বদা ইহা পাঠ কবিরে।' আমি মির্জা সাহেবের সমকক্ষ নই। তবে এই কথা আমিও বলি যে, আমার পক্ষ হইতে আপনার জন্য একটি হাদিয়া এবং ইহা সবসময় পড়িবেন।

মিস্ত্রী জহুর উদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেন যে, তিনি খানকার মসজিদের ছাদের নীচে আস্তর করিতেছিলেন। হঠাৎ আস্তরের বেশ কিছু অংশ খসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। ভিজা বালু ও চুনামাটি তাঁহার উপর পড়িল এবং তিনি ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। লোকজন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া চৌকির উপর শোয়াইয়া দিল। আলা হজরত তাশরীফ আনিয়া দেখিলেন, তিনি জবেহ্ করা মুরগীর ন্যায় ছটফট করিতেছেন। লোকেরা বলিল যে, চোখ মনে হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও না হইয়া থাকিলে অবশ্যই হইবে। এই অবস্থায় কোনভাবে ব্যথা একটু কমিলেও যথেষ্ট। মিস্ত্রি সাহেব বলিলঃ তখন আমার মাথায় এরূপ প্রচন্ড ব্যাথা হইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন কোন হাতিয়ার দ্বারা আমার মাথা চুরমার করিয়া দেওয়া হইতেছে। আলা হজরত বলিলেনঃ তাড়াতাড়ি ইনাকে কোন হাসপাতালে নিয়া যাও এবং যত টাকাই খরচ হোক, বিনা দ্বিধায় চিকিৎসা করাও। মিস্ত্রী সাহেব তখন বলিলেনঃ হুজুর। ব্যথা ও কষ্ট সব সহ্য করিতে রাজি আছি, কিন্তু আপনার নিকট হইতে দূরে যাইতে রাজি নই। ইহার পর হজরত কয়েকবার তাঁহার অবস্থা জানার জন্য তশরীফ আনেন। একবার এক খাদেমের মাধ্যমে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে মিস্ত্রি সাহেব বলিলেন, আমার ব্যথায় কষ্ট হয় ঠিকই, কিন্তু বারবার হুজুরের এখানে আসার জন্য তাহা অপেক্ষা বেশী কষ্ট অনুভব করি। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথেই হজরতের স্নেহের সাগরে জোস আসিল এবং সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হইল যাহার কোন সময় নির্দিষ্ট নাই।

আলা হজরত দোয়ার জন্য হাত উঠাইলেন এবং দোয়া কবুল হওয়ার আগে হাত নামাইলেন না। মাওলানা মুগীস উদ্দিন সাহেব মিস্ত্রী সাহেবের নিকট দৌড়াইয়া গেলেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে, হুজরত দোয়া করিতেছেন। আপনি বলুন, আপনার অবস্থা কিরূপ? মিস্ত্রী সাহেব বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি একেবারে ভাল হইয়া গিয়াছি। ব্যথার লেশমাত্র নাই এবং চোখও ঠিক হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার পরই মিস্ত্রী সাহেবকে পূর্বের ন্যায় মাচাং এর উপর বসিয়া কাজ করিতে দেখা গিয়াছে।

আলা হুজরতের বিশিষ্ট ভক্ত, মুরীদ ও খলীফাগণ সান্নিধ্যের ফয়েজ হাসিল করিতে থাকিতেন। তিনি সকলের সহিত সম্মান রক্ষা করিয়া কথা বলিতেন এবং অতি যত্ন সহকারে তাহাদের খোঁজ খবর নিতেন। বিদায়ের সময় সর্বদা যোগ্যতা অনুযায়ী কাহাকেও দাঁড়াইয়া মোসাফা ও মোয়ানাক্বার সহিত, কাহাকেও খানকার বাহির পর্যন্ত যাইয়া এবং কাহাকেও আরো দূর পর্যন্ত সহগমনপূর্বক বিদায় করিতেন। খানকা শরীফ হইতে কুন্দিয়া রেল ষ্টেশন পর্যন্ত তিন মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল। এ–কারণে আমার মত দুর্বল খাদেমদের জন্য তিনি মেহেরবানীপূর্বক সওয়ারীর ব্যবস্থা করিতেন।

ইতিপূর্বে আমাদের বিভিন্ন এলাকায় সফরের কথা উল্লেখ করিয়াছি। একবার কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হইল। মালপত্র উটের উপর তোলার পর হুজরতের বিশেষ ঘোড়াটি প্রস্তুত করিয়া আনা হইল। আমাকে বলা হইলঃ তুমি এখন এই ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ষ্টেশনে চলিয়া যাও। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব সাথে যাইবেন এবং তিনি ঘোড়া ফেরত নিয়া আসার পর আমি তাহার উপর সওয়ার হইয়া আসিব।

লেখক (মূল উর্দু কিতাবের) এরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ আমার একেতো হুজুরের ঘোড়ার উপর সওয়ার হইতে সাহস হইতেছিল না, তদুপরি প্রথম সফরে কয়েকমাইল তাঁহার সহিত এক সাথে চলার সম্মান হইতে বঞ্চিত হওয়াও ভাল লাগিতেছিল না। এই কারণে বলিলামঃ আমিও বালুর দেশের বাসিন্দা এবং বালুর মধ্যে পায়ে হাঁটার অভ্যাস আছে। অন্যান্য খাদেমের সহিত হুজুরের তত্ত্বাবধানে পায়ে হাঁটিয়া চলাই পছন্দ করিতেছি। তিনি বলিলেনঃ না, না, দেরী করিও না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়। অতঃপর আমি বাহিরে যাইয়া একজন বিশেষ খাদেমকে বলিলাম যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাকে তাঁর সাথে চলার অনুমিত আনিয়া দিন। তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে স্বয়ং আপনার অনুরোধ করাই ভাল হইবে। অতএব আমি পুনরায় আপত্তি করিলাম। আলা হুজরত এখন শান্তভাবে বলিলেনঃ কেন শুধু শুধু বিলম্ব করিতেছ, উঠিয়া পড়। এই অবস্থায় আদেশ পালনে বিলম্ব করা কঠিন ছিল, কেননা আল আমরু ফাওকাল আদব অর্থাৎ আদেশ পালন করাই প্রকৃত আদব। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব আমাকে ষ্টেশনে

পৌঁছাইয়া ঘোড়া ফেরত নিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে আলা হজরত প্রায় অর্ধেক পথ পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন।

খোশাবে তিনি একরাত্র অবস্থান করিলেন। চা খাওয়ার সময় হইলে মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব (যিনি এ–জাতীয় খেদমতের তত্ত্বাবধানকারী) উপস্থিত ছিলেন না। আলা হজরত স্বয়ং তাঁহার বরকতময় হস্তে চা বসাইয়া প্রথমে খাদেমদিগকে এবং পরে উপস্থিত সকলকে পান করাইলেন। অতঃপর নিজে পান করিলেন। আমরা এই কাজে সহযোগিতার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সকল কাজ তিনি নিজেই সমাপ্ত করিলেন এবং বলিলেনঃ মাওলানা, আমি খুব ভাল চা বানাইতে পারি, হজরত মাওলানা সিরাজ উদ্দিন মরহুমের জন্য আমিই চা বানাইতাম।

খোশাব জামে মসজিদের দেয়ালগাত্রে আমি একটি চমৎকার ছাপান নকশা লাগান দেখিয়াছি। উহাতে বিভিন্ন যুদ্ধের শহীদদের নাম বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। মাওলানা ফাতেহ্ দ্বীন সাহেব (খোশাবী) তাহার লেখক। আমার খুব পছন্দ হইল এবং দ্বিতীয় দিন একজন ছাত্রকে আমি একটি টাকা দিয়া বলিলাম, এই রকম একটি তালিকা লেখকের নিকট হইতে কিনিয়া আন। হজরত শুনিয়া ঐ ছাত্রকে বলিলেনঃ আমার কথা বলিও। আমার একটি তালিকার প্রয়োজন। যদি দাম চান তবে দাম দিয়া আসিও। ছাত্রটি তালিকা নিয়া আসিয়া বলিল, লেখক কোন দাম চাহিলেন না।

মালিকওয়াল হইতে ডেরার দিক যাওয়ার গাড়ীতে আমরা মাগরীবের সময় উঠিলাম। চায়ের সময় পার হইয়া গিয়াছিল। মাওলানা আমমদ দ্বীন সাথে ছিলেন। তিনি বলিলেন, হজরতের জন্য গাড়ীতেই চা প্রস্তুত করা হউক। হজরত বলিলেনঃ আমার কিন্তু চায়ের তেমন প্রয়োজন নাই; যদি আপনারা খান আমি তাহলে তৈয়ার করিয়া দেই। এই কথা বলার পর পরই তিনি বাক্স খুলিয়া ষ্টোভ বাহির করিয়া উহা জ্বালাইতে শুরু করিলেন। এই সময়ের মধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং আমরা যার যার কামরায় গিয়া বসিলাম। সামনের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে দেখিলাম, হজরত নিজে চায়ের কেটলি এবং দুইটি কাপসহ আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সমন্দরী থানা হইতে আমাদের চিনুটি যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। হজরতের স্থানাদির ব্যবস্থাপনার জন্য একদিন পূর্বে আমার যাওয়ার কথা হইল। বাস ষ্টেশনের দূরত্ব ছিল দুই তিন মাইল। আলা হজরত আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে বাস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে অনেক খাদেমসহ আসিলেন এবং বলিলেনঃ সামনের দিকের সিটে ড্রাইভারের নিকটে বসিলে ভাল হইবে। আমার ইচ্ছা ছিল হজরত চলিয়া যাওয়ার পরে সিটে বসিব কিন্তু

তিনি বলিলেন, তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়, জায়গা দখল করিয়া নাও। আমাকে সিটে বসাইয়া দিয়া তিনি বিদায় নিলেন।

উদাসী হৃদয় মানুষ, আমাদের কথা বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত শুধু প্রকাশ্য অনুগ্রহ দ্বারাই স্থায়ী খাদেম ও ভক্তদের সাহস বৃদ্ধি করেন না, বরঞ্চ তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অনুযায়ী উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে একইরূপে তাদের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। তাঁহার প্রকাশ্য অস্তিত্ব তাঁর মুরীদদের জন্য কল্যাণকর তো বটেই, তদুপরি তাঁর অসাক্ষাতেও বিশেষ বিশেষ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যেও তাঁহার তত্ত্বাবধান থাকে।

ফাজেলে দেওবন্দ মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা হাকীম আব্দুর রসুল সাহেব ও আরো কয়েক জনের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, মাওলানা আহমদ দ্বীন সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী আমীর হায়দার সাহেব একবার এক রেলগাড়ীতে আরোহন করিলেন। গাড়ীতে অনেক ভিড় ছিল। একজন হিন্দু যাত্রী পা পিছলাইয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তিনি তাহাকে একটু ধাক্কা দিলে সে সামনের বেঞ্চির উপর পড়িল এবং বুকে আঘাত লাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। এই ব্যাপারে ভীষন গোলোযোগ হইল। জনতা আমীর হায়দার সাহেবকে ঘিরিয়া ধরিয়া এলোপাথারি মারধর শুরু করিল। অতঃপর টানা হেঁচড়া করিয়া তাঁহাকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করিল। খুনের ঘটনা, তদুপরি হিন্দু মুসলমানদের প্রশ্ন, তিনি বড়ই কঠিন অবস্থায় সম্মুখীন হইলেন এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় কাঁদিতে লাগিলেন। এই অপমান ও বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। পরের দিন খুব ভোরে হাজত খানার সিপাহিকে এক লোক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমীর হায়দার নামে এখানে কোন হাজতী আছেন কি? সে বলিল হ্যাঁ আছে। আসলে ঐ ব্যক্তি সরকারী ডাক্তার ছিলেন, যিনি মারধর ও এই ধরণের আঘাতের জন্য রিপোর্ট করিতেন। তিনি সোজা ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং কাজী সাহেবের নিকট কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি কাহার মুরীদ এবং তাঁহার নাম ঠিকানা কি? কাজী সাহেব সব কিছু বলিয়া দিলেন। তখন ডাক্তার সাহেব সব বুঝিতে পারিলেন এবং কাজী সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। নিহত ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল। সামান্য আঘাতও তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। সুতরাং তাহার হত্যাকারী আপনি নন বরং তাহার নিজস্ব রোগ। এই দুর্ঘটনাই তাহার হত্যাকারী। আপনি নিরাপরাধ। আমি আমার বিস্তারিত মতামত লিখিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইনশা আল্লাহ

আপনি নির্দোষ প্রমাণিত হইবেন। তবে কয়েকদিন আপনাকে হাজতে থাকিতে হইবে এবং দুই চারটা তারিখে হাজির হইতে হইবে। এই কয়েকদিনের কষ্টকে আপনি ধৈর্য্য এবং নীরবতার সহিত সহ্য করিয়া নিন ও শান্ত থাকুন। অতঃপর সেই ডাক্তার সাহেব আরো বলিলেনঃ গতরাত্রে দুইজন বুর্যুগ ব্যক্তিকে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একজন মধ্যম বয়সী, অপর একজন বয়স্ক। মধ্যম বয়সী বুযুর্গ বলিলেন যে, আমাদের একজন মুরীদ আমীর হায়দার নামে বন্দী হইয়াছেন। তুমি তাহাকে সাহায্য কর। আমি বুযুর্গের নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তাহারা আমাকে যে ঠিকানা এবং পরিচয় বলিয়াছেন আপনি তাহাই আমাকে বলিলেন। অতঃপর আমি আরজ করিলাম এই দ্বিতীয় বুযুর্গ ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, ইনি হজরত মুজাদ্দেদে আল ফেসানী (রঃ)। ইতিমধ্যে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সাবধানতা অবলম্বন করা এবং বিশেষ অবস্থা অপ্রকাশিত রাখা

উৎসাহ প্রদান কিংবা প্রশিক্ষণ হোক, শিক্ষা প্রসংগে আলোচনাই হোক, অথবা অবস্থা বর্ণনা কিংবা ভেদ বর্ণনা হোক, সব কিছুর মধ্যেই হজরত পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। এরূপ কোন কথা মুখ হইতে বাহির করা তিনি পছন্দ করিতেন না যার উপর আপত্তি উঠিতে পারে কিংবা লোকদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় অথবা জন সাধারণের মধ্যে ভুল ধারণা দেখা দেয় এবং যাহা শুধু শুধু বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। আল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কতলে, অর্থাৎ বিশৃংখলা হত্যার চাইতেও মারাত্মক।

বাইয়াত গ্রহণ করার পর প্রথম বার যখন আমাকে তিনি চুপে চুপে জিকির করার নিয়ম বলিলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সময় কোন কিছুর ধ্যান করিতে হইবে কি? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ না না, কোন ধ্যান করিতে হইবে না। কয়েকদিন পরে আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম জিকিরের মধ্যে ভয়ভীতি হইতে আশ্রয় পাইতেছি না। তিনি বলিলেনঃ ঐ সময় যদি এই খেয়াল কর যে, আমি আমার পীরের সম্মুখে বসিয়া আছি তাহা হইলে ভয় ভীতি দূর হইতে পারে। তারপর আমি খানকা শরীফে উপস্থিত থাকা অবস্থাতেই পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিলেনঃ পীরের খেয়ালই তরীকার যোগ্যতা অর্জনের জন্য সব চাইতে বেশী প্রয়োজন। মুরীদগণ অবশ্যই জানেন যে, পীরের ধ্যান সব সময়ই জায়েজ এবং খুবই উত্তম কাজ। কিন্তু বিষয়টি বিতর্কিত ব্যাপারও বটে। যাহোক, উপরের বর্ণিত ঘটনার দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, একজন নূতন মুরীদকে এই সমস্ত শিক্ষার সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তোলার জন্য যে ধারাবাহিকতার অনুসরণ

করা হইয়াছে, তাহা খুবই বিজ্ঞানসম্মত এবং সাবধানতাপূর্ণ ছিল। শিক্ষা এবং বুঝানোর ব্যাপারে এবং উপদেশ ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অন্বেষণকারীর পুরাতন অভ্যাস ও কর্মের প্রতিও বিবেচনা করা হইত। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করানোর জন্য কোনরূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিতেন না। একবার আমাকে বলিলেনঃ তরীকার প্রাথমিক মুরীদদের জিকিরের উপর জোর দেওয়া উচিৎ। এবাদতের মধ্যে শুধু ফরজ, ওয়াজীব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদী আদায়ের নিয়ম মানিয়া অবশিষ্ট সকল নফল ও মুস্তাহাব আমল এবং ওজীফা পাঠের সময়ও জিকিরের জন্য ব্যয় করা উচিৎ। তবে তাহাজ্জুদের নামাজ ছাড়া উচিৎ নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের বিষয় আপনার কি নির্দেশ? তিনি বলিলেনঃ সব কিছুই ইহার ভিতরে আসিয়া গিয়াছে।

এই ইশারা অনুযায়ী কয়েকদিন পর আমি বলিলাম, কোন কোন ওজীফা আমি পূর্বে পাঠ করিতাম। বর্তমানে তাহা সব ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু রোজ পৌনে এক পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে এবং ফজরের নামাজের পর সূরায়ে ইয়াসিন পাঠের অভ্যাস আমার বহুকাল হইতে। অতএব উহার জন্য অনুমতি দিতে মর্জি হোক। তিনি বলিলেনঃ ঠিক আছে, তিলাওয়াতের জন্য সময় করিয়া নিবে এবং সূরায়ে ইয়াসীন তাহাজ্জদে পড়া আরো উত্তম হইবে। আমি বলিলাম, আমার একটি খারাপ অভ্যাস আছে। তাহা এই যে, যে সকল সূরা এবং কেরাত ওজিফারূপে তাড়াতাড়ি পড়ার অভ্যাস করিয়াছি, তাহা নামাজের মধ্যে কেরাত করিয়া পড়িতে পারি না এবং যে রুকু ও সুরা নামাজের মধ্যে পড়ার অভ্যাস, তাহা কোন প্রয়োজনের সময় নামাজের বাহিরে পড়িতে পারি না।

তিনি স্মিত হাস্যে বলিলেনঃ ঠিক আছে, এইভাবেই পড়িও। অতঃপর আমি বুঝিতে পারিলাম যে, হজরত যে কথা প্রথমে বলেন, তাহা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা উচিৎ। এই বিষয় কোন আপত্তি করা অথবা বিবেচনা করিতে বলা উচিৎ না; কারণ, তাঁর মেজাজ মোবারকের মধ্যে কড়াকড়ির নাম গন্ধও নাই। কোন কিছু মনে না করা এবং সম্পর্ক ভাল রাখার অভ্যাস তাঁহার পুরাপুরিভাবে আছে। আপত্তি যুক্তিসংগত হউক অথবা অযৌক্তিক হউক, এই দরবারে কখনই উহার অস্বীকৃতি নাই। অথচ কোন একান্ত জরুরী কাজ ইতস্ততা ও বিবেচনার আওতায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার উপর আমল করিবার সুযোগ হয় নাই, এমন কখনও দেখা যায় নাই।

দেওবন্দী এবং বেরেলবী আলেমদের মতবিরোধ সর্বজনবিদিত ছিল। থল অঞ্চলে একটি খান পরিবারের দুইটি সুফী দলের মধ্যে এমন কঠিন মতানৈক্য বিস্তৃতি লাভ করে যাহা বর্তমান যুগের যে কোন মতানৈক্যকে ছাড়াইয়া যায়। একদিন হজরতের

নামে কোন এক দলের একজন মাওলানা সাহেবের চিঠি আসিল। চিঠির সব কথা আমার স্মরণ নাই, তবে সার কথা এই ছিল যে, অমুক মাওলানা সাহেবের কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে হাজের ও নাজের এবং স্থিরভাবে ও নিঃশ্চিন্তে হুজুর (সঃ) কে প্রয়োজন পূরণকারী মনে করেন। আপনি তাহার এই বক্তব্য সমর্থন করেন কিনা? হজরত চিঠি পড়িয়া বলিলেনঃ দেখুন, ইহারা শুধু শুধু আমাকেও তাহাদের সৃষ্ট অশান্তির মধ্যে জড়াইতে চাহিতেছে। যদি এ চিঠির উত্তর দেই, তাহা হইলে আমাকে যে-কোন একটি দলের সমর্থন করিতে হইবে। অথচ দলাদলি হইতে আমি শত মাইল দূরে থাকি। আমি বলিলাম, হজরত, ইহার উত্তম চিকিৎসা হইল চিঠির উত্তর না দেওয়া। হজরত বলিলেনঃ ঠিকই বলিয়াছেন, উত্তর না দেওয়াই সঠিক চিকিৎসা হইবে।

হজরতের স্বীয় অবস্থা ও যাবতীয় গুণাগুণ প্রকাশ না করার একটি বিশেষ গুণ ছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তাঁহাকে শুধু একজন সাদা পোষাকধারী বুযুর্গ মনে করিত। আর ইলম সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে বড় জোর একজন আলেম এবং মাসয়ালা মাসায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিতেন। কারণ, না আছে এখানে হু- হকের শ্লোগান, না ধ্যানমগ্নের কথাবার্তা, না আছে পোষাকের সাজসজ্জা এবং না আছে জায়নামাজ ও তসবীর প্রদর্শনী। প্রকাশ্যে যাহাই আছে তাহা শরীয়তের শিষ্টাচার অনুযায়ী সাধারণ মুসলমানদের ন্যায় সাদাসিধা অবস্থা। তবে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল উন্নত মানের এবং খানাপিনা ছিল সুসম। দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মের চিন্তাভাবনা তাঁর আছে। এবং সাধারণভাবে সকল ব্যাপারে কথা বলা ও শোনাও আছে। ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে তিনি আছেন, আলোচনাতে আছেন এবং মতবিরোধ কাজের মধ্যে কিছুটা তর্ক বিতর্কও তাঁর আছে।

একবার কথা প্রসংগে তিনি বলিলেনঃ আমার প্রকাশ্যে সূফী সাজিতে লজ্জা করে। এমনকি সব সময় তাসবীহ হাতে হাঁটা-চলাও পছন্দ হয় না। আরো বলিলেনঃ আমাদের পীর ও মুরুব্বীদের অভ্যাস এই ছিল যে, তাঁহারা সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং নিজেদের মধ্যে বেশী পার্থক্য সৃষ্টি করিতেন না। অতঃপর বলিলেনঃ আমি একবার মুসাযায়ী শরীফের দিকে যাইতেছিলাম। আমি সরকারী চাকুরীজীবিদের ন্যায় পোষাক পরিয়াছিলাম। পথে কয়েকটি গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা আমার ভক্ত ছিলেন। সন্দেহ ছিল না যে, তাহাদের সহিত দেখা হইলে তাহারা আমাকে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবে। আমি অশ্বারোহী অবস্থায় কাহারো দিকে না তাকাইয়া চলিয়া গেলাম। কেহ আমাকে চিনিতে পারে নাই, মনে করিয়াছে যে, তশিলদার সাহেব যাইতেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ শফী সাহেব (গঞ্জেইয়ালী) বর্ণনা করেন যে, একবার আলা হজরত খোশাব শহরের বাজার দিয়া যাইতেছিলেন, পিছনে ছিল ভক্তদের একটি দল। দোকানদারগণ এই মিছিল দেখিয়া সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, ইনি কোন নেতা? আমি বলিলাম, ইনি আমাদের পীর সাহেব। বস্তুতঃ কুন্দিয়া এবং খোশাবের মধ্যে এমন কোন দূরত্ব ছিল না যে, এখানকার একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি ওখানে অপরিচিতি হইবেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকারের ঘটনাবলীর মধ্যে আলা হজরতের কঠোরভাবে নিজের পরিচয় গোপন করারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এমন কি, তাঁর ভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে সঠিকরূপে চিনিতে পারিতেন না।

গত সফরে যখন আমি হজরতের সহিত খোশাব ষ্টেশন হইতে শহরের দিকে রওয়ানা করিলাম তখন মাওলানা মুহাম্মদ শফী সাহেবের মুরীদগণ একের পর এক আসিতেছিলেন এবং তাহার হাঁটু এবং হাত স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন। কিন্তু ইহা কেহই খেয়াল করিতে পারেন নাই যে, পার্শ্বেই তাহাদের দাদা পীর রহিয়াছেন এবং প্রথমে তাঁহাকেই সম্মান করা উচিৎ।

আলা হজরতের যোগ্য খলীফাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ শাহ সাহেব নামে একজন পীর ছিলেন। এরূপই তাঁর উচ্চাসন ছিল যে, তিনি ইন্তেকাল করিলে আলা হজরত বলিলেন যে, যদি আবদুল্লাহ শাহ সাহেব জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে আমার মৃত্যুতে কোন কষ্ট হইত না। আব্দুল্লাহ শাহ সাহেব মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সকল মুরীদকে এই উপদেশ দিয়া যানঃ আমার মৃত্যুর পর আমার সকল মুরীদ যেন খানকা শরীফে গিয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হয়।

আলা হজরতের মুরীদদের অন্যতম সূফী জান মুহাম্মদের অন্তরে দুইটি প্রশ্ন বা দ্বিধা। একটি এই যে, আলা হজরত মালদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি হজ্বব্রত পালন করেন নাই কেন। দ্বিতীয় এই যে, তাঁহার নিসবত (সম্পর্ক) হইতে মরহুম সিরাজ উদ্দিন এর নিসবত অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল বলিয়াই তিনি এত প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আলা হজরত এইরূপ প্রসিদ্ধ নহেন। এই দুইটি প্রশ্নের বা দ্বিধার কারণে সূফী জান মুহাম্মাদ সাহেব খানকা শরীফে উপস্থিত হইতেছিলেন না। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহাকে কেহ ডাকিয়া বলিতেছেনঃ তোমার উভয় প্রশ্ন বা দ্বিধাই ভুল এই জন্য যে, হজরত হজ্জ পালন করিয়াছেন এবং তার তরীকার নিসবতও অনেক শক্তিশালী। আর অত্যধিক প্রতিষ্ঠালাভ না করার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি তাঁহার নিজ পরিচয় গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। আর এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এভাবে লাভ করিবেঃ তুমি খানকা শরীফে গমন করিয়া হজরতের বাড়িতে একটি চুলা দেখিতে পাইবে। যেভাবে

চুলাটি প্রত্যক্ষ করিবে ঠিক সেই ভাবেই অন্যান্য খবরও তুমি সঠিক মনে করিবে। সুফী সাহেব ঘুম হইতে জাগরিত হওয়ার পর অন্তরে খানকা শরীফের জিয়ারতের ও উপস্থিতির আগ্রহ দারুনভাবে অনুভব করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি রওয়ানা হইলেন। কাছাকাছি পৌছিলে আলা হজরতের ঘরে অদ্ভুতভাবে একটি চুলা দেখিতে পাইলেন। ইহা দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর তাঁহার মনের যাবতীয় সন্দেহ দূর হইয়া গেল এবং তাঁহার অন্তরে একটি প্রশান্ত ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। সবই আল্লাহ পাকেরই মেহেরবানী। সুফী সাহেব এক সময় খানকায় আসিতে ইতস্তত করিতেছিলেন। কিন্তু আসিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। মাত্র দুই বৎসরকাল সেখানে অবস্থান করার পর তিনি নিউমুনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। দুই তিন দিন অসুস্থ থাকিয়া আল্লাহ আল্লাহ জিকির করিতে করিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ওলীত্বের ও নবুওয়াতের পরিপূর্ণতা

হজরতের বাহ্যিক অবস্থায় জনসাধারণ হইতে পৃথক থাকা একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ মর্তবার মধ্যে ওলী ও নবী এ–দুটির জন্যই অনেক স্তর অতিক্রম করিতে হয়। ওলী যখন ওলীত্বের স্তরসমূহের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকেন তখন উহাকে উপরে উঠা অথবা আরোহন বলা হয়। তখন তিনি মনেপ্রাণে সত্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। সৃষ্ট জগতের প্রতি অমনোযোগী হন। এই কারণেই ঐ অবস্থায় বস্তু জগতের প্রতি তাঁহার তেমন কোন উৎসাহ থাকে না। বরং আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন থাকার প্রবণতা দেখা দেয়। অতঃপর যখন তিনি আল্লাহর বিশেষ অবদান প্রাপ্তির মাধ্যমে সৃষ্টির উপকারের জন্য মানুষকে আদেশ ও উপদেশ দেওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন প্রয়োজনের তাগিদে তাঁহার এই হাল (ভাবালুতা) অবস্থা কিছুটা হ্রাস পায়। এই অবস্থাকে নুজুল অথবা হবুত বলে।

ইহার উর্ধে নবুয়াতের দরজা। তাহাতেও ঐ উভয় প্রকারের অবস্থা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ওলীর আবির্ভাব ও নবীর আর্বিভাবের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ওলীর আর্বিভাব এরূপ অবস্থায় হয় যে তিনি এখনও উন্নতির স্তরসমূহ পুরাপুরিভাবে অতিক্রম করেন নাই এবং এখনও তিনি উর্ধ জগতের দিকে তাকাইয়া আছেন। এজন্য সর্বদা তিনি সৃষ্টির দিকে ধ্যান দিতে পারেন না বরং কখনও কখনও তাঁহার উপর নিমগ্নতা ও নেশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নবীদের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা উন্নতির শেষ স্তরে পৌছিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। এ কারণেই তাঁহারা জানপ্রাণ দিয়া মখলুকের সেবা করিতে সক্ষম হন। তাঁহাদের কখনও নিমগ্ন অবস্থায় দেখা যায় না। এই জন্য ওলী আল্লাহদের ওয়াজদ (বেহুঁশী) ও বিশেষ বিশেষ অবস্থার কথা শোনা যায়। কিন্তু কোন

নবী বা রসুল (সঃ) এর উপর ওয়াজদ বা বেহুঁসী অবস্থা দেখা দিয়াছিল বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। ঠিক এইভাবেই ওলি আল্লাহদের মধ্যেও যে সকল বুযুর্গ ওলীত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছেন, তাঁহারা যেহেতু এখনও উন্নতির পথে আরোহনরত আছেন সেহেতু তাঁহাদের মধ্যে কখনও কখনও আত্মহারা ভাব এবং জযবার ভাব পরিলক্ষিত হয়। আর যে সকল বুযুর্গের ভাগ্যে আল্লাহতা'লা ওলী আল্লাহদের মর্তবার উর্দ্ধে উন্নতি দান করিয়া নবুয়াতের গুণে গুণান্বিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেহেতু বিলায়েতের উন্নতির সর্বশেষ স্তরে পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছেন সেহেতু তাঁহারা মাখলুকাতের দিকে ধ্যান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের আলা হজরতের প্রকাশ্য অবস্থা সাধারণ মানুষের অবস্থা হইতে ভিন্নতর হওয়ার বোধগম্য কারণ ছিল।

মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব (লুধিয়ানুভি) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুন্সী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব আলা হজরতের একজন খাদেম ছিলেন। একবার খানকা শরীফে তশরীফ আনার জন্যে উলওয়ালী ষ্টেশন হইতে রওয়ানা হইলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। পূর্বে তিনি বহুবার খানকা শরীফে আসিয়াছিলেন। তাই অন্ধকারের মধ্যেই রওয়ানা হইলেন। রেল সীমানা অতিক্রম করিয়া তাকাইয়া দেখিলেন যে, খানকা শরীফ হইতে একটি বড় রকমের গ্যাসের উজ্জ্বল আলো দেখা যাইতেছে। তিনি বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কি ভাই খানকা শরীফে গ্যাসের আলোর কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি? কিন্তু কেহ কি তাহা বলিতে পারিল? সেই চক্ষু কজনা আছে যে উহা দেখিবে।

আলা হজরতের মুরীদদের অন্যতম মাওলানা গোলাম রসুল সাহেব প্রখ্যাত আলেম। তিনি বোখারী শরীফ, তিরমিজী শরীফ এবং হেদায়া ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেনঃ আমি একবার খানকা শরীফে যাওয়ার নিয়তে ভুল বশতঃ কুন্দিয়া ষ্টেশনের আগের ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম। তখন রাত্র প্রায় ১২ টা। আমার সাথে আর কেহ ছিল না এবং পথও চেনা ছিল না। অনুমান করিয়া কিছুদূর হাঁটিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং অস্থির হইয়া পড়িলাম। কোনদিকে যাইব এবং কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? ঠিক এই সময় রাত্রির অন্ধকারে আকাশ হইতে ধূমকেতুর ন্যায় লাল বর্ণের একটি উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইল। উহার উচ্চতা জমিন হইতে আসমান পর্যন্ত ছিল। মনে মনে ভাবিলাম ইহা আমাকে পথ দেখাইবার জন্য কোন গায়েবী সাহায্য। সেই আলোর স্তম্ভের দিকেই হাঁটা শুরু করিলাম। দুই–আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করার পর দূর হইতেই খানকা শরীফের বাড়িঘর দৃষ্টিগোচর

হইল। সেই আলোক স্তম্ভ তখন অদৃশ্য হইয়া গেল। অতঃপর বলিলেনঃ আমি আলা হজরতের ইহা অপেক্ষা বড় রকমের কেরামত প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু আলা হজরত তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় বলিলেনঃ আমি কাদেরিয়া নকশ বন্দীয়া এবং চিস্তিয়া তরিকার শত শত বুযুর্গ দেখিয়াছি, কিন্তু আলা হজরতের ন্যায় সুন্নতের অনুসারী, পরোপকারী, চরিত্রবান এবং বুযুর্গীর নমুনা অন্য কোন বুযুর্গের মধ্যে আজ পর্যন্ত দেখি নাই। আমি ফতুহাতে মক্কীয়া, ফসুসুল হাকাম এবং রাসায়েলে কালীমুল্লাহ (জাহার্বাদী) ইত্যাদি অনেক তাসাওউফের কিতাব পড়িয়াছি কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে হজরত ব্যতীত অন্য কাহাকেও পাই নাই।

হাকীম আব্দুর রসুল সাহেব বলেনঃ একবার আলা হজরত খাদেমদের সংগে হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানীর মাজার মুবারকে মুরাকাবা করিতেছিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন খাদেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেহ কিছু লক্ষ্য করিয়াছ কি? উপস্থিত সকলেই তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিলেন। আমি বলিলাম, আমি এই মজলিশে দেখিয়াছি যে, হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী কুদ্দুস সিররুহু তশরীফ আনিয়াছেন এবং তিনি নিজ বরকতময় হাতে আপনার মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়াছেন। হজরত বলিলেন, হ্যাঁ আমার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল।

হাকীম আব্দুর রসূল সাহেব এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব উভয়ে একমত হইয়া বর্ণনা করেনঃ একবার আলা হজরত শোরকোট জংশনে রেলগাড়ীতে উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক পাগল আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, হজরত, আমার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, দয়া করিয়া উহা খুলিয়া দিন। আ'লা হজরত পকেটে হাত দিলেন। তখন সে বলিল, আমার টাকার প্রয়োজন নাই, আমার পথ তিন বৎসর যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে, সেই পথ চালু করিয়া দিন। আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি এবং তিন দিন যাবৎ আপনার অপেক্ষা করিতেছি। অতঃপর সেই পাগল আ'লা হজরতকে একটু দূরে নিয়া গেল এবং একান্তে কিছু বলিতে লাগিল। আলা হজরত চুপ করিয়া স্থিরভাবে সব কথা শুনিলেন। কিন্তু পাগল বার বার সেই একই কথা বলিয়া যাইতেছিল। আলা হজরত একবার বলিলেন, আমি একজন নগণ্য দরবেশ, আমি কি করিতে পারি? পাগল বলিল, না না আপনার মুখের কথাতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। অতঃপর সে হজরতের নাম জানিতে চাহিল। তিনি বলিলেন আহ্মদ খান। ইহা শুনিয়া সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল "আহমদ খান আল্লাহর রহমত"। অবশেষে হজরত বলিলেন, আচ্ছা যাও। সুলতান বাহোর মাজারে যাইয়া আমার সালাম পেশ কর এবং তিন দিন সেখানে অবস্থান কর। ইনশা আল্লাহ তোমার রাস্তা খুলিয়া

যাইবে। পাগল খুশি হইয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরিয়া আসিল। হুজরত তখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছেন। পাগল জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর তিন দিনই কি থাকিতে হইবে?

মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বলেনঃ গাড়ী ৯টায় সেখান হইতে ছাড়িয়া যায়। ৪টায় আমরা সারগোধা জংসনে পৌছাই। মাগরীবের নামাজের পর হজরত চৌকির উপর বসিয়া ছিলেন। আমি তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে ছিলাম। হজরত বলিলেনঃ ঐ পাগলের পথ খুলিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পথ বন্ধ হইয়াছিল কেন? হজরত বলিলেনঃ "মাসলেহাত নিস্তকে আজ পরদাহ্ বরউ উফতাদরাজ"।

অতঃপর বলিলেনঃ ইহাদের সামান্যতম ভুলও আল্লাহর নিকট অপছন্দ।

অন্তর ও দৃষ্টির পরিতৃপ্তি

সকল দ্বীন ও দুনিয়ার কাজকর্ম, বস্তু ও আনুষঙ্গিক উপকরণাদির সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল বুযুর্গ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে "খাকরা বানজরে কিমীয়া কুনান্দ" এর মর্তবা হাসিল করিয়াছেন তাহাদের যখন জীবন যাপনের জন্য দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তখন অলৌকিক শক্তির দ্বারা কার্য উদ্ধার করেন না, কেরামতের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। বরং তাঁহারা স্বীয় ভক্তদের উপঢৌকন ও দানের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন। এখন সেই সকল বুযুর্গ হইতে আরো উন্নত বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হুজুর (সঃ) এর প্রতি লক্ষ্য করুন। তাঁহার এইরূপ মর্তবা ছিল যে, তিনি চাহিলে ওহুদ পাহাড়ও তাঁহার জন্যে স্বর্ণে পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যখনই ইসলামের মুজাহেদীনদের জন্য কাফনের মত গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, তখনই তাহা বেহেস্তের বিনিময়ে মালদারদের নিকট হইতে সাহায্য স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। লক্ষ্যণীয় যে, এই লেন দেন এবং সাহায্য কোন ক্রমেই বেমানান নহে বরং একেবারেই আল্লাহর নীতি আদেশ মাফিক। এরশাদ হইতেছেঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

অর্থাৎ "তোমরা পরস্পর সহানুভূতি প্রদর্শন কর, পুণ্য ও খোদা ভীতির কাজে"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পীরগণকে মা'রেফাতের খাজনার রক্ষক বা পাহারাদার নিযুক্ত করিয়াছেন এই জন্য যে, মুরীদদিগকে এই সম্পদের দ্বারা ধন্য করিবেন। পীরের ব্যক্তিগত খরচাদি এবং সেই সাথে তাঁহার বাসস্থানের অসহায়দের এবং তাঁহার দরবারের গরীব ছাত্রদের, তাঁহার দস্তরখানে আল্লাহর মেহমানদের খরচা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততায় যেন পীর সাহেবগণকে মূল্যবান সময়

নষ্ট করিতে না হয়, সেজন্য মুরীদদের সামর্থ অনুযায়ী করণীয় কাজে সহযোগিতায় ক্ষতি নাই। যদি পীর সাহেবগণ মুরীদদের পরকালীন মুক্তির চেষ্টা করিতে থাকেন এবং মুরীদগণ পীর সাহেবদের পার্থিব প্রয়োজনে সহযোগিতা করেন তাহা হইলে এই লেনদেন কি ক্ষতির? অতীত বুযুর্গ ও সুফীয়ানদের সময় হইতে শুরু করিয়া শেষ যুগের আল্লাহওয়ালাদের এই একই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। আমাদের হজরতও যদি সেই পুরাতন দস্তুর অনুযায়ী স্বীয় ভক্ত এবং মুরীদদের সন্তুষ্টচিত্তে দেওয়া হাদীয়া গ্রহণ করেন তাহা নিয়া আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। তবে অবশ্যই আলোচনার যোগ্য তাঁহার অল্পতে তুষ্টির বিষয় ও তৃপ্তির কথা। এসব বিষয়ে তাঁহার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল। কোন ভক্ত অল্প বিস্তর যাহা কিছুই হাদীয়া পেশ করিতেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন। হাদিয়ার বস্তু ও পরিমানের প্রতি একেবারেই খেয়াল করিতেন না। কোন কিছু না দিলেও তাহার কোন প্রশ্ন ছিল না। মোট কথা, না তিনি কাহারো নিকট কিছু আশা করিতেন, না কাহারো আর্থিক সাহায্যের অপেক্ষায় থাকিতেন। বরং তিনি এই হাদীসের আমল করিতেনঃ "যেই জিনিষ মানুষের হাতে আছে তাহা হইতে পুরাপুরি নিরাশ থাক"।

তিনি ছিলেন এ যুগের অধিকাংশ পীর সাহেবদের বিপরীত। কারণ, তাঁহারা কেহ ইংগীতে বা বিভিন্ন অবভঙ্গিতে মুরীদদের নিকট অর্থ সম্পদের প্রশ্ন করেন, কেহ স্পষ্টভাবেই চাহেন, আবার কেহ কেহ অত্যাচারী বাদশাদের ন্যায় মুরীদদের উপার্জনের উপর নির্দিষ্ট অংক দাবী করেন। আর এই ভাবেই স্বীয় গরীব মুরীদদের কষ্টার্জিত অর্থে বাদশাহের ন্যায় শান শওকতে জীবন যাপন করেন।

গভীর অভিজ্ঞতা, সজাগ অন্তর এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আলা হজরতের ধ্যান ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। একবার আমি এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব কুতুবখানায় বসিয়া গ্রন্থাদির তালিকা করিতেছিলাম। আমরা কিছু সংখ্যক গ্রন্থের লেখকের নাম এবং সেগুলির মুদ্রণালয়ের নাম সম্পর্কে অন্বেষণ ও আলোচনা করিতেছিলাম। এই ব্যাপারে আমরা এতই আস্তে কথাবার্তা বলিতেছিলাম যে তাহা একেবারে নিকটে বসা ব্যক্তিও শুনিতে পারে না। শুনিলেও কিছু বুঝিতে পারিবে না। আ'লা হজরত বেশ কিছু দূরে বসিয়া খুব মনোযোগ সহকারে কোন একটি কিতাব পড়িতেছিলেন। ঠিক সেই অবস্থায়তেই তিনি নিজ কিতাবের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন। তাঁহার এই অবস্থা আমরা সব সময়ই লক্ষ্য করিতাম।

একদিন আমার (লেখকের) মনে হইল যে, ধ্যানের প্রভাব সকল খাদেমের উপর পড়ে অথচ আমার উপর এরূপ কখনও হয়না কেন? এবং মনের এই অস্থিরতার কথা

আমি না কাহাকেও বলিয়াছি এবং না কেহ আমার নিকট হইতে শুনিয়াছে। কিন্তু তিনি নিজেই সেই গোপন সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। বিষয়টির উপর তিনি লম্বা বক্তব্য রাখিলেন (যাহা ইনশাআল্লাহ কখনও সুযোগমত পেশ করিব)। বক্তব্যের সারমর্ম বলিতেছি। তিনি বলিলেনঃ ধ্যানের প্রভাব কয়েক প্রকার, কখনও কখনও ধ্যানের আসর অবশ্যই হয় কিন্তু তাহা কেবল পীর সাহেবই জানিতে পারেন, মুরীদগণ কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

একবার অন্তরের ভ্রান্তি সম্বন্ধে বড়ই অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল। কোন অবস্থাতেই তাহা দূর হইতেছিল না। তিনি সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর এইরূপ দিলেনঃ খারাপ ধারণা যখন মুখে আনা হয় না এবং অন্তরে তাহা পোষণ করাও অপছন্দ হয় এবং মুখে উচ্চারণ করা কঠিন হয়, তখন উহা ক্ষতিকর নহে। বরং ইহা অন্তরে ঈমান থাকিবারই প্রমাণ এবং এই সকল ভুল ধারণার চিকিৎসা এই যে, সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করিবে না। ইহার উপর বিস্তারিত আলোচনা সময় মত করিব ইনশাআল্লাহ।

আমার একান্ত ধারণা এই যে, প্রত্যেক বৈঠকেই হজরতের অধিকাংশ উপদেশ খাদেমের দৃষ্টিভংগির ও অন্তরের প্রশ্নের উপর হইয়া থাকে। দ্বিধান্বিত অন্তর ছাড়া অন্য কেহ কিভাবে বুঝিবে যে ইহা কার অন্তরের প্রশ্নের উত্তর! একবার খানকায় অবস্থানকালে হঠাৎ আমার অন্তরে এক প্রকারের ভীতি ও অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু আমি মনটাকে খুব করিয়া থামাইয়া রাখিলাম এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী এই চেষ্টা করিলাম যে এই দরবারে উপস্থিত থাকাকালে এই অবস্থা যেন প্রকাশ না পায়। কাজেই সকলের সহিত পূর্বের ন্যায় শান্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে উঠা বসা কথাবার্তা কার্য্যকলাপ করিতে লাগিলাম। আমার এই অস্থিরতা সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এক মজার ব্যাপার এই যে, কখনো সাহেবজাদা মুহাম্মদ মাসুম সাহেব এবং কখনো মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব আমাকে বলিতে লাগিলেন যে, আপনার প্রতি আলা হজরতের বড়ই খেয়াল। বারবার তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, মাওলানা আরশী সাহেব মন খারাপ করিতেছেন না তো? তিনি শহরের লোক, এই গ্রাম গঞ্জে আসিয়া অস্থির হইয়া পড়েন নাই তো? দুই দিন পর সুস্থ বোধ করিলাম। তারপর আর কখনও তিনি এইরূপ কথা বলেন নাই।

মিস্ত্রী জহুর উদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেনঃ আলা হজরত কয়েকবার আমার প্রয়োজনের সময় দুইচার টাকা অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলে আমি তাহা নিতাম না, কিন্তু যখন দেখিলাম যে, অন্যদেরকে হজরত কিছু দিলে তাহা তাহারা চুপ করিয়া গ্রহণ করে, তখন আমিও ইচ্ছা করিলাম যে, যদি আবার কখনো তিনি আমাকে কিছু

দিতে চান তাহা হইলে আমিও তাহা গ্রহণ করিব। ঠিক সেই দিনই এক বৈঠকে হজরত বলিলেনঃ মানুষ পীরের কাছে টাকা পয়সা নেওয়ার জন্য আসে না বরং অন্য কিছু পাওয়ার জন্য আসে। অতঃপর আর কখনও তিনি আমাকে টাকা পয়সা দেন নাই।

দিবারাত্রির কাজকর্ম এবং সময়সূচী

হজরত নিয়মিতভাবে যথাসময় তাহাজ্জুদ নামাজের পূর্বে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ঘরেই নফল নামাজ আদায় করিয়া সুন্নতের অনুসরণে কিছুক্ষণ আরাম করিতেন। ফজরের আজান হওয়ার পর জাকেরীন ও মুরীদগণ ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হইয়া জিকির আজকার করিতে থাকিতেন। বাড়ীতে আবার অজু করিয়া সুন্নতের পর ঠিক এমনই সময়ে মসজিদে উপস্থিত হইতেন যখন হানাফী মাজহাব অনুযায়ী দুই রাকাত সুরা তহা অথবা সুরা আস্‌সাফকাতের সমান সুরা সূর্য্য উঠিবার পূর্বেই পড়া যাইতে পারে। ফজরের নামাজের পর জায়নামাজে বসিয়া তিনি বিশিষ্ট খাদেমদের সহিত খতমে খাজেগান পড়িতেন। ইহার পর হালকায়ে জিকির শুরু হইত। তিনি সকলকে জিকিরের নিয়ম কানুন বলিয়া দিতেন। এই আত্মিক সম্পর্ক কমপক্ষে একঘন্টা চালু থাকিত। সূর্য কিছু উপরে উঠিলে হজরত চা পান করার জন্য অন্দরে তশরিফ নিয়া যাইতেন।

মসজিদের নিকটেই উত্তর দিকে কুতুবখানা। ইহার সাথেই হজরতের নির্দিষ্ট বসিবার ঘর। সুন্দর এই ঘরটির নাম "তসবীহ খানা"। বেলা ৯টা সাড়ে ৯টার সময় তিনি তসবীহ খানায় তশরিফ আনিতেন। ঐ সময় অধিকাংশ মুরীদ বিশেষ করিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ পাইতেছেন তাঁহারা সকলে হজরতের নিকট উপস্থিত হইতেন। কেননা, পীরের সংশ্রব তাহাদের জন্য বিশেষ অজীফার অন্তর্ভুক্ত। এই সময় অন্য কোন কাজকর্ম করা, একা একা কিতাব পড়া অথবা কোন নূতন মুরীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তাহাদের সহিত মোসাফোহা-মুয়ানাকা করা পর্যন্ত আদবের খেলাফ। এই বৈঠকে তিনি বিভিন্ন শিক্ষামূলক আলোচনা করিতেন এবং ধর্মীয় মাসয়ালা সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতেন। শিক্ষানুরাগীবৃন্দ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন এবং অন্যান্য সবাই চুপ করিয়া শুনিতেন। আর কেহ কেহ শুধু উপস্থিত হওয়াই যথেষ্ট মনে করিতেন। প্রায় ১১টায় হজরত বাসায় যাইতেন এবং খানা খাইতেন। ইহার পর তিনি কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন।

দারুন গ্রীষ্মের সময় জোহরের আজান প্রায় ২টার সময় এবং জামাত ৩টার মধ্যেই সম্পন্ন হইত। অন্যান্য সময় সূর্য্য ঢলিয়া যাওয়ার পরই আজান এবং সংগে সংগেই জামাত হইত। নামাজের পর তিনি কিছুক্ষণ পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া নামাজের

কায়দায় বসিয়া এক মঞ্জিল কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন। অতঃপর বিভিন্ন অজিফা পাঠ করিতেন। অতঃপর খাস (বিশিষ্ট) মুরীদদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। তখন ফায়েজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে মুরীদগণ তাঁহার আশেপাশে বসিয়া থাকিতেন। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরিয়া চা পান করিতেন এবং মওসুম অনুযায়ী তসবীহ্খানায় অথবা তাঁহার বারান্দায় ভক্তগণসহ বসিতেন। এই বৈঠকেও তিনি ই'লম সম্পর্কে এবং আধ্যাত্মিক বিষয়াদির উপর আলোচনা করিতেন। আছরের নামাজ শেষ করিয়া ঐ মজলিশেই তিনি খতমে খাজেগান পড়িতেন। মাগরিবের নামাজের পর মুরীদগণ খানা খাইতেন এবং কিছুক্ষণ পর হজরত তসবীহখানায় তশরিফ আনিতেন। মুরীদগণও একে একে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চারপাশে বসিতেন। হজরত বিভিন্ন কিতাব এবং ইল্‌ম ও আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। মুরীদগণ সকলে নামাজের আসনে বসিয়া থাকিতেন। এই বৈঠক অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলিত।

——— o ———

শিক্ষামুলক আলোচনা

আলা হজরতের বাসস্থান শুধু পীরমুরীদীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রই নহে বরং সেই সাথে উহা একটি মহান বিদ্যাপিঠও বটে। এখানে প্রত্যেক বিষয়ের উপর অতি মুল্যবান গ্রন্থাদির একটি বিরাট কুতুবখানাও রহিয়াছে এবং উহা সকল আগন্তুক আলেম ও ফজেলদের জন্য ওয়াকফ্‌কৃত। আলেমদের নিকট প্রচুর পরিমান কিতাব না থাকিলে অথবা আশে পাশে বড় কুতুবখানা না থাকিলে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যেমন পালকবিহীন পাখীর ন্যায়, উড়িবার যোগ্যতা আছে কিন্তু পালকহীন অবস্থায় উড়িতে পারে না। এই অবস্থা এখন অধিকাংশ আলেমের। নূতন নূতন সমস্যার সমাধানকল্পে ইলমি অনুসন্ধানের পিপাসা তাঁদেরকে অস্থির করিতে থাকে, কিন্তু তাঁহারা এই পিপাসা মিটাইবার কোন সুযোগ পান না।

হজরতের খলীফা ও মুরীদদের মধ্যে যাঁহারা আলেম তাঁহারা যখনই এই দরবারে উপস্থিত হন তখন জিয়ারতের আগ্রহের সাথে ইলমি পিপাসাও সংগে নিয়া আসেন। এই বৈঠকে তিনি (হজরত) বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয় খুব গুরুত্বের সহিত আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে আমি দেখিয়াছি যে, কোন একটি মাসয়ালার ব্যাপারে তর্ক–বিতর্ক ও চিন্তা ভাবনায় একাধিক দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং হজরত এই অনুসন্ধান সভার সভাপতি হইতেন। তিনি যখন বিশেষভাবে ওলামাদের উপস্থিতিতে কোন মাসয়ালা আলোচনা করিতেন তখন অনুসন্ধানের আগ্রহ এত বেশী হইত যে, জোহরের নামাজের পর তিলাওয়াত শেষ করার সংগে সংগে বলিতেন, অমুক বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা আন, দেখি সেখানে এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ আছে কিনা? মাগরিবের পরেও ঐ বৈঠক চলিত। আমি খানকা শরীফে উপস্থিত হইবার ১০–১২ দিন পূর্বে জিলা শাহপুরে সুন্নি মুসলমান এবং কাদিয়ানীদের মধ্যে একটি বিরাট মুনাজেরা (বিতর্ক সভা) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভার প্রচারে এই সকল অঞ্চল ছিল মুখরিত। এতদঞ্চলে এতবড় সভা ইহাই ছিল প্রথম। শুনিয়াছি যে, ১৫ হাজার মুসলমান এই বিতর্ক সভায় শরীক হইয়াছিলেন এবং কাদিয়ানী বিতর্ককারীদের প্রকাশ্য পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। মাওলানা মুহাম্মদ শফী সাহেব বিতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বিতর্কের সকল কার্য্যক্রম এবং উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে পেশ করিলেন। হায়াতে মাসীহ্ অর্থাৎ ঈসা (আঃ)–এর জীবিত থাকিবার ব্যাপারে আয়াতঃ

وَمَاقَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

বিতর্ক সভায় ইহার উপর আলোচনা হইয়াছে। এখানে যখন তাহার উপর কথা উঠিল তখন দ্বিতীয়বার অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিষয়াদির উপর চিন্তা ভাবনা শুরু হইয়া

গেল। এই আয়াতে একটি বিশেষ শব্দের অর্থ উভয় দলকে পরস্পর বিতন্ডায় লিপ্ত করে। শব্দটি হইতেছে (বাল)। এই শব্দের অনুসন্ধানকাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হইল যে, এই "বাল" শব্দটি ইবতালীয়া, না ইন্তেকালীয়া এবং ইহার জন্য কাসুস, তাজুল উরুস, মুফরাদাতে ইমামে রাগীব, লোগাতুল কুরআন, ইত্যাদি অনেকগুলি কিতাব পড়িয়া শেষ করা হইল। এই বিতর্কের সহিত সম্পর্কিত আর একটি আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হইতেছে 'শুবিহা লাহুম"। এই শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের আলোচনা দীর্ঘ সময় চলে। এই অনুসন্ধান কখনো শাহ আবদুল কাদের (রঃ) এর তরজমা এবং কখনো শায়খুল হিন্দের এবং কখনো শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) এর তরজমা দেখা হইতেছিল। মোট কথা এই অনুসন্ধানেই প্রায় তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

কুরআনের সহিত সম্পর্কহীন ঘটনা বা ব্যাখ্যা

আলা হজরত একদিন বলিলেনঃ আমি প্রত্যহ এক মঞ্জিল কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করি। ইহাতে আমার প্রায় ৪০ মিনিট ব্যয় হয়। প্রথম মঞ্জিল একটু বড়, ইহাতে ৫/৬ মিনিট বেশী সময় লাগে। অবশিষ্ট প্রত্যেক মঞ্জিল প্রায় ৪০ মিনিটেই শেষ হইয়া যায়। এই তেলাওয়াতের মধ্যে কোথায়ও কুরআন শরীফের তরজমা ও ব্যাখ্যার উপর চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন হয়। আবার কখনো কোন জটিল স্থানে উপযুক্ত কোন ব্যাখ্যার কথাও ভাবিতে হয়, যাহা কোন তফসীরের কিতাবে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর তিনি এরূপ ব্যাখ্যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। "ক্বারুন" শব্দ সম্পর্কিত আলোচনা উহার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

কারুনের কি অপরাধ ছিল? তিনি বলেনঃ কারুন সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ =

অর্থাৎ "অতঃপর আমি কারুনকে এবং তাহার গৃহকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছি"।

জমহুর (প্রসিদ্ধ মুফাসরীনবৃন্দ) লিখিয়াছেন যে, কারুনের জন্য এই ভয়ংকর শাস্তির কারণ এই ছিল যে, সে হজরত মুসা (আঃ) এর উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়াছিল। কিন্তু কুরআন মজীদের বক্তব্য ও শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ব্যাভিচারের অপবাদের বর্ণনা একেবারে ভুল মনে হইবে। কুরআন মজীদে কওমে আ'দ, কওমে সামুদ ও কওমে লুত, আসহাবে আইকাহ্ এবং ফিরআউন ইত্যাদি যে-সকল অপরাধীর উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আলোচনা যখনই আসিয়াছে তখনই উহার সংগে সংগে প্রত্যেক অপরাধীর অপরাধের কথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন কওমে

আ'দের অপরাধ ছিল দম্ভ করা ও সীমানা লংঘন করা, কওমে সামুদের মূর্তি পূজা করা, কওমে লূতের পাপাচার, আসহাবে আইকার ডাকাতি ও অসদাচরণ এবং ফিরআউনের খোদায়ারীর দাবী। এইগুলির সব কিছুই আলোচিত হইয়াছে। এখন আমরা দেখিব যে, আল কুরআন কারুনের উপর কি অপরাধ দায়ের করিয়াছে। কারুনের আলোচনা কুরআন মজীদে মাত্র তিন জায়গায় আসিয়াছে। প্রথমে সূরা ক্বাসাসের রুকুতে। এরশাদ হইতেছে,

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ

অর্থাৎ, ক্বারুন ছিল মুসার (আঃ) সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম এমন ধনভান্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহাকে বলিয়াছিল, দম্ভ করিও না, আল্লাহ দাম্ভিকদিগকে পছন্দ করেন না। আরো এরশাদ হইতেছেঃ–

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ .

অর্থাৎ, অতঃপর কারুন তাহার মিছিল নিয়া জাতির বিরুদ্ধে বাহির হইল। এতদ্ব্যতীত সূরা আ'নকাবুতের ৪র্থ রুকুতে এরশাদ হইয়াছেঃ

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ

অর্থাৎ, এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারুন, ফিরআ'উন ও হামানকে। মুসা (আঃ) উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশনসহ আসিয়াছিল। তাহারা দম্ভ করিত কিন্তু আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ সূরা আল মূমীনের তৃতীয় রুকুতে এরশাদ হইয়াছেঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ

অর্থাৎ, আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণ সহ মুসা (আঃ) কে পাঠাইয়াছিলাম ফিরআ'উন, হামান ও কারুনের নিকট কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, সে তো একজন যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

এই আয়াতসমূহের মধ্যে কোথাও ব্যাভিচারের অপবাদের কথা উল্লেখ আছে কি যাহা কারুন মুসা (আঃ) এর উপর আরোপ করিয়াছে। কোথাও নাই। বরং এখানে কারুনের অপরাধ শুধু তাঁহার দম্ভ ও অহংকার। কাজেই বুঝা যায় যে, সে তাহার জাতির উপর দম্ভ করিতে শুরু করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহার সম্পদ অনেক বেশী ছিল বলিয়া তাহার দাম্ভিক হওয়াটা বিচিত্র কিছু ছিল না। তাহার দম্ভ ও অহংকার দেখিয়া সে সময়ের লোকেরা তাহা হইতে তাহাকে বিরত করার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে আরো অধিক মাত্রায় দম্ভ ও অহংকার করিতে শুরু করে। অতঃপর সে স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে দম্ভ করিতে শুরু করে।

তিনি আরও বর্ণনা করেনঃ সে ফিরআ'উন ও হামানের সাথী হইয়া মুসা (আঃ)-কে একজন মিথ্যাচারী যাদুকরের উপাধি দিয়াছে। এইরূপ মনে করাও তাহার দাম্ভিকতার কারণেই ছিল।

অতঃপর আলা হজরত বলিলেনঃ আমি মনে করি, কারুনের ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়া তাহার ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়ার জন্য নহে। বরং শুধু তাহার দম্ভ ও অহংকারের জন্যই হইয়াছে। কারুনের ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়া তাহার দম্ভ ও অহংকারের কারণেই ঘটিবার বিষয়টি শুধু কুরআন মজীদের দারা প্রমাণিত নহে বরং ইহা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিতঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِذَارَه مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِه فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি দম্ভভরে তাহার লম্বা লুঙ্গি মাটিতে ঝুলাইয়া টানিয়া নিয়া চলিত। তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়। সে কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে।

অতঃপর আলা হজরত বলিলেনঃ ব্যাভিচারের অপবাদ সুবিচারের দৃষ্টিতে একান্ত অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। কেননা, যদি কারুন হজরত মুসা (আঃ) এর সহিত হিংসা ও শত্রুতার কারণে কোন অপবাদ তাহাকে দিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার ক্ষতি

সাধনের উদ্দেশ্যেই দিত। অথচ ক্ষতি তখনই চিন্তা করা যায়, যখন অপবাদের কথা শুনিয়া জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু এখানে অবস্থা এই যে, মানুষ যেখানে একজন সাধারণ সম্মানিত ও ভদ্রলোকের ব্যাপারেও এইরূপ অপবাদ বিশ্বাস করিতে রাজী নহে, সেখানে কি করিয়া একজন মহামানব, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারীকে ঐরূপ মনে করিবে? অতএব এই অবস্থায় এরূপ অপবাদ হইতে মুসা (আঃ) এর ক্ষতির কারণ হইতে পারে না। কারুনের ন্যায় সুচতুর ব্যক্তির পক্ষে এমন বুদ্ধিহীনের কাজ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা বোঝা মুশকিল। নিঃসন্দেহে এই বর্ণনাদি ইসরাইলীদের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ, তাহারা সর্বপ্রকার অনর্থ ও অন্যায়ের উদ্যোক্তা এবং তাহাদের মধ্যে নবী ও রসুলের অপমান করিবার প্রবণতা প্রবল।

হজরত দাউদ (আঃ) এর কোন অপরাধের জন্য অনুশোচনা হইয়াছিল

হজরত একদিন বলিলেনঃ হজরত দাউদ (আঃ) এর ব্যাপারে সেই আলোচনা কুরআন মজীদের এই আয়াতগুলির মধ্যে আসিয়াছে ঃ

আরবী (৫৯) وَاذْ كُرْ عَبْدَ نَا دَاوٗدَ ذَاالْاَ يْدِ اِنَّه اَوَّاب

অর্থ–এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা, সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অনুগত।

اِنَّا سَخَّرْ نَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِ شْرَاقِ

অর্থাৎ, আমি পর্বতমালাকে তাহার অনুগত করিয়াছিলাম। ইহারা সকাল সন্ধ্যায় তাহার সহিত আমার পরিবত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ . وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ
الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ . وَهَلْ اَتٰكَ بَنَؤُا الْخَصْمِ
اِذْ تَسَوَّرُ وَالْمِحْرَابَ ل

"এবং সমবেত বিহংগকুল সকলেই ছিল তাঁহার অনুগত। আমি তাঁহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা। তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে কি? যখন তাহারা প্রাচীর ডিংগাইয়া আসিল ইবাদত খানায়।"

اِذْدَ خَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُو الَا تَخَفْ خَصْمَانِ

بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَا حْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِ نَا اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ .

"এবং দাউদের নিকট পৌঁছিল। তখন তাহাদের কারণে সে ভীত হইয়া পড়িল। উহারা বলিল, ভীত হইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ। আমাদের একে অপরের উপর জুলুম করিয়াছে, অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করিবেন না এবং আমাদিগকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন।"

اِنَّ هٰذَا اَخِىْ (قف) لَهٗ تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ (قف) فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ .

এই লোক আমার ভাই। ইহার আছে মোট ৯৯টি দুম্বা এবং আমরার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, আমার জিম্বায় এইটি দিয়া দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করিয়োছে।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَا جِهٖ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ . اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَا سْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ .

দাউদ (আঃ) বলিলেন, তোমার দুম্বাটিকে তাহার দুম্বাগুলির সংগে যুক্ত করিবার দাবী করিয়া সে তোমার প্রতি জুলুম করিয়াছে। শরীকদের অনেকে অন্যের উপর অবিচার করিয়া থাকে; করে না কেবল মুমীন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। দাউদ (আঃ) বুঝিতে পারিলেন, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করিলেন এবং এবং নত হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন ও তাঁহার অভিমুখী হইলেন (ইহা একটি সিজদার আয়াত)।

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَ نَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ

অতঃপর আমি তাহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

يَداوُدُ انا جَعَلنكَ خَليفَةً فِى للأرضِ فا حكم بَين للنّاسِ
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين
يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوا
يَومَ الحساب

হে দাউদ (আঃ), আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করিওনা। কেননা, ইহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। যাহারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি, কারণ তাহারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হইয়াছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি অত্যন্ত অমার্জিত ও লজ্জাকর বর্ণনা পেশ করা হইত। বস্তুতঃ ইহা ইহুদীদের একটি মনগড়া বর্ণনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বর্ণনাটি এইরূপঃ হজরত দাউদ (আঃ) এর আওরিয়া নামক একজন কর্মচারীর স্ত্রীকে পছন্দ হইয়াছিল অথচ তাঁহার ঘরে ৯৯ জন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ঐ মহিলাকেও তাঁহার বিবাহ করিবার আগ্রহ হইল এবং এই কারণেই তিনি আওরিয়াকে এক ভয়ানক শত্রুর মোকাবিলার জন্য সৈন্য দিয়া পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য, সে তথায় নিহত হইয়া যাইবে। কিন্তু সে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিল। অতঃপর ইহার চাইতেও ঘোরতর শত্রুর বিরুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। ইহাতেও সে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিল। তৃতীয়বার তদপেক্ষা কঠিন শত্রুর মোকাবেলায় পাঠাইলেন এবং এই লড়াইতে সে শহীদ হইল এবং হজরত দাউদ (আঃ) তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। ইহার উপর আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে সতর্কবাণী আসিল এবং এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য দুইজন ফিরিস্তা মানুষরূপে পরস্পরের প্রতি দাবী নিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা হজরত দাউদ (আঃ) এর নিকট নির্জনে আসিলেন এবং একটি দুম্বা ও অনেক দুম্বা সম্পর্কে বিচার চাহিলেন। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং হজরত দাউদ (আঃ) এর অবিচারের প্রতি ইংগিত ছিল। কেননা, আরবের প্রচলিত ভাষায় স্ত্রীকে না'জাহ অর্থাৎ (দুম্বা)–ও বলা হয়। কিন্তু যখন উভয় পক্ষ দাউদ (আঃ) এর বিচার শুনিবার পর একে অন্যের দিকে তাকাইয়া হাসিলেন, তখন হজরত দাউদ (আঃ) বুঝিতে পারিলেন যে ইহাতে তাহার জন্য

আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি পরীক্ষা ছিল। অতঃপর গল্পপ্রিয় লোকেরা এই বর্ণনা (যাহা বাদশাহ জাহাংগীর ও শের আফগান খান এর ঘটনার চাইতেও খারাপ) প্রচার করিয়াছেন। তাহারা এই আয়াতের উল্টাপাল্টা তফসীর করিয়াছেন। কিন্তু বিচক্ষণ আলেমগণ তাহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, যে-ধরণের খারাপ কথা কোন সাধারণ মানুষের জন্যও বলা উচিৎ নয়, তাহা একজন নবীর উপর বলা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপারই বটে।

হজরত আলী কারামাল্লাহু আজহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি এই ঘটনা বর্ণনা করিবে তাহাকে ১৬০ টি বেত্রাঘাত করা হইবে। কিন্তু আমি অবাক হইতেছি যে, হক্কানী ওলামায়ে কেরাম অনেকেই এই বর্ণনা অস্বীকার করিয়া থাকিলেও তাহা এইরূপ অদ্ভুতভাবে করিয়াছেন যাহার মধ্যে কিছুটা স্বীকৃতিও লুক্কায়িত আছে। তফসীরে খাজেনে লেখা আছেঃ মুহাক্কিক ওলামায়ে তফসীরগণ বলেন যে, এই ঘটনার মধ্যে হজরত দাউদ (আঃ) এর মাত্র এতটা অপরাধ ছিল যে, তিনি আওরিয়ার নিকট বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া আমার নিকট সোপর্দ কর। তাঁহার এই কথার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাঁহার উপর সতর্কবানী আসিয়াছে এবং দুনিয়াদারীর কাজে তাহার উপর কড়াকড়ি সতর্কতা আরোপিত হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন, হজতর দাউদ (আঃ) আকাংখা করিয়াছিলেন যে, আওরিয়ার স্ত্রী তাঁহার নিকট থাকিলে খুবই ভাল হইত। অতঃপর আওরিয়া ঘটনাক্রমে এক অভিযানে নিহত হইলেন। কিন্তু যখন দাউদ (আঃ) তাহার মৃত্যুর খবর পাইলেন তখন তিনি তাহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, যেরূপ তিনি অন্যান্য কর্মচারীর নিহত হওয়াতে করিতেন। অতঃপর তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। এই কারণে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে সাবধানতার বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা, নবীদের অপরাধ যদিও ছোট হয় কিন্তু তাহা আল্লাহর নিকট অনেক বড়। এই সকল বর্ণনার মধ্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিচক্ষণ তফসীরকারগণ যদিও এই বর্ণনার একটি অস্পষ্ট দিক হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মনগড়া অন্যায় মন্তব্যগুলি সমূলে প্রত্যাখান করিতে সক্ষম হন নাই। প্রশ্ন হইল, মুফাসসিরীনদের এইরূপ জঘন্য এবং দুরূহ বর্ণনাকে সঠিক বলিয়া মানিয়া নেওয়ার এমন কোন অসুবিধা কি দেখা দিয়াছিল যে, ইহারা প্রথম হইতেই উহা অস্বীকার করিতে পারিল না। এবং ইহারা যেভাবেই হোক তাহার কিছু অংশের (সুযোগমত) ব্যাখ্যা এবং কিছু অংশর স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অথচ নবুওয়াতের সুউচ্চ আসনের দাবী এই ছিল যে,

তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ যে কোন বর্ণনারও তোয়াক্কা না করা যাহা নিতান্তই নির্ভরযোগ্য মনে না হয়। সুতরাং এখানে তো শুধু ইয়াহুদীদের চক্রান্তই কার্যকর হইতেছে।

অতঃপর আলা হজরত বলিলেনঃ আমার দৃষ্টিতে হজরত দাউদ (আঃ) এর অপরাধ শুধু এইটাই ছিল, যাহার বর্ণনা স্বয়ং কুরআনেও পাওয়া যায়, যে তিনি অধিক ইবাদতের কারণে রাজ্যের প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে একপ্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তিনি কোন কোন দিন বিশেষ ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন এবং সেই সময় তাহার নিকট কোন ফরিয়াদী যাইতে পারিত না। বাড়ীর দরজা বন্ধ থাকিত এবং ৩৬ জন সিপাহী বাহিরে পাহারারত থাকিত।

ইবাদত সর্বাবস্থায়ই উত্তম এবং সম্মানের কাজ। কিন্তু একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ইহা বাড়াবাড়ি এবং সীমা অতিক্রম করার সামিল। রাষ্ট্রীয় শৃংখলার পরিপন্থী। হুজুর (সঃ) এর দরবারে সর্বদা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। মানুষ নিজেদের ছোটখাট ব্যাপারেও পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং কাহারো জন্য বাধা বিঘ্ন ছিল না। এইজন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে হজরত দাউদ (আঃ) এর এইরূপ কাজ পছন্দ হয় নাই। এবং "নবাউল খসমের" ঐ সতর্কীকরণের ঘটনা দেখা দিয়াছিল। ইহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে। হইতে পারে বিবদমান ব্যক্তিদ্বয় মানুষ এবং তাহারা বিচারালয়ের দরজা বন্ধ দেখিয়া ওয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অথবা তাহারা ফিরিস্তা ছিলেন এবং নির্জন স্থলে তাহাদের আগমন শুধু শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ছিল।

সে যাহাই হোক, হজরত দাউদ (আঃ) তাঁহার অপরাধের ব্যাপারে সাবধান হইলেন এবং তিনি সংগে সংগে তওবা করিলেন। আ'লা হজরত বলেনঃ এখন তোমরা কুরআনের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করঃ "অজকুর আবদানা দাউদা জাল্ আইদিইন্নাহু আউয়াব"। অর্থাৎ স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা। সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অনুরাগী। এখানে হজরত দাউদ (আঃ) এর অধিক ইবাদতের দিকে ইশারা করা হইয়াছে।" ইন্না সাখখারনাল জিবালা মায়াহু" (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) অর্থাৎ তাঁহার ইবাদত ও অন্ধ আনুগত্য এবং দোয়া ও মুনাজাত এত ব্যাপক ছিল যে, পাহাড়ও প্রতিধ্বনিত করিত এবং পাখিরাও প্রভাবান্বিত হইত। আরও উল্লেখ আছে "অশাদাদনা মুলকাহু" অথচ তিনি একজন নিছক দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ভাবাপন্ন ইবাদতকারী ছিলেন না বরং একটি বিরাট রাজ্যের অধিপতি এবং রাজ্য পরিচালনায় একজন সুদক্ষ বাদশাও ছিলেন। "ওয়া আতাইনাহুল হিকমাতা ওয়া ফাসলাল খিতাব" অর্থাৎ তাঁহাকে ন্যায়, বিচারের সহিত রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতা দান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি

ইবাদতখানায় বসিয়া রাজ্য প্রধানের দায়িত্ব পালন এবং দেশ শাসনের কর্তব্যকে অবহেলা করিতেন। ফরিয়াদিরা কোথায় যাইবে? অগত্যা তাহারা তাঁহার ইবাদতখানায় পৌছিল। আল্লাহ তায়ালা দুউজন ফিরিস্তাকে মানুষের চেহারায় পাঠাইয়া হজরত দাউদ (আঃ) কে সাবধান করিলেন। ফলে তিনি তাহার ভুল অনুভব করিতে পারিলেন এবং তওবা করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে খেলাফতের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলা হইল, "ইয়া দাউদ্ ইন্না জা'য়ালনাকা খলীফাতান ফিল আরদে" অর্থাৎ হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীর খলিফা নিযুক্ত করিয়াছি। তুমি কোন একান্ত নির্জনে বসিয়া ইবাদতকারী নও যে, একা একা চিল্লা করিতে থাকিবে। বরং তুমি একজন প্রধান বিচারপতিও বটে। জনগণের জন্য তোমার সুবিচারের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন। "ফাহকুম বাইনান নাসি বিল হাক্ব" অর্থাৎ জনগণের আসা যাওয়ার পথে বাধা দিওনা এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিবাদ মীমাংসা কর।

এই আয়াতগুলির দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, হজরত দাউদের অপরাধ কেবল মাত্র দেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং জনগণের মধ্যে বিচারকার্য্য সম্পাদনে অনীহা। পক্ষান্তরে, খোদা না করুন, কথিত অপরাধ যদিও থাকিত যাহা ইসরাইলী বর্ণনা অনুযায়ী প্রচলিত, তাহা হইলে ইহার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ইহাই বলা হইত যে, হে দাউদ তুমি একজন খোদাভক্ত এবং নবী অতএব অন্যের স্ত্রী ও মেয়েদের দিকে তাকাইওনা এবং অন্যের স্ত্রীদিগকে নিজের বিবাহ বন্ধনে আনিবার আকাংখা করিও না। অথচ ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, আয়াতের মধ্যে এইরূপ কোন ইংগিত পর্যন্ত নাই। অতঃপর বলা হইল, "ওয়ালা তাত্তাবিয়ীল হাওয়া" অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্জনে বসিয়া সর্বদা ইবাদতে রত থাকিও না। বরং আচার-বিচারের বাহিরে জন্য যাও। ইহা ইবাদত অপেক্ষা অধিক পুণ্যের কাজ। "ফায়ুদিল্লাকা আন সাবিলিল্লাহ," জিকির্ ও ইবাদতের একক আগ্রহ তোমাকে আপন দায়িত্ব পালন হইতে উদাসীন করিয়া দিবে। যে কাজ আল্লাহ তোমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, উহা আল্লাহর নির্ধারিত পথ। যেহেতু রাজ্য পরিচালনার কাজে অবহেলা একটি অপরাধ, সেজন্য উহাকে বিভ্রান্তি বলা হইয়াছে।

সুরায়ে নজমের সাজানো আয়াত

একদিন হজরত বলিলেন, সুরায়ে নজম হইতেছে 'মক্কী' অর্থাৎ মক্কা শরীফে অবতীর্ণ। সকল মক্কী সুরার আসল উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ মুহাম্মদ (দঃ) এর রিসালাত প্রমাণ করা, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বর্ণনা দেওয়া। কাজেই এই সুরা সম্পর্কে চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে, ইহার প্রত্যেকটি আয়াত ঐ উভয় বিষয়ের

উপরই মজবুত হাতলের মত। প্রথমেই নক্ষত্রের শপথ গ্রহণ করিয়া রসুলের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলা হয় "মা দাল্লা সাহিবুকুম ওয়ামা গাওয়া" অর্থাৎ তোমাদের বন্ধু মুহাম্মদ (সঃ) সত্য রসুল, পথ ভুলা বা প্রতারিত নহেন। তিনি খেয়ালখুশি মত কোন কথা বলেন না। "ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহউইন ইয়হা" ইহা আসমানী ঐশী বাণী যাহা তাঁহার উপর অবতীর্ণ হয়। ইহার উপর প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি রসুলের উপর আল্লাহর তরফ হইতে ওহী আসে তাহা হইলে সেই ওহী আসমানের সীমাহীন দূরত্ব হইতে পৃথিবীতে কে পৌছাইয়াছে, অর্থাৎ রসূল এবং আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম কে? এই সম্পর্কে এরশাদ হইতেছে, "আল্লামাহু শাদীদুল কুয়া।" তাঁহাকে জিবরীল ফিরিস্তা শিক্ষা দেন। আসমান হইতে জমিন পর্যন্ত পয়গাম পৌছান তাহার জন্য মুশকিল নহে। কেননা, তিনি এমন একজন ফিরিস্তা যাহার শক্তি অকল্পনীয়। "যু মির্‌রাতিন ফাস তাওয়া ওয়া হুয়া বিল উফুকিল আলা" অর্থাৎ তিনি শক্তিশালী, এই দূরত্ব তাহার জন্য এত সহজ যে এখনই তিনি আসমানের সুউচ্চ চূড়ায় আছেন আবার এখনই তিনি সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এখানে কাহারো সন্দেহ হইতে পারে যে, রসুল মানুষ এবং ওহী আনয়নকারী হইতেছেন ফিরিস্তা। অতএব অন্য সৃষ্টির মাধ্যম হওয়ার কারণে ওহী আনয়ণ এবং তাহা সঠিকরূপে অনুধাবনে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। এ সম্পর্কে এরশাদ হইতেছে, "সুম্মাদানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনে আও আদনা" অর্থাৎ অতঃপর তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন অতএব এত কাছাকাছি হইলেন যে, উভয়ের মধ্যে দুই তীরের সমান জায়গা ফাঁকা ছিল। কাজেই অতি নিকট হইতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না।

"ফা আওহা ইলা আবদিহি মাআওহা" অতঃপর আল্লাহতায়ালা তাঁহার বন্দা মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট যাহা আদেশ করিবার ছিল তাহা করিয়াছেন। "মা কাজাবাল ফুয়াদু মা রাআ" পয়গাম্বর যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাঁহার অন্তর তাহা অস্বীকার করে নাই। এখন আবার কোন অস্বীকারকারী বলিতে পারেন যে, কি জানি তিনি জিবরীল ফিরিস্তা ছিলেন না অন্য কোন কিছু জিবরীলের নাম দিয়া ধোকা দিতেছে। ইহার উপর এরশাদ, "আফাতুয় মারুনা হু আ'লা মা ইয়ারা ওয়া লাক্বদ রায়াহু নাজলাতান উথরা" তোমরা কি পয়গম্বরদের জিবরীলকে দেখিবার বিষয় তাঁহার (রসুলুল্লাহ সঃ এর) সহিত তর্ক করিতেছ? অথচ তর্কের কোন কারণ নাই। কেননা, তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং চিনেন এবং তিনি মে'রাজের রাত্রেও আর একবার দেখিয়াছিলেন । ইহার পর "আফার-আইতুমুল লা তাওয়াল উদো" এবং এই আয়াতের পর হইতে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে (তওহীদ) শুরু হয় এবং সুরার শেষ পর্যন্ত চলিতে থাকে।

সূরা ইউসুফের একটি আয়াত

একদিন আ'লা হজরত বলিলেনঃ সূরা ইউসুফের সপ্তম রুকুতে একটি আয়াত "জালীকা লিইয়ালামা আন্নীলাম আখুন হু বিল গায়বে"। এখানে অনেক তফসীরকার "ইয়ালামার" কর্তা আজীজকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন অথচ ইহার কর্তা মিশরের বাদশা হওয়া উচিৎ। ইহার বিস্তারিত ঘটনা এই যে, যখন জুলেখা হজরত ইউসুফ (আঃ) এর নিকট হইতে তাহার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে চাহিতেছিল এবং তিনি ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দৌড় দিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আজীজে মিশর (যিনি মিশরের বাদশার মন্ত্রী এবং জুলেখার স্বামী ছিল) আসিয়া পড়িল। তখন জুলেখা দুর্নাম হইতে বাঁচিবার জন্য অন্যায়ভাবে হজরত ইউসুফ (আঃ) এর উপর উল্টা হস্তক্ষেপের অপবাদ দিল। কিন্তু তিনি তাঁহার নির্দোষিতার কথা প্রকাশ করিলেন। আজীজ পেরেশান ছিল যে, কাহার কথা সত্য মনে করিবেন এবং কাহার কথা মিথ্যা মনে করিবেন। শেষ পর্যন্ত পয়গম্বরের কেরামত প্রকাশ পাইল এবং একটি দুধের শিশুর সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ, সকল অপরাধ জুলেখার। এই ঘটনার পর আজীজ জুলেখার নিকট বলিল "ইন্নাহু মিন কাইদি কুন্না ইন্না কহিদা কুন্না আজীম" অর্থাৎ ইহা তোমাদের (মেয়েলোকের) ষড়যন্ত্র। নিঃসন্দেহে মেয়েদের ষড়যন্ত্রের ফল বড়ই মারাত্মক।

এখানে হজরত ইউসুফের (আঃ) নির্দোষিতায় কোনরকমের সন্দেহ থাকিল না। কিন্তু একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির স্ত্রীর বদনাম হওয়াটাও কোন সামান্য ব্যাপার ছিল না। এই কারণেই শুধু বদনাম এড়াইবার জন্য জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে ইউসুফ (আঃ) এর উপর হস্তক্ষেপের মিথ্যা মুকাদ্দামা দায়ের করা হইল এবং তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দীর্ঘ দিন কারাগারে অবস্থানের পর এক উপলক্ষে তিনি বিষয়টির প্রতি বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বাদশা দ্বিতীয়বার তদন্ত শুরু করিলেন এবং জুলেখাকে সকলের সামনে দরবারে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিলেন। এবার জুলেখা সত্য বলিতে লাগিল যে, সকল অপরাধ আমারই ছিল, ইউসুফ (আঃ) নিষ্পাপ। ইহার পর হজরত ইউসুফ (আঃ) বলিলেন "জালিকা লি ইয়ালামা আন্নি লাম আখুন হু বিলগাইবে ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইহ্‌দি কাইদাল খা-ইনীন"। তফসীরকারগণের মত অনুসারে ইহার তরজমা এইরূপ যে, ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম বলিলেন, আমি এই কথাটি এই জন্য উথাপন করিয়াছি যে, আজীজ অবগত হউক যে,

আমি তাহার অসাক্ষাতে তাহার আমানতের খেয়ানত করি নাই এবং এই কথা জানা প্রয়োজন যে, খেয়ানতকারীদের কৌশল আল্লাহ্ পাক ব্যর্থ করিয়া দেন।

আ'লা হজরত বলিলেনঃ "লিইয়া লামার" তরজমা "যাহাতে আজীজ জানিতে পারে" এইরূপ ঠিক হবে না। বরং এইরূপ হইবে যে, যাহাতে বাদশাহ জানিতে পারেন। কেননা, আজীজকে প্রকৃত ব্যাপার জানাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেতো কয়েক বৎসর পূর্বেই দুধের শিশুর সাক্ষীর দ্বারাই জানিয়াছিল যে, ইউসুফ (আঃ) খেয়ানতকারী নন। কোনরূপ অপকর্মে তিনি লিপ্ত হন নাই বরং সকল অপরাধ জুলেখার। সে স্পষ্ট অপবাদকারীণীর অপরাধে দোষী এবং তাহাকে এই জন্য তওবা করিতেও হুকুম দেওয়া হয়। এই মামলা জানিয়া শুনিয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে দায়ের করিয়াছিল। তবে বাদশার নিকট সঠিক অবস্থা প্রকাশিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। তাঁহার নিকট হজরত ইউসুফ (আঃ) এর নিরপরাধ প্রমাণ হওয়া প্রয়োজন ছিল; কেননা, তাঁহার নির্দেশের উপর তাঁহার মুক্তি নির্ভর করিতেছিল। অতএব সঠিক তরজমা এই হইবে, ইউসুফ বলিলেন, আমি সেই পুরাতন কথা এই জন্য উত্থাপন করিয়াছি যে, বাদশা জানুক আমি আজীজ মিশরের অবর্তমানে তাহার আমানতের খেয়ানত করি নাই।

হজরত সুলাইমান (আঃ) এবং তাঁহার ঘোড়াসমূহ

সুরায়ে সোয়াদের মধ্যে হজরত সুলাইমান (আঃ) এর নিকট ঘটনা উল্লেখ আছেঃ

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ اِذْعُرِضَ
عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ اِنِّىٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ
الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَا عَلَىَّ
فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ

অর্থাৎ, আমি দাউদকে দান করিলাম সুলাইমান। তিনি ছিলেন উত্তম বান্দা এবং অতিশয় অনুগত বান্দা। যখন অপরাহ্নে তাঁহার সম্মুখে উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলিকে উপস্থিত করা হইল তখন তিনি বলিলেন, আমিতো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ

হইয়া ঐশ্বর্য্য-প্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর। অতঃপর তিনি অশ্বগুলির পা ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। এই তরজমা সেইসব তফসীরকারগণের মতের অনুকূলে ছিল, যাহারা বলেন যে, হজরত সুলাইমান আলাইহিস্‌সালাম ঘোড়ার দেখাশুনার কাজে এইরূপ ব্যতিব্যস্ত হইলেন যে, নামাজের খেয়ালও ছিল না। এমন কি সূর্য ডুবিয়া গেল। অতঃপর মনঃক্ষুন্ন হইয়া বলিলেন, এই সম্পদের দেখাশুনার জন্য আমার নামাজ চলিয়া গেল। কাজেই অশ্বগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

এই প্রসংগে হজরত বলিলেনঃ কাজা নামাজের গুনাহের কাফফারা ঘোড়া ধ্বংস করার দ্বারা কিরূপে সম্ভব? সম্পদ বিনষ্ট করা হারাম এবং পয়গম্বরগণ এইরূপ কাজ করিতে পারেন না। একটি পাপ হইতে মুক্তি চাহিতে হইলে তওবা ও এস্তেগফার করিতে হয়। অথচ সেখানে আর একটি হারাম কাজ দ্বারা তাহা কিভাবে সম্ভব? অতএব আমার নিকট "মাসহাম বিসসুকে ওয়াল আ'নাক্ব" দ্বারা গা এবং গলা কাটা বোঝায় না। বরং গলায় দাগ কাটা বোঝায়। ইতিহাসে ইহা প্রমাণিত যে, হজরত সুলাইমান (আঃ) এর ঘোড়া লালন পালনের বড়ই উৎসাহ ছিল এবং তিনি ঘোড়ার গুণাগুণ সম্বন্ধে খুবই পারদর্শী ছিলেন। কাজেই ইহা অতি স্বাভাবিক যে, তিনি এই আগ্রহ ও উৎসাহের কারণে উত্তম ও যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে নিজ হাতে চিহ্নিত করিতেন। তাছাড়া "আহবাবতু হু ববাল খাইরি আন যিক্‌রি রাব্বি"র মধ্যে গুনাহ স্বীকার করা নয় (যেরূপ তাহারা মনে করেন) বরং এখানে তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এবং 'আন' অক্ষরটি এখান তালীল অর্থাৎ কারণার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। যেরূপ অন্যত্র এরশাদ হইয়াছেঃ "ওয়ামা কানাসতে গফারু ইব্রাহীমা লি আবিহি ইল্লা আমমাও ইদাতিন ওয়াদাহা ইয়য়াহু"। অতএব "যিকরিএ রাবিব" কারণ স্থির হইল হুবে মালের জন্য। এখন এই আয়াতগুলির সঠিক তরজমা এইভাবে হইবে যে, সূর্য চলিয়া যাওয়ার পর অতি চমৎকার ঘোড়াগুলি যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল, তখন তিনি বলিলেন, আমি ঘোড়াগুলি আমরার আল্লাহর স্মরণের কারণে প্রিয় মনে করি। (ইহার দ্বারা জিহাদ-এ উপকার হয়)। ইহার পর সেই ঘোড়াগুলি পর্দার আড়ালে আস্তাবলে চলিয়া গেল। অতঃপর সুলাইমান (আঃ) বলিলেন যে ইহাদেরকে আবার আমার নিকটে আন। অতঃপর তিনি তাহাদের পা এবং গলায় বিশেষ চিহ্ন দিতে আরম্ভ করিলেন।

শেষ নবী হওয়ার প্রমাণ

আলা হজরত একদিন বলিলেন, সুরা মায়েদার তৃতীয় রকুতে একটি আয়াত আসিয়াছে যে,

يَاهَلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ
مِنْ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَاجَاءَ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ
جَاءَ كُمْ بَشِيْرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ, হে কিতাবের অনুসারিগণ, রসুল প্রেরণে দীর্ঘকাল বিরতির পর আমার রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছেন। তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়েতসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেছেন যাহাতে বলিতে না পার যে, কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসেন নাই। এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী আসিয়াছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

হজরত বলিলেনঃ এই আয়াতে হুজুর (সঃ) এর খাতামুন নাবীইয়ীন বা সর্বশেষ নবী হওয়ার মজবুত দলিল রহিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক নবীর নবুওয়ত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল। তাহাদের নবুওয়াত প্রমাণের জন্য মো'য়জেজা বা আলৌকিক ঘটনার একান্ত আবশ্যক ছিল এবং এই মো'য়জেজা তাহাদের জন্য ছিল যাহাদের নিকট নবীগণ আসিতেন এবং তাহারা ইহাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিত। ইহার পর সেই সম্প্রদায়ের ঐ নবীর উপর বিশ্বাস একান্ত জরুরী হইত। নতুবা তাহারা কাফির সাব্যস্ত হইত। অতঃপর যখন ইন্তেকাল করিতেন তখন তাঁহার মো'য়জেজা বা মো'য়জেজার প্রভাব বা হুকুম শেষ হইয়া যাইত।

কাজেই ঐ সময়ের পরবর্তী লোকেরা যদি ঐ মো'য়জেজা অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহারা কাফির হইবে না। কেননা, এই মো'য়জেজা তাহারা স্বচক্ষে দেখে নাই। শুধু শুনিয়াছে মাত্র। খবর অস্বীকার করাতে কাফির হয় না যখন মো'য়জেজা এবং ঐ মো'য়াজেযার দলিল প্রমাণ থাকেনা। তখন তাহার নবুওয়াত বলবৎ থাকেনা যাহা মো'য়াজেযা প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু হুজুর (সঃ) এর নবুওয়ত ইহার সম্পুর্ণ বিপরীত। কারণ তিনি কোন নির্দিষ্ট জাতি বা ক্বওমের নিকট প্রেরিত হন নাই। বরং সকল মানুষের জন্যই প্রেরিত হইয়াছেন। এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও নহে বরং কেয়ামত পর্যন্ত। ইহা প্রমাণের জন্য বড় মো'য়জেজা হইতেছে কোরআন। ইহার আগমন ও স্থায়িত্ব সালেহ (আঃ) এর উটের অথবা দাউদ (আঃ) এর কন্ঠস্বরের অথবা মুসা (আঃ) এর লাঠির অথবা ঈসা (আঃ) এর ফুৎকারের ন্যায় শুধু নবীর নিজস্ব

নিরাপত্তা পর্যন্ত সীমিত নহে বরং এই মো'য়াজেজা নবীর ইন্তেকালের পরেও কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম ও দায়েম থাকিবে। এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং রব্বুল আলামীন গ্রহণ করিয়াছেন। এরশাদ হইতেছে "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষণ এবং ইহার সনদ ও কানুন চিরকালের জন্য। অতএব যখন মো'য়জেজা স্থায়ী তখন নবুওয়াতও স্থায়ী। অন্যান্য নবীর কিতাবসমূহ শুধু কতগুলি আদেশের সমষ্টি ছিল, মোয়জেজা ছিল না। এই জন্য তাহা রক্ষিত নাই এমন কি তাহার মধ্যে অনেক সংযোজন বিয়োজন হইয়াছে। অতএব হুজুর (সঃ) এর মোয়জেজা এবং তাঁহার নবুওয়ত উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। এমতাবস্থায় অন্য কোন নবীর কি প্রয়োজন? অতঃপর আলা হজরত তাফসীরে রহুল মায়া'নীর ২০ পারার নিম্ন লিখিত আয়াতটি পড়িয়া শুনাইলেনঃ

لتنذر قوما ما اتا هم من نذير من قبلك قال العلا مة

আল্লামা ইবনে হাজার বলেনঃ আমাদের নবী (সঃ) ব্যতীত অন্য সকল নবীর রিসালাত তাঁহাদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের নবী (সঃ) এর নবুওয়াত ও রিসালাত তাঁহার ইন্তেকালের সাথে সাথে শেষ হইয়া যায় নাই। অতএব একজন নবীর নবুওয়ত থাকাকালীন এবং তাঁহার আদেশ নিষেধ চালু থাকা অবস্থায় অন্য কোন নবীর কি প্রয়োজন? এখন উল্লেখিত আয়াতের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ হে কিতাবের অনুসারিগণ অর্থাৎ হে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কিতাবের অনুসারীবৃন্দ তোমাদের নিকট আমার রসূল আসিয়াছেন যিনি এমন এক কুরআন মজীদ তোমাদের কাছে বর্ণনা করিতেছেন যাহা কোন দিনই রহিত হইবে না।

এই আয়াতটি ও উহার অর্থ প্রণিধানযোগ্যঃ

يَآاَهْلَ الْكِتٰبِ হে (বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের) কিতাব অনুসারীবৃন্দ, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তোমাদের নিকট নবীর আবির্ভাব বন্ধ থাকার পর এই রসুল (সঃ) আগমন করিয়াছেন। তিনি আল্লাহ তা'লার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ এই স্থায়ী নবী এই জন্যই প্রেরণ করিয়াছি।

আরবী শিক্ষা ব্যবস্থা ও কোরান শিক্ষা পদ্ধতি

আলা হজরত একবার বলিয়াছেনঃ আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত আরবী শিক্ষা ব্যবস্থা নিতান্ত অপূর্ণ ও ক্ষতিকর। ইহার কারণ এই যে, আরবী শিক্ষার্থীদের বর্তমানে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে যুক্তিবিদ্যা (মাকুলাত) শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। ফলে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন স্পৃহা এই শিক্ষাতেই লালিত হয় এবং তাহারা এই পদ্ধতিতে দলিলভিত্তিক শিক্ষার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। অতঃপর আসে দ্বীনি শিক্ষার পর্যায়। সে সময়

ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলার বা সামঞ্জস্য বিধানের অবকাশও থাকে না। কোরান ও হাদিস হইতে উপকার হাসিলে শিক্ষার্থী তখন ব্যর্থ হয়। কারণ শিক্ষার্থী প্রথম হইতে কোরানের শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী দলিল গ্রহণে অভ্যস্থ হয় না অথবা উহার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রও গড়িয়া উঠে না। কাজেই শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষা জীবন যে যুক্তিবাদের পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে শুরু করে, পরবর্তী জীবনের কর্মপদ্ধতিও সে অনুসরণ করে সেই একই শিক্ষা দ্বারা।

পূর্ণাঙ্গ তফসিরের অভাব

আলা হজরত একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ কোরান মজিদ নাজিল হওয়ার সময় যাহারা বর্তমান ছিলেন, নজুলের কারণ ও স্থান তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া নাজিলের উদ্দেশ্য ও অর্থ তাঁহারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেন। পক্ষান্তরে, বর্তমানে কেবল অনুমান ও অনুভবের দ্বারাই উহা উপলব্ধি ও সাব্যস্ত করিতে হয়। এ–কারণে তখনকার একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য আরবও যেভাবে কোরান মজিদকে বুঝিতে পারিতেন, বর্তমান কালের আলেম সমাজ, এমন কি উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ আলেমগণও উহা সেভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন না।

অতঃপর তিনি বলেনঃ জনাব মওলভী নূর আহমদ অমৃতসরী সাহেবকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোরান মজিদের বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তেমন কোন তফসিরের নাম আমাকে বলুন। তিনি জবাব দিলেন, মওলানা ইহা একটি অসম্পূর্ণ বিষয়। আমি প্রশ্ন করিলাম, তাহা হইলে কি করা যায়? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করুন, তিনি যেন তাঁহার কালাম পাক হৃদয়ঙ্গম করার তওফিক দান করেন এবং সেইসঙ্গে কালাম পাকের সহিত মোনাসেবাত (খাস মোহাব্বত বা সম্পর্ক) দান করেন।

হাদিস প্রসঙ্গে আলোচনা

হজরত কুদ্দুসু সিররুহু একদিন বলিলেনঃ মেশকাত শরিফে 'সাইয়েদুল মুরসালিন (সঃ)–এর ফজিলত' অধ্যায়ে বর্ণিত একটি হাদিস কাজি আইয়াজের শেফা–র ব্যাখ্যা 'নাসিমুর রেজা' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। হাদিসটি এইঃ

مَامِنَ الْاَ انبِيَاء مِنْ نَبِى الاَقَد اعطى مِن الا يات ما
مِثْلَهُ امَن عَلَيهِ البَشَر وَاَنَمَا كَانَ الَذِى اوتِيتُ وَحيَا
اَوْحَى اللهُ اِلَى فَارْجوا اَن اَكُونَ اَكثَرَهُم تَابِعا يَومَ القِيمَةِ

সকল নবীর মধ্যে প্রত্যেক নবীকেই যেমন মো'জেজা মহদুদ (সীমিত) প্রদান করা হইয়াছে, সেই অনুপাতেই (সীমিত সংখ্যক) তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে। কিন্তু আমাকে কোরানের অহীর মো'জেজা দান করা হইয়াছে যাহা আল্লাহতায়ালা আমার

উপর নাজিল করিয়াছেন। কাজেই আমি আশা করি যে, কেয়ামতের দিন অন্যান্য নবী অপেক্ষা আমার অনুসারীদের সংখ্যাই হইবে সর্বাপেক্ষা অধিক।

হজরত কুদ্দুসু সিররুহু বলেনঃ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই হাদিসের অর্থ আমি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই নাই। একবার একজন সুযোগ্য আলেম এখানে তশরিফ আনেন। তাঁহাকে আমি এই হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন, অধ্যয়নের জন্য যদি কিতাব পত্র পাই, তাহা হইলে এই হাদিস সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়া কিছু বলিতে পারিব। তাঁহাকে বিভিন্ন ধরণের অনেক কিতাবপত্র আনিয়া দেওয়া হইল। দীর্ঘ সময় এসব অধ্যায়নের পর তিনি বলিলেন, 'হাদিসটি জটিল'। অতঃপর আমি সুরা মায়েদা–র يَاأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ আয়াতের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল করিতেই এই হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থ স্বাভাবিকভাবে আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। হাদিসটির অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, অন্যান্য আম্বিয়ার মো'জেজার সময় সীমাবদ্ধ এবং তাঁহাদের দলিল ছিল একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য। কাজেই তাঁহাদের উম্মতও সীমিত সংখ্যকই হইবেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সঃ) এর মো'জেজা হইল পবিত্র কোরান এবং ইহার সময়–সীমা কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। তদুপরি সমগ্র আরব–আজম এবং শ্বেতকায়–কৃষ্ণকায় সকলের উপরই তাঁহাদের দলিল সমানভাবে প্রযোজ্য। অন্য কথায়, তিনি হইলেন সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের নবী। ইহা দ্বারাই উপলব্ধি করা যায় তাঁহার উম্মতের পরিধি কতদূর বিস্তৃত।

হজরত একদিন উপস্থিত ব্যক্তিদের বলেনঃ হাদিস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِى هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

যে ব্যক্তি আমার ন্যায় অজু করিয়া মনের মধ্যে কোন খেয়াল না আনিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িবে, তাহাকে তাহার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

হজরত বলিলেনঃ এই হাদিসের উদ্দেশ্য বলিতে পারেন কি? নামাজের মধ্যে কোন কিছুর খেয়াল আসিতে কিংবা না আসিতে দেওয়া কি কাহারও আয়ত্বাধীন? উপস্থিত ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিলেন। হজরত বলিলেনঃ খেয়াল সৃষ্টি করার অর্থ হইল ইচ্ছাকৃতভাবে কোন খেয়াল সৃষ্টি করা। অন্য কথায় নফল নামাজের সময় এদিক সেদিক লক্ষ্য করিয়া মনের মধ্যে কোন কথা না আনা। তাহা হইলেই এই দুই রাকাত নামাজের সওয়াব এত বেশী হইবে যে, তদ্বারা তাহার

পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে সমস্ত ধারণা নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে নামাজীর মনে সৃষ্টি হয়, এই হাদিসের অর্থ তাহা নহে। কারণ ইহা তাহার আয়ত্বের বাহিরে। আপনারা ইহাও ভাবিবেন না যে, ইহা শুধু নফল নামাজের বেলায় প্রযোজ্য। ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। পক্ষান্তরে ভাবিয়া দেখুন, যেক্ষেত্রে নফল নামাজের খেয়ালমুক্ত মনের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ফরজ নামাজের বেলায় খেয়ালমুক্ত মনের গুরুত্ব কতবেশী গুরুত্বপূর্ণ।

কবরে মৃতের অবস্থা

একদিন মৌলভী গোলাম মহীউদ্দিন শাহপুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হইবেঃ

مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰه

অর্থাৎ, এই লোক সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? তখন সে জবাব দিবে, তিনি আল্লাহর বান্দা।

এই হাদিস দ্বারা ইহা কি প্রমাণিত হয় যে, কবরে মৃত ব্যক্তির সম্মুখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের চেহারা মোবারক পেশ করা হয়?

এই প্রশ্নের জবাবে হজরত বলিলেনঃ এই হাদিস দ্বারা হুজুর (সঃ) এর চেহারা মোবারক দূরের কথা, তাঁহার চেহারা মোবারক সদৃশ কোন আকৃতি পেশ করার কথাও প্রমাণিত হয় না। বরঞ্চ 'হাজা' هذا শব্দটি আরবের একটি চলতি ভাষা। মনের মধ্যে কোন কথা উদয় হইলে আরবরা 'হাজা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালার পাক কালামেও এই জাতীয় শব্দ লক্ষ্য করা যায়। যথাঃ-

هٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ

"ইহা একটি মোবারক জিনিষ। আমি নাজিল করিয়াছি।' সুতরাং هٰذَا الرَّجُل অর্থাৎ এই ব্যক্তি বলার জন্য তাহার কবরে উপস্থিতির প্রয়োজন নাই।

অতঃপর হজরত বলেনঃ মোমেন বান্দার জবাবের প্রতি লক্ষ্য করুন। মোমেন বান্দার জবাব হইল, هُوَ عَبْدُ اللّٰه অর্থাৎ তিনি আল্লাহর বান্দা। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় না যে তিনি উপস্থিত নহেন। কারণ এইস্থানে 'হুয়া' একটি একবচন পুংলিঙ্গের সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হইয়াছে। তিনি যদি উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে বলা হইত "হাজা আবদ আল্লাহ" هٰذَا عَبْد اللّٰه ইনি আল্লাহর বান্দা।

আলোচনার এই পর্যায়ে মৌলভী আবদুল্লাহ লুধিয়ানী সাহেব মওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌবী সাহেব রচিত "শরহ বেকয়া" এর টিকা উমদাতুর রেয়ায়া–এর প্রথম খন্ড বাহির করিয়া আনিলেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, "হাজা" এই ইংগিতসূচক শব্দটি যদিও মন হইতে বহির্গত হইয়া জাহেরী বস্তুর প্রতি ইশারা ও অনুভূতির জন্য গঠিত হইয়াছে, তথাপি অনেক সময় ইহা দ্বারা মনের মধ্যে উদিত বস্তুর প্রতিও ইংগিত করা হইয়া থাকে। এই জাতীয় পরিভাষা কোরান মজিদ ও হাদিস শরীফে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পাক কালামে এরশাদ করেন ذلك الكتب لاريب فيه অর্থাৎ 'এই সেই কিতাব যাহার সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই'। অন্যত্র এরশাদ করা হইয়াছে,

وهوا لكتاب انزلناه مبارك

"এই মোবারক কিতাব আমি নাজিল করিয়াছি।" অতএব 'হাজা' এই ইংগিতসূচক শব্দ দ্বারা মন মস্তিষ্কে উপস্থিত বস্তুর প্রতি ইংগিত করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা দ্বারা যাহারা হুজুর (সঃ) এর সদৃশ আকৃতি অথবা হুজুর (সঃ) কে স্বয়ং কবরে হাজির হওয়ার অর্থ করিয়াছেন, তাহারা মারাত্মক ভুল করিয়াছেন।

হজরত কুদ্দুসু সিররুহু অতঃপর কবরে মৃতদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লামা সুয়ুতি রচিত 'সরহ সুদুর কি আহওয়ালে মওতা ওয়াল কবুর' পুস্তক হইতে পাঠ করিয়া শুনাইলেন, হাফেজ ইবনে হজরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, মৃত ব্যক্তির কি কাশফ হয়? তিনি কি নবী (সঃ) কে জিয়ারত করেন? তিনি জবাব দিলেন, ইহা কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিছুসংখ্যক লোক কোনপ্রকার দলিল ছাড়াই এরূপ দাবী করিয়া থাকে। কোন হাদিসে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তাহাদের নিকট শুধু দলিল আছেঃ মুনকের নকীবের সওয়াল فى هذا الرجل আর কোন দলিল নাই। অথচ এই ইশারা কেবলমাত্র জেহেনের (মনের) দিকেই করা হইয়াছে।

বাতিল মাজহাব প্রসঙ্গ

হজরত কুদ্দুসু সিররুহু একদিন বলিলেনঃ হুজুর (সঃ) ফরমাইয়াছেন, ভবিষ্যতে অনেক মিথ্যাবাদী নবী জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা প্রত্যেকেই নিজকে নবী বলিয়া দাবী করিবে। সুতরাং কাদিয়ানী সমাজের অসারতা প্রমাণের ও দজ্জালকে চিনিবার জন্য এই একটি দলিলই যথেষ্ট। এই হাদিসের বিচারে যে কোন সাধারণ মানুষ নবুওয়তের যে–কোন মিথ্যা দাবীদারকে দাজ্জাল বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিবে। কাজেই, যখনই দেখিবে কেহ নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিয়াছে, তখনই বুঝিয়া লইবে যে সে

একজন দজ্জাল। কারণ, হুজুর (সঃ) এর নবুওয়ত কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত অন্য কেহ নবী বলিয়া দাবী করিতে পারে না। দজ্জাল শব্দের অর্থ হইল সত্য ও মিথ্যাকে এমনভাবে মিশাইয়া ফেলা, সাধারণ মানুষ তাহার মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারে না। কাজেই যে মিথ্যাবাদী সজ্ঞানে নবুওয়তের মিথ্যা দাবী করে, সেই দজ্জাল।

[টিকাঃ হজরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর সময়ে এক ব্যক্তি নবুওয়তের দাবীদার বলিয়া ঘোষণা করিলে কিছু লোক তাহার এই দাবীর প্রমাণস্বরূপ মো'জেজা প্রদর্শন করিতে বলে। হজরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ফতওয়া দিলেন, যাহারা মো'জেজা প্রদর্শনের দাবী করিয়াছে তাহারাও কাফের। কারণ যে আকিদা রাখা কুফরী, সেই বস্তুকে সন্দেহজনকভাবে মানিয়া লওয়াও কুফরী। একইভাবে হজরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর কায়েল হওয়াও কুফরী। মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহজনকভাবে মানিয়া লওয়াও কুফরী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা মওদুদী সাহেব তাঁহার 'তফহীম-উল-কোরান' গ্রন্থে এ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।]

বাড়াবাড়ি ভাল নয়

একবার কুতুবখানায় রক্ষিত একটি পুস্তকে বর্ণিত একটি বিষয়ের প্রতি হজরত কুদ্দুসু সিররুহুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই পুস্তকে হিন্দুস্থানে জুময়ার নামাজকে ফরজ প্রমাণিত করা হইয়াছে। হজরত বলিলেনঃ এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা অত্যন্ত গোড়ামী প্রদর্শন করিয়াছেন। জুময়ার নামাজ নিঃসন্দেহে ফরজ। কিন্তু ইহা ফরজ হওয়ার পক্ষে আরোপিত শর্তাদি জন্নি অর্থাৎ দ্বিধামুক্ত নহে। জুময়ার নামাজ বৈধকারীবৃন্দ ও অবৈধকারিগণ প্রত্যেকে দলিল প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এব্যাপারে কাহারও কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত হয় নাই। মওলানা কাশেম নানূতবী বলিয়াছেন, এ সম্পর্কে খুব কঠোর হওয়া উচিত নহে। তিনি উত্তম উক্তিই করিয়াছেন।

অতঃপর হজরত বলেনঃ একবার আমি হজরত খাজা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন কেবলা কুদ্দুসু সিররুহুর সহিত সফরে ছিলাম। এবোটাবাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাস্তায় জনৈক মৌলভী সাহেব আরজ করিলেন, হজরত, নিকটেই আমার ওস্তাদের কবর। অনুগ্রহপূর্বক ফাতেহা করিয়া গেলে কৃতার্থ হইব। খাদেমগনসহ হজরত সেখানে গিয়া ফাতেহা পাঠ করিলেন। সেই সময় আমার নিকট কবরবাসীর অবস্থা প্রকাশ পাইল। জানা গেল, তিনি জুময়ার নামাজের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করিতেন বলিয়া কবরে তাঁহার শাস্তি হইতেছে।

হারাম পশুর চামড়া

মৌলভী মোহাম্মদ শফি সাহেব গুজ্রিয়ালী একবার হজরতের নিকট আরজ করিলেন, জনৈক গায়ের মোক্কালেদ বলিয়াছেন যে, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, কুকুর, খেঁক শিয়াল ইত্যাদি গায়ের মাকুল (যাহার গোশত খাওয়া হারাম) চামড়া জবেহ্ এর পরও পাক হয় না। কিন্তু হানাফীদের নিকট উহা পাক হইয়া যায়।

এই মাসয়ালা সম্পর্কে হজরতের মজলিসে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হইল। জায়লায়ী, জওহারুল নক্কী, সুনানে কোবরা, বায়হাক্কী, আবু দাউদের সরাহ, ইত্যাদি বহু কেতাব ঘাঁটিয়াও এ ব্যাপারে কোন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া গেল না। অবশেষে হাম্বলী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য "মগনী ইবনে কুদামা" গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৫৩ পৃষ্ঠায় এই সমস্যার সমাধানসূচক মাসয়ালা পাওয়া গেল। উক্ত কিতাবে বলা হইয়াছেঃ ইমাম শফি (রাঃ) বলেন, যখন কোন হারাম জানোয়ার জবেহ করা হয় তখন তাহার চামড়াও নাপাক থাকে। পক্ষান্তরে হজরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এবং হজরত ইমাম মালেক (রাঃ) বলেন, উহা পাক হইয়া যায়। তাঁহারা হুজুর (সঃ)-এর "দাবাগতের" (অর্থাৎ ট্যান করার) পর চামড়া পাক হইয়া যায় এই বাণীকে দলিল হিসাবে পেশ করেন। অর্থাৎ কষ প্রয়োগ করিয়া চামড়াকে পাকা করার পরই উহা পাক হইয়া যায়।

ফেরাউনের প্রতি শ্রদ্ধা

খুশাবে অবস্থানকালে হজরত একদিন বলিলেন, এই অঞ্চলের জনৈক মৌলভী সাহেব ফেরাউনের খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি তাহাকে 'ফেরাউন রহমতুল্লাহ আলায়হে' বলিতেন এবং ফেরাউন যে ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহা 'ফতুহাতে মক্কী' হইতে প্রমাণ করিতেন। অথচ কোরান মজিদ ও হাদীস শরীফের সিদ্ধান্ত মতে সে কাফের ছিল। ফতুহাত জাতীয় কিতাবগুলি কাশ্‌ফ জাতীয় কিতাব, আর কাশ্‌ফে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ কোরান-হাদিস সম্পর্কে কোন জ্ঞান অর্জন না করিয়াই তাসাউফের কিতাব লইয়া মাতিয়া উঠে। সুফীবৃন্দের কথাকেই দলিল হিসাবে গ্রহণ করিয়া কোরান মজিদের ব্যাখ্যা দান করিতে থাকে এবং ফেৎনা-ফাসাদের সৃষ্টি করে।

আমি (লেখক) আরজ করিলাম হজরত, ইহার ফলে লোকের নিকট তাহাদের নাম জাহির হইয়া যায়।

হজরত জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তাহাদের নাম জাহির হইয়া যায়। যেমন আমাদের এক মৌলভী সাহেব সবেমাত্র লেখাপড়া শেষ করিয়া আসিয়া ফতোয়া

দিলেন, পালিত গাধার গোশ্‌ত হালাল। তাহার এই ফতোয়ায় মানুষের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এক মৌলভী সাহেব তাহার সহিত তর্ক করিতে আসিলেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজনের ভীড় জমিয়া গেল। গাধার গোশ্‌ত হালালকারী মৌলভী সাহেব সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার ফতোয়া শুনিয়া আপনারা কেহ কি গাধার গোশত খাইতে শুরু করিয়াছেন? সকলেই বলিল, 'না'। তখন মৌলভী সাহেব বলিলেন, দেখুন, আমি তো কেবলমাত্র নিজের নাম জাহির করার জন্যই এই ফতোয়া দিয়াছি। আমার সেই চেষ্টা সফলও হইয়াছে। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আমার নাম প্রচার হইয়াছে। হাজার হাজার লোক আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। আমি যদি এইরূপ ফতোয়া না দিতাম তাহা হইলে আপনারা কেহই আসিতেন না। এমনকি আমাকে জিজ্ঞাসাও করিতেন না। ইহার ফলে আমি মশহুর হইলাম কিন্তু গাধার গোশ্‌ত হারাম, তাহা হারামই থাকিয়া গেল।

ফজরের দুই রাকাত সুন্নত

একদিন মৌলভী শফী সাহেব আরজ করিলেন, হজরত! ফজরের কাজা সুন্নত প্রসঙ্গে এক গায়ের মোকাল্লেদের বক্তব্য হইল, রসুলুল্লাহ (সঃ) সূর্যোদয়ের পর এই সুন্নত পড়িয়াছেন কিংবা কাহাকেও পড়িতে নির্দেশ দিয়াছেন, এইরূপ কোন সহীহ হাদিস নাই। বিষয়টি দীর্ঘ দিনের পুরাতন ব্যাপার। তবু হজরত তাঁহার স্বভাবসুলভ রীতি অনুযায়ী নূতনভাবে ইহার অনুসন্ধান শুরু করিলেন।

আমি আরজ করিলাম, মওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী সাহেব তাঁহার ফতোয়ায় বলিয়াছেন, 'যদি কেহ ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বেই সুন্নত পড়িয়া লয়, তাহা জায়েজ হইবে।'

মৌলভী শফী সাহেব বলিলেন-হাঁ, উক্ত ব্যক্তিও মৌলভী আবদুল হাই সাহেবের ফতোয়াকে দলিল হিসাবে পেশ করিয়া থাকেন।

মৌলভী আবদুল্লাহ সাহেব বলিলেন-'মৌলভী আবদুল হাই সাহেবের কথা দলিল হিসাবে পেশ করা উপযুক্ত নহে, কারণ প্রথম প্রথম মৌলভী সাহেব স্বাধীনভাবে কলম চালনা করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজের লেখনী কিছুটা সংযত করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার ফতোয়াটি প্রথম জীবনের।"

হজরত এ-প্রসঙ্গে হজরত কায়েসের (রাঃ) তিরমিজি শরীফের একটি হাদিস আলোচনা করিলেন। উক্ত হাদিসের বর্ণনা মতে ঃ হজরত কায়েস (রাঃ) বলিয়াছেন- "রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাশরীফ লইয়া আসিবার সংগে সংগেই নামাজের ইকামত দেওয়া

হইল। আমি তাঁহার সহিত ফজরের নামাজ পড়িলাম। নামাজ পড়িয়া নবী (সঃ) ফিরিয়া যাইবার সময় আমাকে নামাজ পড়িতে দেখিয়া বলিলেনঃ কায়েস! অপেক্ষা কর। দুই নামাজ এক সঙ্গে পড়িতেছ?" আমি আরজ করিলাম, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ), আমি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়ি নাই।' তিনি বলিলেন–'এখন নহে।'

এই হাদিস শরীফে বর্ণিত فَلَا اِذَنْ (তবে এখন নহে) এই শব্দ লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। ইহার শব্দগত অর্থ হইল 'তবে এখন নহে।' অর্থাৎ উদ্দেশ্য হইল তখন নামাজের সময় নহে। কিন্তু গায়ের মোকাল্লেদগণ বলেন–ইহার فَلَا حَرَجَ اِذَنْ অর্থ হইল অর্থাৎ এখন তোমার নামাজ পড়ায় কোন ক্ষতি নাই।

বহু কেতাব পড়িয়া অনুসন্ধানের পর অবশেষে 'ইবনে মাজা'–তে এই হাদিসটি পাওয়া গেল। এই মসলার সমস্যা সমাধানে হাদিসটি ছিল যথেষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য। মৌলভী আহমদ উদ্দীন সাহেব বলিলেন, 'এই হাদিসের বর্ণনাকারিগণও সহিহ বোখারী ও মোসলেম–এর বর্ণনাকারিগণের মতই নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসী।

'হজরত আবদুর রহমান–ইবনে–ইবরাহীম (রাঃ) হজরত ইয়াকুব ইবনে হামিদ–ইবনে–কাসেম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, একদিন নবী (সঃ) ফজরের দুই রাকাত সুন্নত না পড়িয়াই নিদ্রা গেলেন। তারপর সূর্যোদয়ের পর উহা কাজা পড়িলেন।

হজরত ইব্‌নে আরবী (রাঃ) প্রসঙ্গে

একবার এক ব্যক্তি হজরতের খেদমতে আরজ করিলেন, "ইব্‌নে তাইমিয়া ইব্‌নে আরবী সম্পর্কে বহু খারাপ ধারণা প্রকাশ করিয়াছেন। হজরত জবাব দিলেনঃ ইব্‌নে তাইমিয়া ত দূরের কথা, আমাদের মোল্লা আলী ক্বারী একজন বিশিষ্ট আলেম এবং সুফী হইয়াও ইব্‌নে–আরবী সম্পর্কে মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাসী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার সন্দেহ ও সংশয়ের কারণ তিনি 'সুকর' (আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতে ভাবোন্মত্ততা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। যেহেতু লোকে বলিয়া থাকে–হজরত–ইব্‌নে–আরবী (রাঃ) যাহা কিছু বলেন তাহা 'সুকর'–এর হালতেই বলিয়া থাকেন এবং 'সুকর'–এর হালতের কথা বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না, বরং উহা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। সমস্যা এইখানেই। মোল্লা আলী ক্বারীর অভিমত, হজরত মহীউদ্দীন ইব্‌নে–আরবী (রাঃ) এর সুকরই ছিল না বরং তিনি 'সহো' (সচেতন) হালতেই ইহা বলিয়াছেন। কারণ সুকর–এর হালতে কেহ কিছু লিখিতেই পারেন না।' অর্থাৎ 'সুকর' অর্থে মোল্লা সাহেব 'অবচেতন' অবস্থা বুঝিয়াছেন। অথচ 'সুকর' একটি বেজদানী কাইফিয়াত (ভাবোন্মত্তকাজনিত অবস্থা) যাহাতে মানুষ সচেতনও থাকতে পারে।

হজরত পুনরায় বলিলেনঃ কেরামের মধ্যেও সুকর (ভাবোন্মত্ততা) ও সহোর (সচেতনতা) সম্পর্কে তীব্র মতভেদ আছে। কেহ কেহ 'সুকর'–কে উত্তম মনে করেন। আবার কেহ 'সোহ্‌কে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে 'সুকর' এবং 'সোহ' কোনটাই ভাল নহে, বরং উভয় অবস্থা যৌথভাবে বিদ্যমান থাকাই উত্তম। কারণ 'সোহ'–অবস্থায় আ'রেফ তাঁহার মা'রেফাত বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ কিংবা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। তাঁহার বাকশক্তি রহিত এবং লেখনী নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, 'সুকর'–এর হালতে আরেফের বাক্‌শক্তি ও লেখনী নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়। সুতরাং হজরত মহীউদ্দীন–ইবনে–আরবী (রাঃ) যাহা কিছু লিখিয়াছেন 'সুকর'–এর হালতেই লিখিয়াছেন এবং সেই সময় তাঁহার 'হাল্‌তে–সোহ্‌' বিদ্যমান ছিল। কারণ এইরূপ সুকর–এর হালতে বাহ্য–বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ চেতনাবোধ বিদ্যমান থাকে।

কাশ্‌ফ

একদা একজন গোড়া মৌলভী সাহেব সম্পর্কে হজরত বলিলেন– 'শীঘ্র এই মৌলভী সাহেব কাদিয়ানী হইয়া যাইবে। আমি ইহা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, বরং দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতেছি।

হজরত তাঁহার নিজের কাশ্‌ফ শক্তি সম্পর্কে বলিতেনঃ একবার এই ফকিরের কাশ্‌ফ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কোন লোক সামনে আসিলেই তাহার অবস্থা আমার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িত। আমার অবস্থা দূর করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে খুব কান্নাকাটি করার পর আল্লাতায়ালার রহমতে আমার দোয়া কবুল হইয়াছে। কিন্তু এখনও এতটুকু বাকী আছে যে, যদি আমি কাহারও প্রতি মতোয়জ্জো হই, তাহা হইলে তাহার সামগ্রিক অবস্থা অবগত হইতে পারি।

হজরত মওলানা আবদুল্লাহ্‌ সাহেব (রহঃ) বলেনঃ "আল্লাহতায়ালা হজরত কুদ্দুস্‌ সিররুহকে এমন কাশফ্‌ দান করিয়াছিলেন, যাহার বাস্তবতা একমাত্র হজরত খাজা মোহাম্মদ মা'সুম সাহেব রাজিআল্লাহ্‌তায়ালা আন্‌হোর উক্তির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। হজরত খাজা মোহাম্মদ মা'সুম সাহেব তাঁহার 'মকতুবাত শরীফের' প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন– "যে বস্তু বা যে বিষয়ই হউক না কেন, আ'রেফ বিল্লাহর নিকট তাহা গোপন থাকে না।"

کر تر سنك خاره رمر مرشوی چوی بصا حب دل رسی گو
هرشوی

'যদি তুমি কঠিন প্রস্তর হও কিংবা শ্বেত মর্মরও হও, তথাপি কোন সাহেবে–দিল (কামেল ও মোকাম্মেল বুজুর্গ)–এর খেদমতে হাজির হইলে তুমি মুক্তায় পরিণত হইবে।"

– আল্লাহর অলিগণ যুগের ইসরাফিল। তাঁহারা মৃতকে জীবন দান করিয়া দেখাইয়াছেন।

এক দুই লক্ষ নহে, লক্ষ লক্ষ তালেবে মওলাকে হজরতে আকদাস মা'রেফাতের স্নিগ্ধ ধারায় অবগাহন করাইয়াছেন, পিপাসায় জীবন্মৃতকে মারেফাতের আবেহায়াত আকণ্ঠ পান করাইয়া নূতন জীবন দান করিয়াছেন। ভাবিলেও অবাক লাগে, অবিশ্বাস্য বোধ হয়। যাহারা এই সম্পদ লাভ করিয়া সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের বিষয়ে আলোকপাত করাও কঠিন। বিজ্ঞ ওস্তাদ তাঁহার অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন আর যোগ্য শাগরিদগণ স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী তদ্দারা উপকৃত হইয়াছেন। ফুলের বাগানে ভ্রমণের নেশায় মত্ত যে ব্যক্তি এখনও বাগানের দরজা ও দেওয়াল অনুসন্ধানে ব্যস্ত, বাগানের শোভা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে যাহার চক্ষু এখনও পরিচিত হয় নাই, সে বাগানের ভিতরের শোভা ও সৌন্দর্য কি ভাবে বর্ণনা করিবে।

هین که اسرا فیل دقبند اولیامرده راز الشاس حیا تست
دنما بلبل چه گقث دگل چه شنید وصسبا چه کرو

–বুলবুল কি বলিয়াছে, ফুল কি শুনিয়াছে এবং প্রভাত বায়ু কি করিয়াছে।'

পথের ধারে একজন পথিকের মত দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, এই আস্তানার খাদেমগণের মধ্যে একদল সলুকের পথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ হাসিতেছেন, কেহ কাঁদিতেছেন। কেহ শান্ত, কেহ অশান্ত। কেহ হুঁশিয়ার, কেহ বেহুশ, কেহ সবাক, কেহ নির্বাক, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্যস্থল এবং অভীষ্ট এক ও অভিন্ন। একই সৌভাগ্যশালী খিজিরের হাতে সকলের নিয়ন্ত্রণভার। তাঁহারই আধ্যাত্মিক শক্তি সকলের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তিতে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে।

سوز دل اشك روان اه سحر ناله شب
این همه از اثر لطف شما ے بنیم

"অন্তরের ব্যথা, প্রবাহিত অশ্রু, ভোরের হা–হুতাশ, রাত্রির ক্রন্দন–এই সমস্তই আপনার মেহেরবানীর ফল দেখিলাম।"

তবে এতটুকুই বুঝিলাম, কোন পর্যটককে যেমন কোলাহলপূর্ণ জনপদ মরুময় ও জনশূন্য প্রান্তর, পাহাড়–পর্বত, নদ–নদী, বাগ–বাগিচা বিভিন্ন মনজিল পার হওয়ার সময় প্রত্যেক মনজিলের পরিবেশ ও প্রভাব তাহাকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। তেমনি আস্তানার খাদেমগণের বিভিন্ন হালত বিভিন্ন মনজিলের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।

সলুকের মন্‌জিল কয়েকটিঃ বেলায়েতে সোগরা, বেলায়েতে কোবরা, বেলায়েতে উলিয়া, কামালাতে নবুয়ত। প্রথম মন্‌জিলে অবস্থানকারীদের উপর জজ্‌বার ভাব জারি হয়। এখানে তাঁহারা মানুষ দেখিলেই ভীত হন, মেলামেশার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। নির্জনতাই তাঁহারা কামনা করেন এবং নীরবতা তাঁহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। সর্বদা তাঁহারা কোন খেয়ালে মগ্ন থাকেন। নিরাশ ও ব্যর্থ প্রেমিকের মত অস্থিরতা, ভাবালুতা ও হা-হুতাশ তাঁহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্তের মত করিয়া তোলে।

ن دل نماند کش سر بستان وباغ بود ا
گوئی همیه سو خته درد وداغ بود

সামনের মন্‌জিলের দিকে অগ্রসরমান ও উন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে এক প্রকার প্রশান্তি ও পরিতুষ্টি লক্ষ্য করা যায়। তাঁহারা অনুভূতিতে ভারসাম্য, প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিকতা এবং বাতেনী অবস্থার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করিতে সক্ষম হন।

نکه شدا انش بشاه فرد خویش
یافت درما نهائے جمله درد خویش

আরও সম্মুখে অগ্রসর ও উন্নতিপ্রাপ্তদের আরও বিচিত্র এবং সূক্ষ্ম কাইফিয়তের (অবস্থার) সম্মুখীন হইতে হয়। এই পথে তাঁহাদের পদক্ষেপ দৃঢ়তর হয়। আত্মতুষ্টি ও আত্মসমর্পণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। পার্থিব বিপদ-আপদের উত্তাল তরঙ্গ তাঁহাদের পর্বততুল্য দৃঢ়তার সম্মুখে পর্যুদস্ত হইতে ও পলায়ন করিতে বাধ্য করে।

مرد حق ین که بلا راز خدائے بیند
تیغ را برسر خود بال هما مے بیند

"সত্য দ্রষ্টাগণ দুনিয়ার বালা-মুসিবতকে আল্লাহ্‌র দান বলিয়াই মনে করেন। নিজেদের মাথার উপর উদ্যত তরবারিকে তাঁহারা মাথার চুলের মতই (অর্থাৎ কিছুই নহে) মনে করেন।"

সলুকের সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ মন্‌জিল হইল কামালাতে নবুয়ত। ইহা পূর্ণ মানবতার প্রতিচ্ছবি। পরবর্তী মন্‌জিলে ফেরেশ্‌তাদের সহিত সালেকের নৈকট্য ছিল। কিন্তু এই মন্‌জিলে ফেরেশ্‌তাগণের সহিত নৈকট্য ছাড়াও তাঁহারা মানব গোষ্ঠীর খুবই কাছাকাছি আসিয়া পড়েন এবং মানুষের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড় হইয়া উঠে।

এই মনজিলে অবস্থানকালে তাঁহাদের জীবন যাপন পদ্ধতিও সাধারণ মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির মতই হইয়া উঠে। তখন তাঁহাদের অবস্থা ও সাধারণ মানুষের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ সালেক কামালের যত উচ্চ স্তরে আরোহণ করেন, তাঁহার কামালতের নিশানাসমূহও ততটুকুই গোপন থাকে। কাজেই তাঁহারা একজন সাধারণ মানুষের মতই, প্রতিভাত হন।

বিষয়টির খোলাসায় বলা যায় যে, সালেকের চেষ্টা ও সাধনা অনুযায়ী ইহাকে সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ মনজিল বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার পরও অনেক মনজিল আছে, তবে সেইগুলি কেবল আল্লাহ্তায়ালার খাস রহমত দ্বারাই লাভ করা যায়, চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা লাভ করা যায় না। এইগুলি সলুকের আবেগ অনুভূতির বাহিরের বিষয়। এই স্থান হইতেই মুজাদ্দেদীয়া তরিকার নিসবত শুরু হয়।

بسر وقت شان خلق کے ره برند
که چون اب حیوان بظلمت درند
چو یت المقدس درون پرز تاب
رها کر ده دیوار بیرون خراب

আস্তানার খাদেমগণ সলুকের প্রত্যেকটি মনজিল ও মাকাম অনুযায়ী জেকের আজকার, অজিফা–কালাম এবং মোরাকাবার তালিম পাইয়া থাকেন এবং যেইভাবে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার প্রত্যেকটি রোগীকে তাহার রুগি ও রোগ অনুযায়ী পথ্য এবং ঔষধ দিয়া থাকেন আমাদের হজরত কেবলা (রাঃ) ও সেইরূপ প্রত্যেকটি তালেবের হালত ও তবীয়ত অনুযায়ী তদবীর ও তবিয়ত করিতেন।

فیضے که بدل مے رسد از سدره وطوبی
ور سائیه سرد قد دلجوئے تو یا بم

'সিদরাতুল মুনতাহা ও তুবা হইতে যখন অন্তরে ফয়েজ আসে, তখন তোমার আস্তানার সুদীর্ঘ শীতল ছায়া অনুভব করি।'

সলুকের স্তরসমূহ অতিক্রম করার পদ্ধতি দুইটি। একটি তফসিলী সলুক। ইহা অতিক্রম করিতে হইলে জীবনের একটি বিরাট অংশ শায়েখের সান্নিধ্যে কাটাইতে হয়। সাধারণতঃ অনেকেই এই বিরাট বোঝা বহন করিতে অসমর্থ বলিয়াই আমাদের হজরত সংক্ষিপ্ত সলুক অতিক্রম করাইতেন। এজন্য প্রত্যেক সালেকের কমপক্ষে দুই বৎসর হজরতের খেদমতে অবস্থান অবশ্য কর্তব্য ছিল। যদি কেহ একাদিক্রমে দুই

বৎসর খানকা শরীফে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে হজরতের গায়েবানা তওয়াজ্জহ্ দ্বারা তিনি তরবীয়ত লাভ করিতেন। তবে তাঁহাকে মাঝে মাঝে খানকা শরীফে হাজির হইতে এবং চিঠিপত্রের আদান-প্রদান মারফত নিজের অবস্থা হজরতকে অবহিত করিতে হইত। এই অবস্থায় তাঁহার সাফল্য লাভের জন্য কমপক্ষে দশ বৎসরের প্রয়োজন হইত। এছাড়াও আছে আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও তক্দীর। তক্দীর থাকিলে কয়েক বৎসরের কাজ কয়েক দিনেই সফল হইতে পারে। তবে এজন্য মুর্শিদের খাস মেহেরবানী ও তওয়াজ্জহ্ অবশ্যই দরকার। তবে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বর্তমান ভারতের সাবেক রিয়াসত মালেরকোট্লা হইতে মওলভী আবদুল গণি সাহেব এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া খানকা শরীফে আসেন। একদিন তাঁহার রাস্তায় কাটিয়া যাওয়ায় বাকী থাকে মাত্র ছয় দিন। হজরত তাঁহাকে দৈনিক দুইবার করিয়া তওয়াজ্জহ্ প্রদান করেন। ফলে মাত্র ছয় দিনে তাঁহার ছয় লতিফা (ক্বলব, রূহ, সির্, খফি, আখ্ফা ও ক্বালেব) জারি হইয়া যায়।

মনে রাখা দরকার, এ জাতীয় ঘটনা শুনিয়া কোন সালেকের পক্ষেই কঠোর সাধনা ছাড়া এইরূপ সম্পদ লাভের আশা করা উচিত নহে। বরং ইহা অর্জন করার জন্য নিয়মিত চেষ্টা ও সাধনার পর যে সম্পদ লাভ হয়, তাহা চেষ্টা ও সাধনার পর যে সম্পদ লাভ হয়, তাহা চেষ্টা ও সাধনা ব্যতীত লব্ধ সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম। হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম কুদ্দেসা সির্রুহু বলিয়াছেন, যে সমস্ত নিসবত চেষ্টা ও কষ্টের দ্বারা লাভ করা যায় তাহা সহজলভ্য নিসবত হইতে অধিকতর মর্যাদাশীল।"— মকতুবাতে মাসূমিয়া মকতুবাত নম্বর-১২২।

زخار راه افزون مے شودسا مان پروازش
چوبرق انکس که در راه طلب اتش عنان گردد

এই সমস্ত ঘটনার উদাহরণ হইল এইরূপ যেমন কোন ভাগ্যবান লোক ক্ষেতে হাল চালাইবার সময় হঠাৎ ধনভাণ্ডার পাইয়া গেল।

যে ব্যক্তি এ ধরণের ঘটনা শুনিয়া জেকের-আজকার শোগল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় চেষ্টা ও সাধনা ত্যাগ করিয়া দুই চারি দিনেই এই সম্পদ লাভ করিতে চায়, তাহার উদাহরণ এইরূপ যেন কোন ব্যক্তি ক্ষেতে হাল চালাইতে গিয়া ধনভাণ্ডার লাভের কথা শুনিয়া তাহার সহিত প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দিল। সে সম্পদ উপার্জনের সমস্ত প্রচলিত পন্থা ত্যাগ করিয়া বনে-জংগলে, ক্ষেতে খামারে, যেখানে-সেখানে মাটি

খুঁড়িয়া বেড়ায়। ইহার ফলে সম্পদ লাভ দূরের কথা, বরং তাহার জীবন অসার্থক হইয়া যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার জীবন বিপন্ন হইয়াও উঠে। এই শ্রেণীর অতি লোভী মানুষ সমস্ত জীবন বঞ্চিত থাকিয়া যায়।

چون دامن وصال به کوشش گرنته اند
چند انکه ممکن ست نکو شد کسے چرا

"মিলনের আঁচল যখন চেষ্টা সাধনার সহিত বাঁধা, তখন যত সম্ভাবনাই থাকুক, তথাপি চেষ্টা ব্যতীত কোন উপায় নাই।"

একবার জনৈক কাশ্মিরী হজরত এর খেদমতে হাজির হইয়া একই দিনে অলি বানাইয়া দেওয়ার আরজি পেশ করিলেন। হজরত তাহার উচ্ছাসপূর্ণ কথার কোন জবাব না দিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। পরের দিন হজরত ফজরের নামাজে সুরা ত্ব হ্ শুরু করিলেন। কেরাত লম্বা হওয়ায় উক্ত ব্যক্তির হঠাৎ মাথা চক্কর খায়। তিনি জায়নামাজে পড়িয়া গিয়া মাথায় আঘাত পান। তারপর সেই দিনই তিনি বাড়ী ফিরিয়া যান।

هر سخن گوشے وهرمے سافرسے دارد جدا
شربت سیمرغ نتوان در گلوے مور ریخت

"প্রত্যেক কথার জন্য পৃথক সময় এবং প্রত্যেক শারাবের জন্য পৃথক পেয়ালা আছে। কীটের মুখে সী-মোরগের শরবত পান করা সহজ নহে।"

তরবীয়তের মুলনীতি

খানকা শরীফে অবস্থানকালে সালেকগণের যে কাজকর্ম ও শোগল দেখিয়াছি, তাহা দ্বারা আমার ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, তরবিয়তের শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল নীতি চারিটি। যথা, তায়া'ত ও ইবাদৎ। (২) জেকের ও শোগল। (৩) খেদমত এবং (৪) আদাবে সোহ্বত।

তায়া'তের অর্থ-তাবেদারীঃ দ্বীনের কাজসমূহ গুরুত্বসহকারে পালন করা। আমি প্রত্যেক জাকেরকেই তাহারত (পবিত্রতার জন্য অজু, গোসল ইত্যাদি), নামাজের সমস্ত নিয়ম কানুন গুরুত্বসহকারে পালন এবং মোস্তাহাব ওয়াক্তে জামাতে হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুত দেখিয়াছি। খানকা শরীফে বসবাসকারীদের জন্য শীতকালে গরম পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কাহারও ফরজ গোসলের প্রয়োজন হইলে পাঞ্জাবের বরফ জমা দারুণ শীতেও সালেক ঠাণ্ডা পানিতে গোসল সারিয়া ফজরের নামাজের প্রথম

রাকাতে সামিল হইতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করিতেন না। অথচ ইহা অতীব সত্য যে, ভাল ভাল নামাজীরও সেই শীতে পানি গরম করিয়া গোসল করিতে সূর্য বহু দূরে উঠিয়া যায়।

জেকের ও শোগল হইল এই তরীকার মূল বিষয়। খানকার লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাহারা সর্বদাই জেকের ও শোগলে ব্যস্ত। উজ্জ্বল দিবালোকে, অন্ধকার রাত্রিতে, জায়নামাজে, আরামের বিছানায়, খাইবার অপেক্ষায়, খাওয়া শেষে সদা-সর্বদাই সর্বত্র তাঁহাদিগকে জেকেরে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

খেদমত তরবীয়তের একটি অন্যতম বিষয়। ভিতরের মানুষটাকে গড়িয়া তোলার জন্য খেদমতের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এ কারণে হজরতের মুরীদগণের মধ্যে যাহারা সলুক লাভ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের কাহারও মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতনা।

খানকা শরীফে অবস্থানকারী তালেবে-মওলাগণের জীবন যাপন প্রণালী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, খ্যাতিসম্পন্ন শায়েখে তরীকতের সাহেবজাদাও হজরতের তরবীয়ত লাভ করিতে আসিয়া আটক নদীর তীরে মহিষ চরাইতেছেন, মসজিদ নির্মাণে মাথায় করিয়া চুণ-সুরকী-বালি বহন করিতেছেন। কেহ আবার মসজিদে অজুখানা ও খানকা শরীফের জন্য কুয়া হইতে পানি উঠাইতেছেন। ইহাদের মধ্যে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং দেওবন্দের ফাজেলও রহিয়াছেন। এইভাবে কেহ ঘোড়ার প্রতিপালনে, আবার কেহ উটনীর সেবায় নিয়োজিত। কাহারও জিম্মায় রহিয়াছে গরুর ঘাস সরবরাহ করার দায়িত্ব, আবার কেহ আছেন মেহমানদের মেহমানদারীতে লিপ্ত।

বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সালেকগণের মধ্যে যিনি যে কাজে পারদর্শী, তিনি সেই কাজেই লাগিয়া যান। যদি কেহ রশি পাকাইতে জানেন, তাহা হইলে খানকা শরীফে অবস্থানকালে তিনি রশি-ই পাকাইয়া দেন। যদি কেহ চারপায় নির্মাণ করিতে জানেন, তবে তিনি উহাই তৈয়ার করিতে থাকেন। দর্জি হইলে খানকা শরীফের জামা-কাপড় সেলাই করেন, চিকিৎসক হইলে চিকিৎসা করেন কিংবা স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেন। এইভাবে নিজ নিজ পারদর্শিতা অনুযায়ী সকলেই কাজে ব্যস্ত হইয়া যান।

এই খেদমতের মধ্যে হজরত শায়েখের কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিহিত নাই। বরং ইহার দ্বারা মুরীদের বাতেনী সাফাই-ই হইল উদ্দেশ্য। কারণ মুর্শিদের যাবতীয়

প্রয়োজন পূরণের জিম্মাদার হইলেন স্বয়ং আল্লাহ্। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার পাক কালামে এরশাদ করেন–

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ

(ওয় হুয়া ইয়া তওয়াল্লাস্ সালেহীন) "তিনিই সৎলোকদের অভিভাবকত্ব করেন।" শায়েখ মুরীদের খেদমতের প্রত্যাসী নহেন। কারণ আল্লাহ্তায়ালা যাঁহার অভিভাবক, তাঁহার আর কাহারও সাহায্য কিংবা খেদমতের প্রয়োজন নাই। সুতরাং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজনেই মুরীদের উচিত শায়েখের খেদমতে নিজেকে কোরবান করা। কারণ শায়েখ মুরীদের মোহ্তাজ (মুখাপেক্ষী) না হইলেও মুরীদ নিজের তরবীয়তের (সংশোধন) জন্য শায়েখের মোহ্তাজ হইয়া থাকেন।

منت منه كه خد مت سلطان همے كنى
منت شناس ازو كه بخد مت بدا شتت

আস্তানার খাদেমগণ ছিলেন আদব কায়দা–শিষ্টাচার ও ভদ্রতার উত্তম নমুনা। সলুকের কিতাবসমূহে যে সমস্ত আদবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা সেই সমস্ত আদবের পূর্ণ অনুসরণ করিতেন। কোন মজলিসে বসিবার সময় নিজের ছায়া হজরত শায়েখের উপর যেন পতিত না হয় তাহার প্রতি খেয়াল রাখিতেন। সঙ্গে চলার সময় লক্ষ্য রাখিতেন যেন শায়েখের পদচিহ্নের উপর নিজের পা না পড়ে।

খাদেমগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও খুবই সৌহার্দপূর্ণ। তাঁহারা সকলেই পারস্পরিক ঐক্য ও ভালবাসা বজায় রাখিতে সচেষ্ট। আত্মিক সম্পর্কই উত্তর–দক্ষিণ, পূর্ব–পশ্চিমের বিভিন্ন গোত্র ও বিচিত্র রুচির পার্থক্য দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে। এখন তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও পর বা অপরিচিত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন হিংসা–বিদ্বেষও নাই।

وَنَزَعْنَا مَافِى صُدُوْرِ هِمْ مِّنْ غِلٍّ

"তাহাদের অন্তরের সকল প্রকার হিংসা–বিদ্বেষ আমি দূর করিয়া দিয়াছি।"

আমি তরবিয়তের জন্য যে চারিটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেইগুলিই যখন হজরত খাজা মোহাম্মদ মা'সুম কুদ্দেসা সিররুহুর 'কনজুল হেদায়েত'–এ লিপিবদ্ধ হইয়াছে দেখিলাম, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম।

جدا نمے شود ازهم دو دل يكے چو شود
نمے توان زدل من كشيد پيكان را

ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হজরত কেবলা মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রচলিত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ীই খাদেমগণকে তরবীয়ত দান করিতেন।

আত্মশুদ্ধি ও তসারুরুফ

পরশ পাথরের স্পর্শে যে কোন বস্তুই স্বর্ণে পরিণত হয়, ইহা একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য। পরশ পাথরের এই গুণের কথা একটি প্রবাদ মাত্র। কিন্তু শায়েখের পরশ (তাসির) অতি বাস্তব সত্য ঘটনা। তাঁহার সোহবতের স্পর্শ যে কোন মাটির মানুষকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে, কামালাতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করিয়া দেয়। তাই কবি বলিয়াছেন–"কোন কামেল ও মোকাম্মেল পীরের সহচর্য এক আজব কিমিয়াব। নিজেকে তাহার দরজার ধুলিকণা বানাইয়া দাও, তিনি তোমাকে বহু দরজা দেখাইয়া দিবেন।'

اکسیر شد ازقرب گهر کرد یتیمی
ازد سث مده دامن روشن گهران را

বায়েত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে হজরত কেবলায়ে আ'লম কুদ্দেসা সির্‌রুহুকে এক দিন নির্জনে পাইয়া আরজ করিলাম, হজরত, কোন কোন সময় মনের মধ্যে এমন অস–অসা পয়দা হয় যে, অন্তর কাঁপিয়া উঠে। তরিকতের কেতাব পাঠ এবং বহু চিন্তা–ভাবনা দ্বারা অন্তরকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু অস–অসার যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না।"

হজরত জবাব দিলেনঃ কেতাব অধ্যয়ন দ্বারা এই রোগ দূর হইবে না। শায়েখের সোহ্‌বত হইল এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা।

হজরত সাইয়েদ আবদুস সালাম আহমদ সাহেব (রাঃ) একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, শায়েখের সোহ্‌বতে অবস্থানকালে তরীক্কত সম্পর্কে শায়েখ কোন কথা বলুন কিংবা নাই বলুন, কোন উপদেশ দেন কিংবা না–ই দেন, কোন ওয়াজ নসিহত করুন কিংবা না–ই করুন, কেবলমাত্র তাঁহার খেদমতে ও সোহবতেই বাতেনের ইসলাহ (সংশোধন), খেয়ালের তজকীয়াহ্‌–র (পবিত্রতা) জন্য যথেষ্ট। ফল এবং মেওয়ার উপর সূর্য নিজের রশ্মি দান ব্যতীত আর কিছুই করে না। কিন্তু শুধু এই রশ্মি দানের ফলেই ফল পাকিয়া রসাল হইয়া উঠে, নিজের কামালে (পূর্ণতায়) পৌছিয়া যায়। চাঁদের কিরণ ফুল–কলিদের উপর পতিত হইবার পর বিচিত্র রংয়ে রঞ্জিত হইয়া প্রস্ফুটিত ও খোশবুদার হইয়া উঠে। তেমনি কেবলমাত্র শায়েখের সোহবতের নূর এবং তাঁহার দীদারের বরকত মুরীদকে কোনস্থান হইতে কোন স্থানে পৌছাইয়া দেয় তাহার ইয়ত্তা নাই।"

در محبت ما قطره شود گو هر شهوار
از دل صدف پاك دها نيم جهان را

হজরত সাইয়েদ সাহেবের (রাঃ) এই বক্তব্যের সত্যতা পরে উপলব্ধি করিয়াছি। পরবর্তী সময়ে দেখিয়াছি, হজরত ক্বেবলায়ে আলম (রাঃ)–এর নিকট যাঁহারা বায়েত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দাড়ি মুণ্ডনকারী, বেনামাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের লোক রহিয়াছেন। কিন্তু হজরত কাহাকেও কোন দিন সংশোধনের জন্য হুকুম দেন নাই এবং কোন মুরীদকে কখনও এমন কথা বলেন নাই যাহাতে তিনি লজ্জিত হন বা মনে ব্যথা পান। অথচ হজরতের বাতেনী তওয়াজ্জোহর ফলে আস্তে আস্তে সকলেই শরিয়তের পুরাপুরি অনুসারী, পরহেজগার ও মুত্তাক্বী হইয়া যাইতেন।

نگاه مست توانرا که مستفید کند

هزار پیر خرا بات را مرید کند

হজরতের মুরিদগণের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাহাদের প্রথম জীবন খুবই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কিন্তু হজরতের ফয়েজের বরকতে আজ তাহারা তাক্বোয়া, পরহেজ্বগারী, ইবাবৎ–বন্দেগী এবং শরীয়তের তাবেদারীর আদর্শরূপে চিহ্নিত হইয়াছেন এবং তাহাদের কার্যক্রম এক অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হইয়াছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত

১। কাজী গোলাম হায়দর সাহেব মুরীদ হইতে আসিয়া বায়েতের সময় শর্ত আরোপ করিলেন, জেকের ও শোগল হইতে তাঁহাকে রেহাই দিতে হইবে। হজরত তাহার শর্ত মঞ্জুর করিয়া লইলেন। বায়েত হওয়ার কয়েক দিন পর তিনি নিজেই হজরতের খেদমতে জেকের ইত্যাদি শিক্ষা দানের জন্য আরজ করিলেন। হজরত মৃদু হাস্যে বলিলেনঃ আপনার এই আরজি তো পূর্বের চুক্তির পরিপন্থী।

২। মিয়া সাইফি সাহেব আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন যুবক এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর মরহুমের পার্টির একজন বিশিষ্ট কর্মী। হজরতের নিকট বায়েত হাসিলকালে তিনি ইংরাজী পত্র–পত্রিকা পাঠে খুবই আগ্রহী এবং অভ্যস্ত ছিলেন। হজরত বলিলেনঃ এই সমস্ত কাজ ত্যাগ করিয়া মূল্যবান সময় জেকের ও শোগলে ব্যয় করা উচিত। সাইফি সাহেব আরজ করিলেন, হজরত পত্র–পত্রিকা পাঠ ত্যাগ করা উচিত নহে।

হজরত জবাবে মৃদু হাস্য করিলেন। ইহার পর সাইফী সাহেব যখনই হজরতের সহিত সফরে গমন করিতেন, হজরত স্বয়ং রেলওয়ে বুকষ্টল হইতে ইংরেজী পত্র–পত্রিকা খরিদ করিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিতেন। কিন্তু কিছুদিন পর পত্র–পত্রিকার

উপর সাইফী সাহেবের এমন বিতৃষ্ণা জন্মায় যে তিনি পত্র–পত্রিকার নাম শুনিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন।

৩। আলী বাহাদুর নামে হাজারা জেলার জনৈক পাঠান জীবনের শুরু হইতেই ডাকাতি–রাহাজানিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। কয়েক জন অস্ত্রধারী যুবক তাহার নেতৃত্বে এই সমস্ত কাজ করিত। একবার নিজের পেশাগত কাজ করার জন্য খানকা শরীফের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় হঠাৎ সে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া খানকা শরীফে আশ্রয় লইল। আস্তানার খাদেমগণ লঙ্গরখানার খানা দ্বারা তাহার খেদমত করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পর হজরত তাহাকে দেখিয়া নাম–ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরিচয় লইয়া হঠাৎ বলিলেনঃ আলী বাহাদুর খান! আপনি তো দরবেশ হইবার যোগ্য ব্যক্তি। পরবর্তীকালে আলী বাহাদুর খান বলিয়াছেন, দরবেশ তো দূরের কথা, তখন পর্যন্ত দরবেশ শব্দের অর্থ কি তাহাই আমার জানা ছিল না। তবে ইহার পর হইতে খানকা শরীফ ত্যাগ করিতে মন চাহিতেছিল না।'

অবশেষে বাশারতওয়ালা খা'ব দেখায় পর তাঁহার সিনা খুলিয়া যায়। তিনি হজরতের দস্তমোবারকে বায়েত হওয়ার জন্য আগ্রহী ও অস্থির হইয়া উঠেন। অতঃপর মুরশীদে কামেলের খাস তওয়োজ্জহর ফলে তাঁহার অতীত জীবনের কাফ্ফারা হইয়া যায়। তিনি হজরতের খাস খাদেমদের মধ্যে অন্যতম খাদেম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

৪। শাহাপুর জেলার এক মৌলভী সাহেব শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া সাধারণ জ্ঞান–বুদ্ধিও হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে কোন কামেল শায়েখের সোহবতে থাকার পরামর্শ দেন। বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি খানকা শরীফে আসিয়া হজরতের নিকট বায়েত হন এবং কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরিয়া যান।

অতঃপর হজরতের তওয়োজ্জহর বদৌলতে মওলানা সাহেবের জীবনের গতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ আবার সেই মোহময় আকর্ষণে মওলানা সাহেবের সুপ্ত প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠে। তিনি স্থির করিলেন, রাত্রির গভীরে যখন সকলেই ঘুমে অচেতন থাকিবে তখন তিনি তাহার সান্নিধ্যে গমন করিবেন! কিন্তু মওলানা সাহেব বিছানায় গা এলাইয়া দেওয়ার পর নিজেই গভীর ঘুমে অচেতন অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন–তূলা হইতে বীজ পৃথক করিবার মত একটি বিরাট চরকার দ্বারা নারী–পুরুষের হাড়–গোশ্ত পিষিয়া ফেলা হইতেছে। মওলানা সাহেব জিজ্ঞাসা

করিলেন, কোন্ অপরাধে তাহাদের এই শাস্তি দেওয়া হইতেছে? ফেরেশ্‌তারা জবাব দিলেন, এই অসৎ নারী–পুরুষ জ্বেনায় ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকিত।

ইতিমধ্যে মওলানা সাহেব দেখিলেন, একজন আসিয়া তাহার পা ধরিয়া উল্টাভাবে তাহাকে চাকার নিকট লইয়া যাইতেছে। তখন তিনি ভীত–সন্ত্রস্ত হইয়া ঘুমের ঘোরে এমন চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, বাড়ীর সকলেই জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু এই স্বপ্ন তাঁহার মনে এমনই ভীতির সঞ্চার করিল যে, তিনি খালেস তওবার সহিত অন্তর হইতে সমস্ত বদ খেয়াল দূর করিয়া দিলেন এবং ইহার পর আর কোন বদ্ খেয়াল তাঁহার অন্তরকে টলাইতে পারে নাই।

তসাররুফাত

দুনিয়ার প্রত্যেকটি শুষ্ক ও আর্দ্র বস্তুর উপর সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু যে বস্তুর মধ্যে কিরণ ধারণের যোগ্যতা আছে, সেই বস্তু সূর্যের কিরণের দ্বারা আলোকিত না হইয়া পারে না। তেমনি, পর্বতে–প্রান্তরে সর্বত্রই বৃষ্টি ধারা পতিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র উর্বর ভূমিই বারিবর্ষণের ফলে শস্য–শ্যামল ও ফুলে–ফলে সুরভিত হইয়া উঠে। অনুরূপভাবে, কামেল পীরের বাতেনী নূর প্রত্যেক মুরীদের উপরেই পতিত হইলেও, যাহার এই নূর ধারণের ক্ষমতা আছে, তাহার মধ্যেই ইহার প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে।

হজরত কেবলার বাতেনী নূরের বরকতে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে হেদায়তে নূরে নূরান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আশ্চর্যজনক পরিস্থিতি ও পরিবেশের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁদের সম্মুখে এমন অদ্ভুত ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থেও স্থান সংকুলান হইবে না। সেসবের বিবরণ প্রদান খুব সহজও নহে।

এখানে তেমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইলঃ

১। মালের কোটলার এক মহিলার উপর দরূদ শরীফের তজ্জল্লীর এমনই অবস্থা ছিল যে, রাত্রিতে বাতি নিভাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেও দরূদের নূরে সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া থাকিত এবং দিবালোকের ন্যায় কামরার ছোট বড় সমস্ত বস্তু দেখা যাইত। লতিফাসমূহে জেকের করিলে তাহা স্পষ্টভাবে শুনা যাইত এবং মনে হইত সমস্ত মহল্লা যেন "আল্লাহ" "আল্লাহ" জেকের করিতেছে।

২। অপর এক মহিলার বিষয়ে জানা গিয়াছে, শরীরে জেকেরের প্রভাবের ফলে তিনি দুই তিন দিন যাবত আহারের কথা ভুলিয়া থাকিতেন। তাঁহার ক্ষুধাই বোধ হইত না।

৩। হুজরতের খাদেম মিস্ত্রি জনাব জহুরুদ্দীন সাহেব একবার ম্যলের কোটলায় (ভারতের পাঞ্জাবের অন্তর্ভূক্ত একটি রিয়াসত) একটি দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া নিজের তরীকার বুর্জগানে–দ্বীনের প্রশংসা করিতেছিলেন। এমন সময় একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাঁহার কথার মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, এ সমস্ত দরবেশের মধ্যে কি আছে? শুধু ব্যবসা ও পারস্পরিক হিংসা–বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নাই। মিস্ত্রী সাহেব তাঁহার এই বে–আদবীর কোন জবাব না দেওয়ায় উক্ত সরকারী কর্মচারী আরও উৎসাহিত হইয়া কৌশলে হুজরত মুজাদ্দেদ সাহেবের (রাঃ) রওজা মোবারক জিয়ারতেও তিনি কোন বৈশিষ্ট্য দেখেন নাই বলিয়া মন্তব্য করিলেন।

জনাব মিস্ত্রি সাহেব তাহার এরূপ বে–আদবী সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, আপনার দেখিবার মত চক্ষু নাই, সুতরাং আপনি কি দেখিবেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হইল। এক পর্যায় জনাব মিস্ত্রি সাহেব ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে উক্ত সরকারী কর্মকর্তা বাড়ী ফিরিয়া আতংকিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার ঘুম আসিল না। সকালে উঠিয়াই তিনি মিস্ত্রি সাহেবের নিকট মাফ চাহিয়া পত্র দিলেন। মিস্ত্রি সাহেব জবাবে বলিলেন, আমার প্রতি আপনি কোন বে–আদবী করেন নাই, সুতরাং আমার নিকট মাফ চাহিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন, তাঁহার নিকট মাফ চাহিতে পারেন। ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা হইল, আপনি যে স্থানে যে মজলিসে বে–আদবী করিয়াছেন, ঠিক সেই মজলিসে সকলের সম্মুখে মাফ চাহিবেন। উক্ত সরকারী কর্মকর্তা বাধ্য হইয়া মিস্ত্রি সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী সেইভাবেই মাফ চাহিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

৪। পাকিস্তানে পাঞ্জাবের সারগোদা শহরের মিস্ত্রি জনাব জহুরুদ্দীন সাহেব হুজরতের মুরীদ ছিলেন। তাঁহার সহিত অপর একজন রাজমিস্ত্রি কাজ করিতেন। তিনি ওহাবী খেয়ালের লোক ছিলেন। তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে হুজরত মজাদ্দেদ সাহেব (রাঃ) সম্পর্কে বে–আদবী পূর্ণ উক্তি করেন। মিস্ত্রি জহুরুদ্দীন সাহেব তাহার কথার জবাব দিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি ঘোড়া দৌড়িয়া আসিল। মজলিসের সকলেই এদিক–ওদিক ছিটকাইয়া পড়িলেন। কিন্তু ঘোড়াটি কোন দিকে না যাইয়া উক্ত মিস্ত্রির পা মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিল।

اهل دل را به بدی یاد مکن بعد از مرگ
خواب و بیداری این طائفه یکسان باشد

"ইন্তেকালের পরেও আহ্‌লে দিলগণের বদনাম করিও না। কারণ ইহাদের জন্য নিদ্রা ও জাগরণ উভয়ই সমান।"

কয়েকটি দৃষ্টান্ত

উজ্জ্বল সূর্যের দীপ্ত রশ্মির সঠিক ধারণার জন্য এখানে একটি উদাহরণ পেশ করা হইতেছে। এই ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা প্রমাণের কোন অবকাশই রাখে না। কারণ যাহাকে লইয়া ঘটনা তিনি এখনও বহাল তবীয়তেই জীবিত আছেন। তাঁহার নাম জনাব মওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী সাহেব।

১। মওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী সাহেব পাঞ্জাবের শাহ্পুর জেলার অধিবাসী। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার উচ্চশিক্ষিত আলেম এবং খুশাব মসজিদের খতীব ছিলেন। মুরীদ হওয়ার পর প্রথম জীবনে তিনি হজরত কুদ্দেসা সিররুহুর নিকট ফার্সী পড়িতে শুরু করেন। মেধাশক্তির দিক হইতে তাঁহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। হঠাৎ তাহার মেধাশক্তি এতই বাড়িয়া গেল যে, খানকা শরীফের সকলেই বিস্ময়ে হকবাক হইয়া গেলেন। তিনি যাহা কিছু একবার পড়েন, তাহাই মুখস্থ হইয়া যায়। এমনকি ৩০ পারা কোরান শরীফ তিনি মাত্র ৩৯ দিনে হেফজ করিয়া ফেলিলেন। নহো–সরফ–এর কেতাব ঘরেই পাঠ করিলেন এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য লাহোরে মাদ্রাসা রহিমিয়ায় ভর্তি হইলেন।

মাদ্রাসায় দরস–এর সময় তিনি ওস্তাদদিগকে এমন সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তাঁহাদের গলদঘর্ম শুরু হইয়া যাইত। অবশেষে নানা প্রকার অজুহাত দেখাইয়া তাঁহাকে উক্ত মাদ্রাসা হইতে বিতাড়িত করা হয়। ইহার পর তিনি অমৃতসরে যাইয়া এক মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তাঁহার অসাধারণ মেধাশক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা হইতে অত্যন্ত সম্মানের সহিত সনদ হাসিল করেন। তাঁহার মেধাশক্তির অসাধারণ পরিবর্তনের কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, একদিন হজরত আমাকে তাঁহার নিম–আস্তিন ধুইবার হুকুম দিলেন। আমি উহা আটক নদীতে ধৌত করিতে গেলাম। আমি আমার আক্বীদা অনুযায়ী নিম–আস্তিন ধুইবার পানি আঁজলা ভরিয়া পান করিতে লাগিলাম। ঐদিন হইতেই আল্লাহ্তায়ালা আমাকে অসাধারণ মেধাশক্তি দান করেন। আমি অমৃতসর হইতে হজরতকে পত্র লেখার সময় আমার সাফল্যের রহস্য আরজ করি এবং সেই সঙ্গে আমার লেখনী হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কবিতাটিও লিখিত হয়–

نیا وردم ازخا نـه چیـز سے نـخـست
تـو دادی همـه چیـز ومـن چیـز تسـت

২। পাঞ্জাবের উপকূল এলাকার একটি আরবী মাদ্রাসাসহ হাইস্কুলের শিক্ষক মওলানা নাসিরুদ্দীন সাহেব বলেন, আমাদের হাইস্কুলের শিক্ষক চৌধুরী নসরত হোসাইন, বি-এ-বি টি একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চশিক্ষিত যুবক ছিলেন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ার ফলে দ্বীনের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না। নামাজ-রোজা রাখা দূরের কথা, এসবের নাম শুনিলেও তিনি নাক সিটকাইতেন। একবার ১৯৩৪ সালে তিনি আমাদের এলাকায় তশরীফ লইয়া আসেন। খানকা শরীফ প্রত্যাবর্তনের পথে ঘটনাক্রমে হজরত ও চৌধুরী নসরত হোসাইন সাহেবকে পাশাপাশি বসিতে হয়। হজরতের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল না করিয়া সুট-বুট পরিহিত চৌধুরী সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া চলিলেন। সিগারেটের ধূঁয়ায় হজরতের খুবই অসুবিধা হইলেও নীরবে তিনি তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন। অপর দিকে এই এক ঘন্টার সোহ্বতে চৌধুরী সাহেবের অন্তরে বাতেনী ক্রিয়া শুরু হইয়া যায়।

در ساغر چشم تو ندانم شراب ست
برهر که نظر مے ذفگنی مست وخراب ست

"জানিনা, তোমার চোখের পেয়ালায় কি শারাব আছে। যেই বস্তুর প্রতিই তোমার দৃষ্টি পড়ে, তাহাই মাতাল ও উন্মাদ হইয়া যায়।" চৌধুরী সাহেব বলেন, 'কেন জানিনা, সেই এক ঘন্টার সোহবতের পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত, বর্তমান জমানায় যদি কোন গোষ্ঠী সঠিক অর্থে শ্রদ্ধার উপযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ইঁহারাই সেই গোষ্ঠী। সেই সময়েই আমার অন্তরে উচ্চ শ্রেণীর সূফীগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সুত্রপাত হয়।

মাত্র এক ঘন্টার সোহবতের ফলে জনাব চৌধুরীর মনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হওয়ার কিছুদিন পর হঠাৎ একটি অঘটন ঘটিয়া গেল। চৌধুরী সাহেবকে অতর্কিতভাবে কুকুরে কামড় দিল। কুকুরটি পাগলও ছিল না কিংবা ইতিপূর্বে কোন অপরিচিত লোককে কামড়ও দেয় নাই। তথাপি চৌধুরী সাহেব চিকিৎসকের নিকট গিয়া সতর্কতামূলক চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু তাঁহার মনের সন্দেহ দূর হইল না।

ইহার কিছুদিন পরেই চৌধুরী সাহেব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কোন হেকিম, ডাক্তার তাঁহার রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে লাগিল। অবশেষে তিনি নিজেই উপলব্ধি করিলেন, কোন কামেল শায়েখের খাস দোয়া ব্যতীত তাঁহার এই ব্যাধি দূর হইবে না।

জনাব চৌধুরী সাহেবের মনের এইরূপ অবস্থায় মৌলভী নাসিরুদ্দিন সাহেব তাঁহাকে খানকা শরীফে হজরত কেবলায় আলম (রাঃ)–এর খেদমতে হাজির হওয়ার পরামর্শ দেন।

জনাব চৌধুরী সাহেব কালবিলম্ব করিলেন না। বস্তুতঃ যখন কাহারও উপর আল্লাহ্ তায়ালার ফজল শুরু হয়, তখন মানুষের মনের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। কাজেই মৌলভী নাসিরুদ্দীন ও ডাক্তার মোহাম্মদ শরীফ 'সাহেবানকে সংগে লইয়া তিনি খানকা শরীফে হাজির হইলেন। এখানে আসিয়াই তিনি প্রথমে নামাজ পড়িলেন, হাল্কায় শরীক হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নামাজী, এমনকি তাহাজ্জদ নামাজ আদায় করিতে লাগিলেন। মনের মধ্যে সন্দেহ–সংশয়, পেরেশানীর যে অস্থিরতা ছিল, তাহা সমস্তই দূর হইয়া গেল–ব্যাধির ভীতি হইতে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

ازیں سیاہ در دناں باھل دل بگریز
که کعبه چارۂ اصحاب فیل میداند

যে চৌধুরী সাহেব নামাজের নাম শুনিলে দূরে পালাইয়া যাইতেন, গান–বাজনাই ছিল যাঁহার জীবনের প্রিয় বস্তু–তিনিই আজ জামাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসিয়া থাকেন। বিপুল অর্থ ব্যয়ে খরিদকৃত প্রাণপ্রিয় বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য তাহা পানির দামে বিক্রয় করিয়া দিলেন।

[ডাঃ মোহাম্মদ শরীফ একজন অকুতোভয় উদ্যমশীল যুবক ছিলেন। তিনি হজরতের খাস খাদেমগণের অন্যতম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে তরীকতের কঠিন মন্‌জিলসমূহ অতিক্রমের জন্য তিনি যে দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, যে–কোন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে সত্যই তাহা অনুকরণীয় ও আদর্শ স্থানীয়। তিনি নীরব থাকিতেই ভালবাসিতেন। এই পুস্তক (মূল উর্দু পুস্তক) প্রকাশনার ব্যাপারেও তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছেন। জনাব ডাক্তার সাহেব সম্প্রতি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে খানকা শরীফের পবিত্র গোরস্তানে দাফন করা হয়। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।]

হজরতের নেক নজরের বদৌলতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এইভাবে নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন, আল্লাহ্ওয়ালা হইয়াছেন। আবার তাঁহাদের অনেকের সোহবতে আরও হাজার হাজার মানুষের অন্ধকার হৃদয় মা'রেফাতের নূরের আলোকে নূরান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালার ফজলে এখনও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকিবে।

একদিন হজরত বলিলেনঃ জেকের ও শোগলের প্রাথমিক অবস্থায় জাকেরের অন্তরে বিভিন্ন খেয়াল ও দ্বিধা সংশয় (খেয়ালাত ও খাত্বরা) উদিত হয়। অন্তরে দ্বিধা সংশয়ের উদয় হয় না, এইরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। দ্বিধা–সংশয় প্রথমতঃ ক্বলবেই উদিত হয়। কিন্তু ক্বলব যখন ফানা ও বাক্বা হাসিল করিয়া লয়, তখন ইহা নফ্স হইতে উদয় হয় কিন্তু নফসের ফানা বাক্বা হাসিলের পর ইহা ক্বালেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ইহা আর ক্ষতিকর নহে। খেয়াল ও খত্বরা ক্বালেবে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর একইভাবে থাকিয়া যায়, আর দূর হয় না। তখন ইহার একমাত্র চিকিৎসা হইল ইহার প্রতি কোন গুরুত্ব না দেওয়া। *

[* হজরতের জনৈক খাদেম বলেন, আমি একদিন হজরত ক্বেবালায়ে আলম–এর খেদমতে আরজ করিলাম, আমি শুনিয়াছি এই মাক্বামে ক্বলবের মধ্যে কোন দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আমি তো ইহা এখনও অনুভব করি।' হজরত জবাব দিলেন চিন্তা করিয়া দেখুন তো ইহা ক্বলব হইতে উদিত হইতেছে, অথবা ক্বালেব হইতে। তখন আমি খেয়াল করিয়া দেখলাম, বাস্তবিক পক্ষে ইহা ক্বালেব হইতে উদিত হইতেছে। আমি পুনরায় আরজ করিলাম, হুজুর ইহার কি কোন চিকিৎসা নাই। হজরত জবাব দিলেনঃ আপনি কি ফেরেশতা হইতে চাহেন? আপনি তো মানুষ এবং ইহা মানুষের জন্য লাজেম। অতএব মৃত্যু পর্যন্ত ইহা দূর হইবে না।]

অতঃপর তিনি রেসালায়ে কোশায়রিয়ার নিম্নোক্ত অংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেনঃ–

اذا خلوا فى مواضع ذكر هم يهجس فى نفر سهم اشياء منكرة يتقفون . ان الله سبحانه منزه عن ذلك وليس يعتر يهم شبهة فى ان ذلك باطل ولكن يدوم ذلك فيشتد تأ ذيهم به حتى يبلغ ذلك حدايكون اصعب شتم بحبث لا يمكن للمزيد اجراء ذلك على اللسان فالوا جب عند هذا ترك مبا لا تهم تبلك الخوا طرو استدا مة الذكر والابتهال الى الله با ستد فاع ذلك وتلك الخوا طر ليست من وساوس الشيطن وانما هى من هوا جس النفس فاذا قا بلها العبد بترك المبالات بها ينقطع ذلك عند

যখন জাকেরিন একান্তে বসিয়া জেকের করিতে থাকেন তখন তাহাদের অন্তরে নানা প্রকারের অস্‌অসা, খেয়াল ও খত্বরা পয়দা হয়। অথচ তাহারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের এইসব ধ্যান-ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র। এবং এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা যে বাতিল, সেই সম্পর্কেও তাহাদের অন্তরে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বও থাকেনা। তথাপি স্থায়ীভাবেই এই সমস্ত খেয়াল ও খত্বরা তাঁহাদের অন্তরে উদিত হয় এবং ইহার ফলে তাঁহারা খুবই অস্বস্তি বোধ করেন। অনেক সময় ইহা এমন অশ্লীলভাবে মনের মধ্যে উদয় হয় যে, মুরিদগণ তাহা মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহস পান না। এই পরিস্থিতিতে মুরিদগণের কর্তব্য হইল, এই সমস্ত খেয়াল ও খত্বরার প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়া সর্বদাই জেকেরে লাগিয়া থাকা এবং ইহা দূর করার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কাঁদাকাটি করা। তবে ইহা শয়তানের অস্‌অসা নহে, বরং ইহা নফ্‌সের খেয়াল। যদি বান্দা এইগুলির প্রতি গুরুত্ব না দেয় তাহা হইলে ইহা স্বাভাবিকভাবেই দূর হইয়া যায়।

বিশেষ কাইফিয়াত

একদিন হজরত বলিলেনঃ জেকের ও শোগলের কাইফিয়াত ও স্বাদকে উদ্দেশ্য বানান উচিত নহে। কারণ সমস্ত ইবাদত বন্দেগী ও জেকের-ফেকরের উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত ও রেজামন্দি অর্জন করা। ইহাকেই নিস্‌বত বলা হয়। জেকের-শোগল ইত্যাদি উপায় মাত্র। জেকের-শোগলের স্বাদ কিংবা কাইফিয়াত কখনই মকসুদ হইতে পারে না। যদি কেহ ইহাকে কমসুদ বানাইয়া লয়, তাহা হইলে আসল উদ্দেশ্যের (অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার মহব্বত, মা'রেফাত, রেজামন্দী ও নৈকট্য লাভ) ফল হইতে বঞ্চিত থাকে। তবে জাকেরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে অন্তরে ইহার খুশী ও কাইফিয়াত পয়দা হইলে কোন ক্ষতি নাই। খুশী এবং কাইফিয়াত একটি নেয়ামত হইলেও যে ব্যক্তি ইহা অনুভব করেনা সেই ব্যক্তিই উত্তম। কারণ, দুনিয়ার জীবনে এবাদতের পরিবর্তে যেভাবেই হোক যতটুকু নেয়ামত লাভ হয়, আখেরারেত জীবনে ততটুকুই কম প্রতিদান পাওয়া যাইবে। প্রত্যেককে তাহার নেক আমল অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার পাক কালামে এরশাদ করেন-

ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى

"অতঃপর তাহাকে আমলের প্রতিদান দেওয়া হইবে; পুরাপুরি প্রতিদান।' (–সুরা নজম, আয়েত ২)

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নশ্বর পৃথিবীতে তাঁহার আমলের কোন প্রতিদান পায় নাই, তিনি পুরাপুরি প্রতিদানের হকদার। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন–

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

"তাহাদের প্রতিদান তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে।"

দরবেশী পোশাক

একবার আমি হজরতের খেদমতে আরজ করিলাম, দরবেশের জন্য মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে বাহ্যিক পোশাক হারাম। কিন্তু যদি কোন সালেহ্ ও মোখ্লেস ব্যক্তি মানুষের হেদায়েত এবং অনুসরণের উদ্দেশ্যে দরবেশী পোশাক পরিধান করেন এবং ইহার মধ্যে যদি নিজের কোন স্বার্থ ও দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে কি ইহা না–জায়েজ হইবে?"

হজরত জবাবে বলিলেনঃ যদি এইরূপ খালেস নিয়ত হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই। কারণ সৃষ্টির হেদায়েতই হইল উত্তম এবাদত। মানুষ যেভাবে হেদায়েৎ পায়, সে পন্থাই অবলম্বন করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে হজরত একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেনঃ হজরত বাবা ফরিদউদ্দীন শরকগঞ্জ রহমতুল্লাহ্ আলায়হে মানুষের হেদায়েতের জন্য তাঁহার এক খলিফাকে পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুর প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত এলাকায় এক হিন্দু সন্ন্যাসীর অত্যন্ত প্রভাব ছিল এবং সাধারণ মানুষ তাহার খুবই ভক্ত ছিল। বাবা সাহেবের খলিফা সেই স্থানে গমন করিয়া জনগণের উপর কোন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম না হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। হজরত বাবা শকরগঞ্জ (রহঃ) সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, আপনি সেই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কাজ করিতে থাকুন। অতঃপর উক্ত দরবেশ হোশিয়ারপুর ফিরিয়া গিয়া সম্পূর্ণ দেহে গেরুয়া বসন পরিয়া খালি মাথায় রাস্তার মোড়ে বসিয়া পড়িলেন।

শহরের দুধ বিক্রেতা মহিলাদের ভোর বেলায় দুধ লইয়া বাজারে যাওয়ার সময় দুধসহ সন্ন্যাসীর সম্মুখে হাজির হওয়ার অভ্যাস ছিল। সে প্রত্যেক পাত্র হইতে কিছু কিছু দুধ রাখিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিত। একদিন প্রত্যুষে তাহারা দেখিল, উক্ত সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাওয়ার পথে মোড়ের মাথায় একজন নূতন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন।

মহিলারা তাঁহার পাশ দিয়া যাওয়ার সময় তিনি তাহাদের ইশারা করিয়া নিজের কাছে ডাকিতে লাগিলেন। মহিলারা মনে করিল, ইনি হয়ত সেই সন্ন্যাসীর কোন শিষ্য হইবেন। অতএব তাহারা নিজের নিজের দুধের পাত্র তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তিনি দুধের পাত্রে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই উহা রক্তে পরিণত হইতে লাগিল। মহিলারা ভীত হইয়া সমস্ত দুধের পাত্র লইয়া গিয়া পূর্বের সন্ন্যাসীর সম্মুখে হাজির করিল। সন্ন্যাসী তাহাদের পাত্রগুলি দেখিয়া হতবাক হইয়া গেল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহিলারা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সন্ন্যাসী রাগান্বিত হইয়া দরবেশকে সমুচিত শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তাহার এক শিষ্যকে পাঠাইল। কিন্তু উক্ত শিষ্য দরবেশের নিকট হাজির হইয়া তাহার প্রভাবে দরবেশের সান্নিধ্যে থাকিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী আর একজন শিষ্যকে পাঠাইল। তাহারও একই দশা ঘটিল।

অবশেষে সন্ন্যাসী নিজেই দরবেশের নিকট হাজির হইয়া রাগতঃস্বরে বলিল, হয় কিছু দেখাও, না হয় কিছু দেখ। দরবেশ শান্ত কণ্ঠে হাসিয়া জবাব দিলেন, আমি তো দেখাইলাম, এখন তুমি দেখাও। সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়াই উপরের দিকে লাফাইয়া উঠিয়া বাতাসে উড়িতে শুরু করিল। দরবেশ তাহার পাদুকাদ্বয়ের প্রতি ইশারা করিলেন। পাদুকাদ্বয় আকাশে উঠিয়া সন্ন্যাসীর মাথায় আঘাত করিতে লাগিল। সে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় জড়সড় হইয়া নিকটবর্তী এক পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু পাদুকাদ্বয় তখনও তাহার পিছু ছাড়িল না। তখন সন্ন্যাসী দরবেশের নিকট আসিয়া করজোড়ে মাফ চাহিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল। পাহাড়ের গর্তটি এখনও দর্শনীয় স্থান হিসাবে আছে। গর্তটি 'সন্ন্যাসীর টক্কর' নামে প্রসিদ্ধ।

২। হজরত আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলিলেনঃ হজরত খাজা আজীজানে আ'লী রামিতানী কুদ্দেসা সিররুহু মানুষকে হেদায়েতের জন্য বাহির হন। কিন্তু মানুষ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে তিনি মানুষকে পারিশ্রমিক দিয়া নিজের নিকট বসাইয়া তওয়োজ্জহ্ দান করিতে লাগিলেন। এইভাবে মানুষের উপর তাঁহার তওয়োজ্জহ্র প্রভাব প্রসার লাভ করিল এবং পরে সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

৩। হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আল্ফেসানী কুদ্দেসা সির্রুহু তাঁহার খলিফা হজরত মীর মোহাম্মদ নো'মান (রাঃ)-কে হেদায়েত ও ইরশাদের জন্য বোরহানপুর পাঠাইলেন। তিনি সেস্থানে যাওয়ার পর কোন লোকই তাঁহার খেদমতে হাজির হইল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া ওজর পেশ করিলেন। হজরত পুনরায় তাঁহাকে তথায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এইবারও একই অবস্থায় তিনি ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

হজরত তাঁহাকে তৃতীয়বার যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এইবার জনগণ তাঁহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

কঠিন পথ

অতঃপর হজরত বলিলেনঃ বাহ্যিক পোশাকে রিয়া-র যে আশঙ্কা আছে, তাহার হাত হইতে বাঁচিয়া মজবুতভাবে এখলাসের পথ আঁকড়াইয়া থাকা খুবই কঠিন কাজ। হাজার জনের মধ্যে একজন লোকের পক্ষেও এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নহে। কাজেই যে লেবাসে (পোশাক-পরিচ্ছদ) ফকিরী দরবেশীর নিদর্শন পাওয়া যায়, আমাদের বুজর্গগণ তাহা পরিধানে বিরত থাকিতেন।

পানাহারে সতর্কতা

একদিন কথা প্রসঙ্গে হজরত পানাহারে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলিতেনঃ যাহারা বে-নামাজী এবং পবিত্রতা ও সাফায়ীর প্রতি লক্ষ্য রাখেনা, তাহাদের কোন খাদ্য খাওয়া উচিত নহে। যাহাদের আয়-আমদানী সন্দেহমুক্ত নহে, তাহাদের দাওয়াত কবুল না করাই উচিত। কারণ ইহার ফলে সিনা কালিমালিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন জেকের ইত্যাদিতেও ফল পাইতে দেরী হয়। আমি কখনও বাজারের মিষ্টি কিংবা রুটিওয়ালাদের রুটি খাই না। তাছাড়া আহার কম করাও উচিত। অবশ্য সেই সংগে আঙ্গুলের ইশারা হইতেও নিজেকে বাঁচাইতে হইবে। অর্থাৎ কেহ যেন ইশারা করিয়া না দেখায় যে, ইনি খুব পরহেজগার, মুত্তাক্বী এবং একজন উচ্চস্তরের অলি-আল্লাহ।

এ কিসের দুর্গন্ধ

মিস্ত্রি জহুরুদ্দীন সাহেব বলেন, একদিন হজরত খানা খাইতে বসিয়া বলিলেনঃ এই খাবারের মধ্যে কিসের দুর্গন্ধ অনুভূত হইতেছে। আমরা সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলাম। কারণ খুবই সতর্কতার সহিত আটা পিষিয়া পাক-সাফ হালতে রুটি তৈরী করা হইয়াছে। ডাল এবং তরকারীও সম্পূর্ণ হালাল। বিনা অজুতে কোন খাবারই রান্না করা হয় নাই। অবশেষে ভালভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, এই আটার সহিত প্রতিবেশীর ঘরের কিছু আটা মিশ্রিত করা হইয়াছে। তাহারা কিছু আটা ধার লইয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কিছু জমি বন্ধক রাখিয়াছেন, সেই জমির গম হইতেই এই আটা তৈয়ার করা হইয়াছে।

সবচেয়ে বড় গোনাহ

হুজরত বলিয়াছেনঃ একদিন আমার পীর ও মুর্শীদ হুজরত মওলানা খাজা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন সাহেব কেবলা কুদ্দেসা সির্‌রুহু আমাকে বলিয়াছিলেন–ভাই! আমি আমার মুর্শীদের নিকট হইতে ফকিরী লাভ করিতে পারি নাই। তবে এতটুকু লাভ করিয়াছি যে, টাকা–পয়সার প্রতি আমার কোন মহব্বত নাই। যদি কখনও আমার অন্তরে এমন কোন ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আগামীকালের কাজ কিভাবে চলিবে, তাহা হইলে ইহাকে আমি সবচেয়ে বড় গোনাহ্ মনে করিব।

নূতন নূতন তথ্য

হজরত একদিন বলিয়াছিলেনঃ আমি সর্বদা সর্বঅবস্থায় মকতুবাত শরীফের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করি। ইহাতে মকতুবাতের অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশ পায় এবং মকতুবাতের সহিত সম্পর্কও নিবিড় হয়। ফলে, উহার জটিল গ্রন্থীসমূহ পরিষ্কার হইয়া যায়। যেমন হাদিস শরীফে কোরান মজিদ সম্পর্কে বলা হইয়াছে–لَا تَنْقَضِی عَجَائِبُہ ইহার তত্ত্ব ও রহস্যাবলী শেষ হইবে না।" মকতুবাত শরীফের যে সমস্ত গভীর ও সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং রহস্য আমার নিকট এখনও উদঘাটিত হইতেছে, আমি তাহাকে আমার শায়েখের তওয়োজ্জুহর সূদুরপ্রসারী ফল বলিয়াই মনে করি। হজরত আমাকে বলিয়াছিলেন–'আমি প্রত্যেক সবকেই তওয়োজ্জুই দান করিব!' সুতরাং দীর্ঘ সাতাশ বৎসর পরও সম্পূর্ণ নূতন নূতন তত্ত্বও তথ্য আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

জনৈক খাদেম আরজ করিলেন, হজরত! এত দীর্ঘদিন পরেও কি তওয়াজ্জোহ্‌র আসর (প্রভাব) পাওয়া সম্ভব? তিনি জবাব দিলেনঃ হাঁ, এমনকি ইন্তেকালের পর আলমে বরজখেও শায়েখের তওয়োজ্জুহর আসর অনুভূত হইয়া থাকে।

তারপর হজরত বলিলেনঃ মওলানা আহমদ বরকী মাওয়ারাউন– নাহারের বাসিন্দা। তিনি মাত্র সাতদিন হজরত মুজাদ্দেদ সাহেব কুদ্দেসা সিররুহের খেদমতে থাকিয়া কামালাতের সর্বোচ্চ স্তর হাসিলের পর খেলাফত ও ইজাজতসহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। হজরত মুজাদ্দেদ সাহেব (রাঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন–

کرد یع در حق شما تخم ریذی بیار

'আপনার দ্বারা আমি বাস্তবিকই অধিক বীজ বপন করিয়াছি।'

তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়া পত্রের মাধ্যমে ইহার তাৎপর্য জানিতে চাহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, হজরত বীজ বপনের যে বুশারত দিয়াছিলেন, এখনও তাহার কোন ফল পাওয়া যায় নাই। ইহার জবাবে হজরত মুজাদ্দেদ সাহেব (রাঃ) লিখিলেন–

'হে মখদুম! আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু দীর্ঘদিন এমনকি এক জমানা পার হইয়া যাওয়ার পরেও ইহার ফল পাওয়া যায়; ইহা জীবিতকালে কিংবা মৃত্যুর পরেও হইতে পারে। আপনাকে মোবারকবাদ এবং জল্‌দী করিবেন না।'

হজরত বলিতে লাগিলেনঃ অনেক সময় সালেকের উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া যায় কিন্তু তিনি নিজে তাহা টেরও পান না। ইহাকে 'জেহেল নিসবত' বলা হয়। কিন্তু ইহা ক্ষতিকর নহে। আমাদের তরীক্বাতের ভাই কাজী কমরুদ্দীন সাহেবের কামালাত সম্পর্কে সকলেই জানেন। তিনি একজন উচ্চস্তরের 'সাহেবে-আসর' বুজর্গ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপরেও জেহেল নিসবতের প্রভাব ছিল। সেইজন্য তিনি ইহার আসর (প্রভাব) উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। অথচ তাহার মুরীদগণের উপর জজব্ ও সলুক প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল।

در تما شا ئے توا فت دکلاه ازسر چر خح
خبراز خؤ یش نداری چه قدر رعنائی

সবশেষে হজরত ক্বেবলায়ে আ'লম (রাঃ) বলিলেনঃ যে ব্যক্তি নক্‌শবন্দীয়া তরীক্বায় দাখেল হয় তাহার স্থির বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতে সে ফয়েজ ও বরকত হইতে মহরুম (বঞ্চিত) থাকিবে না। হজরত খাজা নকশবন্দ্‌ বোখারী কুদ্দেসা সির্‌রুহু বলিয়াছেন, ইহা সেই তরিকা যাহা সমস্ত ফজল ও মুরাদে ভরপুর। এইখানে মরহুমীর কোন স্থান নাই।

হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী কুদ্দেসা সির্‌রুহু বলিয়াছেন, "যদি কোন তাসির বুঝিতে না পারা যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।"

(মকতুবাত শরীফ। মকতুবাত নং ১৪৫ প্রথম খণ্ড)।

একবার আলোচনা প্রসঙ্গে হজরত সিল্‌সিলায়ে আ'লীয়া নক্‌শবন্দীয়ার সলুক সম্পর্কে বলিয়াছিলেনঃ দশটি লতিফা দ্বারা মানব দেহ গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাঁচটি লতিফা যথা–ক্বলব; রূহ্‌, সির্‌, খফি ও আখফাকে আ'লমে আমর্‌ এর সহিত এবং বাকী পাঁচটি আ'লমে খালক্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। আল্‌মে খালক্বের পাঁচটি লতিফার মুল হইল নফস্‌ এবং চারিটি উপাদান পানি, আগুন, মাটি ও হাওয়া। আর এই পাঁচটির

সমষ্টিতেই ক্বালেবের সৃষ্টি। আ'লমে আ'মর–এর লতিফাসমূহের উৎস হইল আ'রশের উপর এবং আ'রশের নীচে হইল আ'লমে খল্‌কের লতিফাসমূহের উৎসমূল। আ'রশ হইল দায়েরায়ে ইমকানের (সম্ভাব্য দায়েরা) কেন্দ্রস্থিত একটি রেখা। নক্‌শবন্দীয়া তরীকার বুজর্গগণ আ'লমে আ'ম্‌রের লতিফাসমূহের সায়ের ও সলুককে আ'লমে খলক্বের সায়ের ও সলুকের উপর অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন।

আমাদের হজরত পীরানে কেরাম সর্বপ্রথম ইস্‌মে জাত জেকেরের নির্দেশ দেন। আ'লমে আম্‌র–এর পাঁচটি লতিফার মধ্যে এই জেকের জারি হইয়া যাওয়ার পর, লতিফের নফস্‌–এ জেকেরের হুকুম দিয়া থাকেন। অতঃপর ক্বালেবে জেকের জারি করা। ইহা নফস্‌ ও ইহার চারিটি উপাদান দ্বারা গঠিত। ক্বালেবে জেকের করাকেই সুলতানুল আযকর বা জেকেরসমূহে সম্রাট বলা হয়।

"অতঃপর নফি–ইস্‌–বাত–এর নির্দেশ প্রদান করেন। ইহার সহিত অক্বুফে ক্বল্‌বী অর্থাৎ নিজের সমস্ত খেয়াল (তওয়াজ্জহ্‌) দিল্‌–এর দিকে এবং দিল্‌–এর খেয়াল (তওয়াজ্জহ্‌) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি হওয়া একান্ত প্রয়োজন।"

"ইহার পর মোরাকাবা আহ্‌দীয়তের সবক দিতেন। এই মোরাকবার নিয়েত–ঐ জাতি পাকের নিকট হইতে ফয়েজ পৌছিতেছে, যিনি সমস্ত পরিপূর্ণ গুণাবলীর সমষ্টি এবং সমস্ত ত্রুটি ও জওয়াল (অধঃপতন) হইতে মুক্ত ও পবিত্র। ফয়েজ অবতরণের স্থান–ক্বলব্‌। ইহাই হইল ইজমালী (সংক্ষিপ্ত) সলুকের মোটামুটি বিবরণ।"

"পক্ষান্তরে ক্বলব্‌ হইতে তফসিলী (বিস্তারিত) সলুক শুরু হয়। ক্বল্‌বের সম্পর্ক হইল তজল্লিয়ে ফে'ইলী–র সহিত এবং তজল্লিয়ে ফে'ইলী হইতেই ক্বল্‌বের 'ফানা ও বাক্বা' হাসিল হয়। ইহা হাসিলের আ'লামত হইল–আল্লাহ্‌ ছাড়া সমস্ত বস্তু হইতে সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাওয়া।"

"হজরত মুজাদ্দেদ সাহেব কুদ্দেসা সিরুরুহু ক্বলবের পর অবশিষ্ট লতিফার তস্‌ফিয়া ও তজকিয়া (পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকরণ) করাইতেন। কিন্তু হজরত খাজা মোহাম্মদ মা'সুম সাহেব (রাঃ) ও হজরত খাজা মোহাম্মদ সা'ঈদ সাহেব (রাঃ)–উভয়েই ক্বলবের পরেই নফ্‌সের প্রতি তওয়াজ্জহ্‌ দিতেন। ইহার ফলে আ'লমে আমর–এর অন্যান্য লতিফাসমূহের 'ফানা ও বাক্বা' এই দুই লতিফার অধীনে হাসিল হইয়া যাইত। কারণ পূববর্তী পদ্ধতিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় এবং সালেকের এত ধৈর্য্যও থাকে না।"

ক্কালেবের উপরোক্ত সায়ের ও সলুক জেলাল বা ছায়ার সহিত সম্পৃক্ত এবং ইহাকেই বেলায়েতে সোগরা বলা হয়। ইহার পরবর্তী মাকাম হইল–বেলায়েতে কোবরা। এই মাকামে মূলতঃ আস্‌মা (নামসমূহ) ও সেফাত (গুণাবলীর)–এর সায়েব ও সলুক হাসিল হয়। সেফাত একদিক হইতে নিজে নিজেই কায়েম অর্থাৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয়তঃ জাতের সহিত কায়েম বা অধিষ্ঠিত। ফলতঃ প্রথম দিক দিয়া সেফত–এর সম্পর্কের সূচনা আম্বিয়া আলায়হেস্‌ সালাম এবং দ্বিতীয় দিক হইতে ইহার সম্পর্কের সূচনা হইলেন মালায়েকা–কেরাম। এই জন্যই হজরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফে–সানী সাহেব (রাঃ) বলেন– "বেলায়েতে মালায়ে আ'লা আম্বিয়া আলায়হেস্‌ সালাতো ওয়াস সালামের বেলায়েত অপেক্ষা আফজল (উত্তম)। নবুয়তের দিক হইতেই আম্বিয়া আলায়হেস সালামের ফজিলত। সেইজন্য বেলায়েতে আম্বিয়াকে বেলায়েতে কোবরার সহিত এবং বেলায়েতে মালয়েকাকে বেলায়েতে উলিয়ার সহিত তা'বীর (অভিহিত বা ব্যাখ্যা) করা হয়। বেলায়েতে কোবরায় মওরেদে ফয়েজ (ফয়েজ অবতরণের স্থান) হইল লতিফায়ে–নফস্‌। ইহার মধ্যে তিনটি দায়েরা (বৃত্ত) এবং একটি কওস (অর্ধবৃত্ত) আছে। ইহার পহেলা দায়েরা বেলায়েতে সোগরার আসল (উৎস) এবং দ্বিতীয় দায়েরা প্রথমটির এবং তৃতীয় দায়েরা দ্বিতীয় এবং অর্ধবৃত্তের উৎস।

"বেলায়েতে উলিয়া–য় ফয়েজ অবতরণের (মওরেদে ফয়েজ) স্থান হইল মাটি ব্যতীত অন্যান্য উপাদান। বেলায়েত, সোগরা ও কোবরার সলুককে সলুকে ইস্‌মে জাহের এবং বেলায়েতে উলিয়া–র সলুককে সলুকে ইস্‌মে বাতেন নামে অভিহিত বা ব্যাখ্যা করা হয়। সালেক যখন এই দুটি স্তর অতিক্রম করিল, তখন যেন তিনি আ'লমে কুদস্‌ বা পবিত্র জগতে উড়িবার জন্য দুইটি ডানা সংগ্রহ করিয়া লইলেন।"

"অতঃপর মোয়ামেলা জাতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তজল্লী জাতি–র তিনটি দিক–কামালাতে নবুয়ত, কামালাতে রেসালত এবং কামলাতে উলুল্‌ আ'জম। কামালাতে নবুয়ত–এ মওরেদে ফয়েজ খাক (মাটি) উপাদান। ইহার পর হইতে শেষ পর্যন্ত মহব্বতে ওয়াহদানী (আল্লাহতায়ালার মহব্বতের) হইয়া থাকে। অর্থাৎ লতিফায়ে আ'লমে আমর্‌ ও খলক্ক্‌–এর তস্‌ফিয়া ও তজ্‌কিয়া হইয়া পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয়। আর এই সামঞ্জস্য বিধানের ফলে যে হায়বত (প্রকম্পমান) অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহা হইল আল্লাহ্‌তায়ালার ভয়।"

"বেলায়েতে সোগরার সায়ের ও সলুক ইল্‌মের সহিত সম্পর্কযুক্ত। পক্ষান্তরে, বেলায়েতে কোব্‌রা হইতে কামালাতে নবুয়ত পর্যন্ত অজুদীর সহিত সম্পর্কশীল। কামালাতে নবুয়ত ও রেসালত এবং উলুল আ'জম মাকামে সায়ের ও সলুক জাত–এর

মধ্যেই হইয়া থাকে। সংক্ষিপ্তভাবে যাহা উচ্চে আরও উচ্চে, মহান, সুমহান, অসীম, অনন্ত, যাহার সীমা-পরিসীমা নাই। ইহার পরবর্তী মাকাম হইল-হাক্কায়েকে ইলাহী, যাহার উৎস জাতে-বাহাত -এর এ'তেবার হইতে হইয়া থাকে। অতঃপর স্রেফ জাতে-বাহাত যাহাকে মা'বুদিয়াতে সরফা এবং লাতাঈন বলা হয়। হাক্কায়েক্কে আম্বিয়া, যাহা হুব্বীর সহিত সম্পর্কশীল, প্রকৃতপক্ষে উহাই হইল বেলায়েতে-কোব্‌রায় দাখিলের মাকাম। যেহেতু ইহা একেবারেই শেষভাগে মুনকাশেফ (প্রকাশিত) হইয়াছে, সেইজন্য ইহার সায়ের ও সলুক সব শেষে করা হইয়াছে।"

দশ বৎসরের পথ

একদিন হজরত বলিলেনঃ- আমাদের সিলসিলার মাশায়েখে কেরাম (রাঃ) দশ বৎসরের মধ্যে বিস্তারিতভাবে সলুক অতিক্রম করাইয়া থাকেন। ইহাতে মুরীদকে সফর ও হজর-এ (প্রবাসে ও আবাসে) সব সময়েই শায়েখের সহিত থাকিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ইজমালী (সংক্ষিপ্ত) সলুক। ইহাতে এরূপ নিরবিচ্ছিন্ন সঙ্গলাভ একান্ত প্রয়োজন নহে। ইহার জন্য কখনও কখনও শায়েখের খেদমতে হাজির হওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু আজকাল এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে বায়েত হইতে আসিয়া ইহাই চাহেন যে, হাতের তালুতে সরিষা রাখিয়া দেই আর ইহা হইতে গাছ বাহির হইয়া যায় এবং একই দিনে অলি বনিয়া যাই। অথচ বায়েত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার পর এই মোয়ামেলা সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান না কিংবা কখনো মোলাকাত করিতেও আসেন না। এ যেন খুখ লবন, বেশী যাহা মুখে দেয়া যায় না অথবা একেবারেই লবন নাই, ইহাও খাওয়া যায় না অর্থাৎ দুইটাই বেকার।

রাবেতায়ে শায়েখ

হজরত সফরে থাকাকালে একবার জনৈক ব্যক্তিকে বায়েত করার পর বলিয়াছিলেনঃ তিনটি তরীকার মাধ্যমে মরতবা হাসিল করা যাইতে পারে। একঃ জেকেরে ইস্‌মে জাত। দুইঃ জেকেরে নফি ইস্‌বাত। তিনঃ রাবেতায়ে শায়েখ। সোহ্‌বাত ও তসাওয়ার দ্বারাই রাবেতা হাসিল হয়, কিন্তু আমাদের মাশায়েখে কেরাম (রাঃ) ইহার খুব কমই নির্দেশ দিতেন।

জনৈক খাদেম আরজ করিলেন, কেন; ইহা কি ক্ষতিকর?

হজরত জবাব দিলেনঃ না, তবে সমালোচক ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিদের ফেৎনা হইতে বাঁচিয়া থাকার উদ্দেশ্যে। অন্যথায়, আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য ইহাই হইল সর্বাপেক্ষা সহজ ও কার্যকর পথ। আমাদের মাশায়েখে কেরাম (রাঃ) ইহার প্রতি

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। হজরত মুজাদ্দেদ সাহেব কুদ্দেসা সিররুহু বলিয়াছেন–'যদি কাহারও ইত্তেবায়ে শরীয়ত (শরীয়তের পূর্ণ তাবেদারী) এবং রাবেতায়ে শায়েখ (শায়েখের মহব্বতে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া) হাসিল হইয়া যায়, তাহা হইলে ইন্‌শাআল্লাহতায়ালা খাতেম–বিল–খায়ের হইবার আশা আছে।' মৌলবী খলিল আহ্‌মদ আম্বুচ মরহুম আবু দাউদের শরাহ–র পঞ্চম খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠার

باب ماجاء فى خاتم الحديث

টিকায় হজরত আলী (কঃ) বর্ণিত একটি হাদিসের দ্বারা তসাওয়ারে শায়েখের বৈধতার দলিল (প্রমাণ) পেশ করিয়াছেন এবং মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এবং তাঁহার সমস্ত অনুসারী এই দলিল (প্রমাণ) কবুল করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং রাবেতায়ে শায়েখ যে শ্রেষ্ঠপথ এবং শরীয়ত মোতাবেক জায়েজ সেই সম্পর্ক আর সন্দেহের কি অবকাশ থাকিতে পারে? এই সমস্ত আ'লেম অতি সতর্কতার দরুণ অনেকের নিকট ওহাবী বলিয়া খ্যাত হইলেও সুফীয়ায়ে কেরাম তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থক।

অতঃপর হজরত বলিলেনঃ সমস্ত কামালাতের মূলই হইল শায়েখের মহব্বত। যদি ইহা হাসিল হইয়া যায় তাহা হইলে আর কোন বস্তুরই প্রয়োজন নাই। ইহার ফলে পীরের কামালাতের আকস (প্রতিচ্ছবি) মুরীদের উপর পতিত হয়। তখন আর তওয়োজ্জহ্‌রও দরকার হয় না। যদি তওয়োজ্জহ্‌ দেওয়া হয়, তাহা হইলে আরও উত্তম–সোনায় সোহাগা! নচেৎ বিনা তওয়োজ্জহ্‌তেই কামালাত হাসেল হইতে পারে। রেসালায়ে কোশায়রিয়ার লেখক তাঁহার পীরের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, তাঁহার মজলিসে যাওয়ার সময় তিনি বে–আদবীর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। গোসল করিতেন, রোজা রাখিতেন। তাহার পর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শায়েখের খেদমতে হাজির হইতেন। তিনি বলিতেন–'এই সময় আমার অবস্থা এমন হইত যে, কেহ আমার শরীরে সূঁচ বিদ্ধ করিলেও আমি তাহা টের পাইতাম না। হজরত মীর্জা জানে–জানান মজহার শহীদ (রাঃ)–এর মুরীদ নিজের পীরের এতই তাবেদারী করিতেন যে, এমন কি বমি আসিলে হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরিয়া হজরতের খেদমতে হাজির হইয়া বমি করিবেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। হজরত আবু হাফ্‌স হাদ্দাদ (রাঃ)–এর জনৈক মুরীদেরও একই অবস্থা ছিল। পীরের মহব্বত তাঁহার উপর এতই গা'লেব (প্রবল) ছিল যে, পীরের ইজাজত ছাড়া তিনি কিছুই করিতেন না। তাঁহার কাজ ছিল তন্দুরে রুটি তৈয়ারী করা। একদিন তিনি তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন– 'হজরত তন্দুরে কি রুটি লাগাইব?" হজরত আবু হাফ্‌স (রাঃ) সেই সময় এক ব্যক্তির সহিত কথাবার্তায় মশগুল ছিলেন। খাদেমের প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। খাদেম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেবারেও কোন জবাব না পাইয়া তৃতীয়বার একই

সওয়াল পেশ করিলেন। হজরত খাদেমের বার বার একই প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া বলিলেন– "আপনি নিজেই তন্দুরে ঢুকিয়া পুড়ন।" কেবলমাত্র তো হুকুমের অপেক্ষা ছিল। তিনি যাইয়া তন্দুরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

টীকাঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম কুদ্দেসা সিররুহু বলিয়াছেন–"আমাদের তরিকায় একমাত্র রাবেতায়ে শায়েখের দ্বারাই সালেক কামালের দরজায় (পরিপূর্ণতার স্তরে) পৌঁছিতে পারে এবং রাবেতায়ে শায়েখের মধ্যে এই পথের উন্নতি সম্পূণরূপে নির্ভরশীল। সালেক যদি রাবেতার ব্যাপারে সাদেক (সাচ্চা) হইতে পারেন তাহা হইলে শায়েখের তামাম বাতেনী ফয়ূজ ও বরকাতে দ্বারা তিনি পরিপূর্ণ হইয়া যান। –মকতুবাত ৭৮ প্রথম খণ্ড।

عاشقا نراگردر اتش مے پسند ولطف دو ست
تنگ چشم گر نظر بر چشمئه کو ثر کنم (حافظ)

–আশেককে আগুনের মধ্যে দেখিতে যদি দোস্তের ভাল লাগে এবং আনন্দ হয়, তখন চোখের দৃষ্টি যদি কওসরের উৎসের দিকেও থাকে, তবু ইহা দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা।' (কবি হাফেজ)

ان گرم رو بعشق سزذ کزو کمال شوق
پروانه وش بآتش سوزان درون رود

কিছুক্ষণ পরই হজরত হাফ্সের (রাঃ) খেয়াল হইল, উক্ত ব্যক্তিতো নির্দেশ অমান্য করার পাত্র নহেন। অবশ্যই তিনি তন্দুরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি খাদেমগণকে লঙ্গরখানার দিকে দৌড়াইতে বলিলেন। তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই তিনি জ্বলন্ত তন্দুরের মধ্যে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার একটি কেশাগ্রও অগ্নিদগ্ধ হয় নাই।

کسے که سوخت بد اغ خلیل مے داند
که اتش دگران ست عشق وباغ من ست

অতঃপর হজরত বলিলেনঃ আজকাল এমন কিছু কিছু হাওয়া চালু হইয়াছে যে, এতেক্কাদ, মহব্বত ও আদব একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বায়েতও হইয়াছেন, সিলসিলার সহিত সম্পর্কও আছে, দরূদ, অজিফা অজায়েফও ঠিক আছে কিন্তু মহব্বত ও এতেক্কাদ নাই। আদবের প্রতি পা–বন্দী নাই–আর ইহাই হইল ফয়েজ ও বরকত হ্রাসের কারণ।

হজরত হাজী দোস্ত মোহাম্মদ কান্দাহারী (রাঃ) নিজে শায়েখ হজরত শাহ আহ্মদ সাঈদ কুদ্দেসা সির্রুহু সোহ্বাতে থাকাকালে নিজের হাতে তাঁহার (শায়েখের) পায়খানার গামলা সাফ করিতেন।

تا ابد رنگ کمالات زگیــرد هــرگــز
هـر کـه خاك در مـیـخانه بـر خار نر فـت

হজরত হাজী সাহেব (রাঃ) বলিতেন, "আমি যাহা কিছু পাইয়াছি, শায়েখের মহব্বতে পাইয়াছি।" আর হজরত শাহ আহ্‌মদ সাঈদ কুদ্দেসা সির্‌রুহু হজরত হাজী সাহেবের (রাঃ) জন্য বলেন–"তিনি যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহা কেবলমাত্র আমাদের প্রতি মহব্বতের জন্যই পাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে যেইরূপ মহববত করি অন্য কোন দোস্তকে সেইরূপ করি না। এই ব্যাপারে তিনি এক খাস দরজার অধিকারী।"

জেকেরের পদ্ধতি

নক্‌শবন্দীয়া সিলসিলায় প্রথমে ক্বল্‌বের মধ্যে ইস্‌মে জাত–এর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) জেকের শিক্ষা দেওয়া হয়। হজরত খাজা মোহাম্মদ মা'সুম কুদ্দেসা সির্‌রুহের মকতূবাত্‌ শরীফের শরাহ্‌ 'কনযুল হেদায়াত'–এ বলা হইয়াছে–"এই জেকেরের নিয়ম হইল, জাকের স্বীয় জিহব্যাকে তালুর সহিত লাগাইয়া একাগ্রচিত্তে (সিনার বাম পার্শ্বে স্তনের দুই আঙুল নীচে) ক্বলব্‌ সনোয়ারীর প্রতি মতওয়োজ্জহ হইবে। ক্বলব্‌–এ সনোয়ারী প্রকৃত পক্ষে ক্বল্‌ব–এ হক্বীকীরই আস্তানা এবং ইহা আ'লমে আ'মর এর সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাকে হক্বীকাতে জামেয়াও বলা হয়। অতঃপর শব্দ মোবারক "আলাহ্‌" খেয়ালের সহিত দিলের (ক্বলবের) জবানে জেকের করিতে হইবে। তবে দিলে তসওয়ার আনিবেন না কিংবা শ্বাস বন্ধ করিবেন না। এবং জেকেরের সময় ইহাকে (শ্বাসকে) কোন রকমে দখল দিতে দিবেন না। শ্বাস যেন স্বাভাবিক ভাবেই আসা–যাওয়া করে।"–মকতুব নম্বর ১১৩। দ্বিতীয় খণ্ড।

লেখকের (মূল উর্দু) অভিজ্ঞতা

উর্দূ 'তোহফায়ে' সা'দীয়া' পুস্তকের লেখক জনাব মওলানা মহবুব ইলাহী সাহেব তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–"বায়েত হওয়ার পর এই খাকসারকেও মোটামুটি এই পদ্ধতিতেই জেকের করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বায়েত হওয়ার মাত্র দুই দিন খানকা শরীফে অবস্থান করার ফলে উহা সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করিতে পারি নাই। কিছু দিন পর পুনরায় খানকা শরীফে হাজির হইয়া এই জেকের আয়ত্ত করার চেষ্টা শুরু করিলাম। কিন্তু যে গতিতে জেকের করিলে দৈনিক পঁচিশ হাজার বার জেকের করা যায়, আমার ক্বলবে অনুরূপ গতিতে জেকের জারি হইতেছিল না। "আল্লাহ্‌" এই মোবারক নামটি একবার খেয়াল করিতেই আমার কয়েক সেকেণ্ড অতিবাহিত হইয়া যাইত। এইজন্য আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম। অথচ অন্য পীর

ভাইরা কিভাবে এত দ্রুত গতিতে তসবীহ্ পাঠ করেন তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না।

"আমি একদিন হেকিম আবদুর রসুল সাহেবকে আমার পেরেশানী বর্ণনা করায় তিনি বলিলেন–'প্রথম প্রথম প্রত্যেক জেকেরকারীরাই এইরূপ হইয়া থাকে। তারপর যখন জেকের জারি হইয়া যায়, তখন ক্বলবের জেকেরের গতির সহিত তস্‌বীহ ঘুরান সম্ভব হয় না। জেকেরকারী স্বয়ং তাহার ক্বলবের আওয়াজ শুনিতে পান।"

"মৌলভী নূর আহ্‌মদ সাহেব আমাকে শান্তনা দিয়া বলিলেন, খানকা শরীফে যদি জেকের জারি করিতে কঠিন বোধ হয়,তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বাড়ী ফিরিয়া গেলে ইহা দূর হইয়া যাইবে। কারণ, কোন কোন সময় শায়েখের সোহ্‌বতের আকর্ষণ খুবই প্রবল হয়। তখন সব সময় ক্বলবের তওয়োজ্জহ্ ঠিক রাখা যায় না। অবশ্য অদৃশ্যে ক্বলব সঠিক ভাবেই নিজের কাজ করিয়া যায়।"

"মৌলভী আবদুল্লাহ্ সাহেব আমাকে বলিলেন–একবার আমি এক অফিসে একটি বিদ্যুৎ চালিত পাখা দেখিয়া উহার গতির সহিত আমার ক্বলবের জেকেরের রশি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আমার ক্বল্‌ব বিদ্যুৎ চালিত পাখা অপেক্ষাও অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন ছিল।'

"একদিন মওলানা শাহ সাইয়েদ আবদুস সালাম আহমদ সাহেব (রাঃ) এই জটিল বিষয়টি আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন– 'জেক্‌রে খফি'–তে ক্বলবের দ্রুতগতি মোটেই অসম্ভব নহে। কারণ খেয়ালের বুনিয়াদে এই জেকের করা হইয়া থাকে এবং খেয়ালের দ্রুতগতি অতি স্বাভাবিক। এক পলকে সারা দুনিয়ায় চক্কর দেওয়াতে কোন বাধা নাই। সেলাইয়ের মেশিন দেখুন, কত দ্রুতগতিতে সেলাই করিয়া চলে–উহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা যায়না। ক্বল্‌বও অনুরূপভাবে অতি দ্রুতগতিতে জেকের করিতে পারে।' অতঃপর তিনি নিজের তসবীহ্‌টি দুই আঙ্গুলে ধরিয়া সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন এইরূপ দ্রুত গতিতেও জেকের হইতে পারে। অন্য লোকে ইহাকে অসম্ভব মনে করিবেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের এই অবস্থা হইয়া গিয়াছে সেইজন্য আমাদের মধ্যে ইহা কেবল সম্ভবই নহে বরং অতি স্বাভাবিক।' এই সমস্ত কথা ও পরামর্শ আমাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল।"

ان بھا نت بھانت کی بولیوں نے مجھے
اور بھی حیرت میں تلل دیا
شد پر یشان خواب من از کثرت تعبیرها

"অধিক ব্যাখ্যায় আমার স্বপ্ন আমার জন্য আরও দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। আরও দুই একদিন ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার মধ্যেই কাটিয়া গেল। অবশেষে হজরত ক্বেবলায়ে আ'লমের নিকট এই জটিল বিষয়টি পেশ করিবার সিদ্ধান্ত করিলাম।"

بیا کہ چارہ ذوق حضور ونظم امور
بفیض بخشئی اہل نظر تونی کرو

"তারপর একদিন হজরতকে নির্জনে পাইয়া আরজ করিলাম, হুজুর আমি এখনও জেকেরের কোন কিছুই মালুম করিতে পারিতেছি না। হজরত তখন একটি কেতাব পাঠ করিতেছিলেন। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন–আমি আপনার পাঁচ লতিফা ক্বলব, রূহ, সির; খফি; আখফা–তে তওয়োজ্জহ দিয়া যাইতেছি। আপনি এই পাঁচ লতিফায় জেকের করিয়া যাইবেন। অতঃপর আমার জামা উঠাইয়া আঙ্গুলদ্বারা প্রত্যেক লতিফার স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং পর্যায়ক্রমে জোরে জোরে "আল্লাহ" "আল্লাহ" শব্দ উচ্চারণ করিলেন।"

"ইহার পর আমি নির্জনে বসিয়া জেকের করার সময় ক্বলবের মধ্যে 'আল্লাহ্' শব্দের জেকের শুনিতে পাইলাম। তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই গতি–কে আরও দ্রুত করা কিছু অসাধ্য নহে, যাহা আমার পক্ষে এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কামেল শায়েখের অঙ্গুলির নির্দেশে সেই জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।"

مشکل خویش بر پر مغان بردم دوش
کو بتائید نظر حل معماسے کرد

"বায়েতের সময়েও হজরত আমার ক্বলবে অঙ্গুলি রাখিয়া জোরে জোরে 'আল্লাহ আল্লাহ্' সবক দিয়াছিলেন। তারপর আমি যখন সেই শিক্ষাকে কাজে লাগাইতে পারি নাই এবং সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারি নাই তখন শায়েখের দোষ কি? মেকানিক মেশিন ফিট করিয়া চালু করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু মেশিনম্যান যদি এখন তাহা চালাইতে না পারেন কিংবা না চালান অথবা দীর্ঘদিন কর্মহীনভাবে পড়িয়া থাকিয়া বিকল হইয়া যায় তাহা হইলে মেকানিককে দোষ দেওয়া যায় না।"

"বায়েত হওয়ার কিছু পূর্বে আমি মিস্ত্রি জহুরুদ্দীন সাহেবকে প্রথম সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হজরত দৈনিক কতবার জেকেরের নির্দেশ দিয়া থাকেন? তিনি জবাব দিলেন–'কমপক্ষে ২৫ হাজারবার।' আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জবাব দিলাম,

ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের পক্ষে দৈনিক এত লম্বা অজিফা কিভাবে সম্ভব?"

"মিস্ত্রি সাহেব হাসিয়া বলিলেন– 'খুব সহজেই সম্ভব। কোন কোন জাকের দৈনিক কয়েক লক্ষ জেকের করিয়া থাকেন।' সেই দিন এই সমস্ত কথা আমার নিকট অদ্ভুত বরং অবিশ্বাস্যই মনে হইয়াছিল। কিন্তু আজ আমি বাস্তবে তাহাই দেখিতেছি। আমি প্রথমে ভুল করিয়া ক্বলবের কাজকে মুখের কাজের সহিত তুলনা করিয়াছিলাম। ইহার ফলেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। অর্থাৎ আমার ধারণা মুখে 'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ করিতে যেইভাবে যেই মখরজ হইতে অক্ষরগুলি উচ্চারণের বিধান আছে, জেক্‌রে খফিতেও সেই পদ্ধতি কাজে লাগাইতে হইবে। এই জন্য জেক্‌রে খফিতেও (মনে মনে ক্বলবে জেকের) মুখে জেকের (জেকরে জলী) করিবার মত আমার এত দেরী হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই উভয় আমলের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান। প্রথমটির নাম তলাফফজ (উচ্চারণ) এবং দ্বিতীয়টির নাম–তসাওয়াবুর (খেয়াল)। তলাফ্‌ফুজের কাজ ধাপে ধাপে আ'র তসওয়াবুরের কাজ বিদ্যুৎগতিতে সাধিত হয়।"

یارب این کعبه مقصود تما شاگه کیست

که مغیلان طریقش گل ونسرین من ست

যেমন হজরত শাহ্ সাইয়েদ আবদুস সালাম আহমদ সাহেব কুদ্দুসা সিররুহু বলিয়াছিলেন– জেক্‌বে খফিতে ক্বলবের দ্রুতিগতি মোটেই অসম্ভব নহে... এক পলকে সারা দুনিয়ায় চক্‌কর দেওয়াতে কোন বাধা নাই।' আর হজরত হেকিম আবদুর রসুল সাহেব বলিয়াছিলেন–'এই সংখ্যার রহস্য হইল, মানুষ দৈনিক ২৪ হাজার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে সুতরাং এই পরিমাণ জেকের করিবার ফলে মানুষের কোন নিঃশ্বাসই জেকের হইতে খালি যায় না। ইহাই হইল বান্দার হক।' আর একবার খোশাবে হজরত আমার জনৈকা পীর বোনকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'আপনি কত জেকের করেন? তিনি আরজ করিলেন–'জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সহজ নহে, তবে তসবীহ্‌র মোটামুটি একটি হিসাব রাখি।' অতঃপর তাহার বর্ণনা মতে হিসাব করিয়া দেখা গেল, তিনি দৈনিক সোয়া লাখ বার জেকের করিয়া থাকেন।'

পাঁচ লতিফার জেকের

একদিন আমি হজরতের খেদমতে আরজ করিলাম– পাঁচ লতিফায় একই সংগে জেকের করা যায় কিনা, কিংবা পৃথক পৃথক জেকের করাই উচিত? হজরত জবাব দিলেন---'পৃথক পৃথক জেকেরই বানৃছনীয়। তবে কলবের জেকের অধিক পরিমাণে

করা উচিত। তাহার পর লতিফা আখফার জেকের, অন্যান্য লতিফার জেকের ইহা অপেক্ষা কম কম করিবে। এই প্রসঙ্গে আমি হজরতকে যাহা কিছু আরজ করিয়াছিলাম এবং তিনি ইহার জবাবে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল--

প্রশ্নঃ লতিফাসমূহে জেকেরের মধ্যে কি তরতীবের পর্যায়ক্রমিক খেয়াল রাখা জরুরী?

জবাবঃ জরুরী নহে। সালেক যে তরীকায় চাহেন জেকের করিতে পারেন। কিন্তু তরতীবে পর্যায়ক্রমিক খেয়াল রাখিলে ভাল হয়। সর্বদাই জেকের ক্বলব হইতে শুরু করা উচিত।

প্রশ্নঃ ক্বলব ও অন্যান্য লতিফা জারি হইবার অর্থ কি?

জবাবঃ ইহার অর্থ হইল, ইহাতে হরকত্ (স্পন্দন) পয়দা হইয়া যাওয়া। কখনও কখনও ইহার তাবেদারীতে শরীরেও হরকত শুরু হয়। কিন্তু ইহা জরুরী নহে। কারণ মকসুদ হইল তওয়োজ্জহ্ ইল্লাল্লাহ্ (অর্থাৎ সদা-সর্বদা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি তওয়োজ্জহ্ বা খেয়াল)। যখন লতিফাসমূহ আল্লাহ তায়ালার প্রতি এমন মতওয়োজ্জহ হইয়া যায় যে, কোন কর্মব্যস্ততা কিংবা কোন দৃশ্যপট ইহাকে আল্লাহতায়ালার ইয়াদ হইতে গাফেল করিতে পারে না, তাহাকেই 'জারি হইয়া যাওয়া' বলা হয়। যেমন চক্ষুর কাজ হইল দর্শন করা, কর্ণের কাজ হইল শ্রবণ করা। যদি চক্ষু খোলা থাকে এবং সম্মুখে কোন দৃশ্য আসিয়া যায়, তাহা হইলে চক্ষু ইহা দর্শন না করিয়া পারে না। অনুরূপভাবে শ্রবণশক্তি যদি ঠিক থাকে তাহা হইলে কর্ণের পক্ষে যে কোন আওয়াজ শ্রবণ না করা অসম্ভব। লতিফা জারি হইয়া যাওয়া ঠিক এইরূপ। লতিফাসমূহের উপর যখন জেকেরের এইরূপ গাল্বা (প্রাধান্য) হইয়া যায় যে, জাকের কোন অবস্থাতেই তাহাকে বন্ধ রাখিতে পারে না, তখন তাহাকেই বলে লতিফা জারি হওয়া। যেই ব্যক্তির লতিফা জারি হইয়া গিয়াছে, দুনিয়ার কাজকর্মে মশগুল হইয়া তিনি লতিফাসমূহের প্রতি গাফেল হইতে পারেন, কিন্তু লতিফাসমূহ নিজের কাজ করিতেই থাকে। উক্ত ব্যক্তির দুনিয়ার কাজ কর্মের ব্যস্ততা লতিফাসমূহকে তাহার নিজের কাজ হইতে বিরত রাখিতে পারে না। একটি ঘড়ির সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন ঘড়িওয়ালা যে কাজেই মশগুল থাকুন কিংবা যেদিকেই ইচ্ছা মনেযোগ দেন, তাহার পকেটের কিংবা হাতের ঘড়ি নিজের কাজ করিতেই থাকিবে।

প্রশ্নঃ অনেক সময় জেকেরকারী তাসবীহ পড়ার সময় এদিক সেদিক তাকাইতে থাকেন, কাহারও কথা শুনেন, ইশারায় অথবা হাঁ হুঁ ইত্যাদি শব্দ করিয়া জবাব দেন। এইরূপ জেকের করা কি দুরস্ত আছে?

জবাবঃ প্রাথমিক অবস্থায় জেকেরের সময় নির্জনতা ও সমস্ত পরিবেশ হইতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। অতঃপর যখন তওয়োজ্জহ ইলাল্লাহ্ মজবুত ও সুদৃঢ় হইয়া যায়, তখন পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত, কাহারও কথায় কর্ণপাত কিংবা ইশারায় কাহারও প্রশ্নের জবাব দান ক্ষতিকর নহে। কারণ এই সময় "দিল্ ব-ইয়ার এবং দস্ত ব-কার" মোয়ামেলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ হওয়া মুশকিল। কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ ক্বলবের গুপ্তচরের কাজ করিয়া থাকে। তখন আত্মশুদ্ধির জন্য আত্মাকে (ক্বলব) এই পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা একান্ত কর্তব্য। এইজন্য বুজর্গানে দ্বীন জেকেরের সময় অন্ধকার ছোট কামরার মধ্যে জেকেরের নির্দেশ দিতেন। কারণ ইহার ফলে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং একাগ্রতা আসে। এই নির্জনতার আসল উদ্দেশ্য হইল ক্বলবকে অস্অসামুক্ত রাখা।

"যাহাতে ক্বলবের সাফায়ী বজায় রাখা এবং মালিন্য দূর করার জন্য নক্শবন্দীয়া তরীকার বুজর্গগানে-দ্বীন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসমে জাত ও নফি-ইস্-বাত-এর জেকের ও তাহ্লীলে-লিসানী অপরিহার্য মনে করেন। যেহেতু প্রতিদিন ক্বলবের মলিনতার নূতন নূতন উপকরণ সৃষ্টি হয়, সেইজন্য তাহা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দিন তাহার চিকিৎসারও প্রয়োজন। অর্থাৎ মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের হইতে পরহেজ, চরিত্রহীন ও অধার্মিকদের সংশ্রব ত্যাগ, পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য কোন কোন বুজুর্গ নিজের রুটি নিজেই প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কারণ অপরের হাতে তৈরী রুটি এতমেনানের কাবেল হয় না। শায়েখের বাসনাদি নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত রাখার ইহাও একটি অন্যতম কারণ। মুরীদের জন্য আদবের খাতিরে শায়েখের বাসনাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইহার সমস্ত কিছুরই মূল হইল মালিন্য হইতে দূরে থাকা। হজরত মীর্জা জানে জানান মজহার শহীদ (রাঃ) একবার তাঁহার পীর হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ূনীর (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হওয়ার সময় পথিমধ্যে একজন শারাবী (মদ্যপায়ী) তাহার পাশ দিয়া পথ অতিক্রম করে। তিনি শায়েখের খেদমতে হাজির হইলে হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ূনী (রাঃ) বলিলেন- 'আপনার নিকট হইতে শরাবের গন্ধ আসিতেছে।"

বিভিন্ন ঘটনা

ওলীআল্লাহগণের মৃত্যুর পরঃ

আলা হজরত একবার ওলী আল্লাহদের আলোচনা করার সময় বলিলেনঃ খোশাবে এক জায়গায় শ্রমিকগণ প্রত্যুষের অন্ধকারে মাটি খনন করিতেছিল। হঠাৎ এক জায়গায় কোপ পড়িলে বিদ্যুতের ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হইল। শ্রমিকগণ ভয় পাইয়া পিছনে সরিয়া গেল। লোক জানাজানি হইল। জানা গেল যে, এখানে কবর আছে। কবর খনন করা হইল। দেখা গেল, কবরটি নূরে ভরপুর (আলোয় ভরপুর)। কাফন পচিয়া গিয়াছে। কিন্তু শরীর নিখুঁত এবং ঠিক ছিল। এমন কি একজন নির্ভরযোগ্য লোক বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিবার জন্য চুল ধরিয়া একটু জোরে টানিয়া দেখিলেন, তাহা এখনও শক্তই আছে।

অতঃপর হজরত বলিলেনঃ ওলী আল্লাহদের দেহের রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহ নিজেই করেন। নবীগণের দেহের হেফাজতের কথা প্রমাণিত আছে। নবীগণের পরেই ওলী আল্লাহগণের স্থান।

অতঃপর তিনি বলিলেনঃ একবার আটক নদীর তীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। একটি বড় মাটির চাকা নদীতে পড়িয়া গেলে দেখা গেল, একটি লাশ কাফনে জড়ানো অবস্থায় বাহির হইয়া পানিতে ভাসিতে লাগিল, অতঃপর কিছুদুরে যাইয়া সেই লাশটি পানির উপর থামিয়া গেল। ইতিমধ্যে আর একটি মাটির বড় চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তাহার মধ্যে হইতেও আর একটি লাশ বাহির হইল এবং পানিতে ভাসিতে ভাসিতে প্রথম লাশটির নিকট পৌঁছিল। অতঃপর দুইটি লাশ একসাথে ভাসিতে ভাসিতে দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারপর আলা হজরত বলিলেনঃ হজরত আমীরে মুয়ারীয়া (রাঃ) একবার একটি খাল খনন করাইতেছিলেন। সম্মুখে একটি কবর ছিল। তিনি হুকুম দিলেন, লোকজন যেন নিজ নিজ আত্মীয়–স্বজনের লাশ বাহির করিয়া অন্যত্র দাফন করেন। জনগণ তাহাই করিল। বিশ বৎসর পূর্বেকার লাশও তাহাতে ছিল। কোন কোন লাশ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, এখনই উহা দাফন করা হইয়াছে। এমন কি কোন কোন লাশের হঠাৎ আঘাত লাগিলে তাহা হইতে রক্তও বাহির হইতে দেখা গিয়াছে।

জীবের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া আলা হজরত বলিলেনঃ শুনিয়াছি একবার কোন একদল করাতী একটি গাছ চেরাই করিতেছিল। করাত চালাইতে চালাইতে উহা গাছের মাঝামাঝি পৌঁছিল। তখন করাত বাঁকা চলিতে লাগিল। করাতীদের অনেক চেষ্টা সত্বেও করাত বাঁকিয়াই চলিতে থাকিল। শেষ পর্যন্ত

যখন গাছটি দুই টুকরা হইয়া গেল তখন হঠাৎ তাহার মধ্য হইতে একটি গুই সাপ বাহির হইয়া পালাইয়া গেল। দেখা গেল যে ,করাত ঐ জায়গা দিয়াই বাঁকিয়া গিয়াছিল যেখানে গুই সাপটি তাহার গর্তে বসা ছিল।

বিলকিসের সিংহাসন

আশ্চর্য্য ঘটনার বর্ণনায় বিলকিসের সিংহাসন হাজার হাজার মাইল দূর হইতে এক পলকের মধ্যে আসা সম্পর্কে আলা হজরত বলিলেনঃ হজরত শাইখে আকবর আলাইহির রাহমার জন্য করুণা হয়। তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে এই রূপ ব্যাখা করেন যে, বিলকিসের সিংহাসন হুবহু সাবাহ হইতে হজরত সুলাইমান (আঃ) এর নিকটে আসে নাই বরং নিঃশেষ হইয়া এখানে পুনরায় সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ এই ব্যাখা যদি ঘটনার দূরত্বের ব্যাপারে তিনি অসম্ভব মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে নাই হইতে আছে কথাটি আশ্চর্য্য নয় কি? কারণ একই বস্তুর একস্থানে বিলীন হইয়া পর মুহূর্তে (হাজার মাইল দূরের) অন্যত্র সৃষ্টি কি করিয়া তিনি সম্ভব মনে করিয়াছিলেন?

মহিলাদের ধর্মহীনতা

একবার মহিলাদের ধর্মহীনতার আলোচনা হইতেছিল। আলা হজরত বলিলেনঃ বর্তমানে মেয়েদের শরীয়াত বিরুদ্ধে কার্যকলাপ সীমাহীন বাড়িয়া গিয়াছে। লেখক বলেন যে, আমাদের অঞ্চলের মেয়েরা ফরজ, ওয়াজীব এবং অন্যান্য সকল নামাজ বসিয়া পড়ে। বরং কেহ কেহ এই কথাও বলে যে, মেয়েদের জন্য বসিয়া নামাজ আদায় করার হুকুম আছে। কারণ ইহাতে বেশী বেশী পর্দা রক্ষা হয়। অনেকবার তাহাদিগকে কিতাব দেখাইয়া বুঝান হইলেও কোন কাজে আসে নাই। আলা হজরত ইহা শুনিয়া খুবই আশ্চর্য্য হইলেন এবং বলিলেনঃ সিন্ধু অঞ্চলের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও দুঃখজনক। সেখানে মেয়েদের মধ্যে নামাজের প্রচলনই নাই। আর যদি কোন আল্লাহর বান্দি নামাজ শুরু করে তাহা হইলে অন্য মেয়েরা তাহাকে ঠাট্টা ও তিরস্কার করিতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, না জানি সে এমন কোন বড় পাপ করিয়াছে যাহার জন্য নামাজ পড়িয়া পড়িয়া মুক্তি (মাফ) পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং কেরামত

আলা হজরত একবার বলিলেন, বিলায়েতের অর্থ যে কোন অবস্থায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। এজন্য আল্লাহর স্মরণ (জিকির) সর্বদা জরুরী। নৈকট্য যে পরিমাণ ঘনিষ্ঠ হইবে ওলীর দরজায় উন্নতি ও পরিপূর্ণতা সেই পরিমাণ সাধিত হইবে। কিন্তু লোকেরা ভুলবশতঃ শুধু কেরামতকেই কামেল পীরর লক্ষণ বলে মনে করে। অথচ ইহা অতি নগণ্য। খাজা আব্দুল খালেক গাজদোয়ানী (রঃ) এর নিকট একবার এক

ব্যক্তি আরজ পেশ করিলেন, অমুক ব্যক্তি বাতাসে উড়ে। তিনি বলিলেনঃ ইহা কোন যোগ্যতাই নয়। কারণ পাখিরাও তো বাতাসে উড়ে। অতঃপর অন্য একজন বলিলেন, অমুক ব্যক্তি পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। তিনি বলিলেনঃ ইহাও কোন যোগ্যতা নয়, কারণ আবর্জনাও তো পানির উপর ভাসে। অতঃপর আরেকজন বলিলেন, এক ব্যক্তি এক পলকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যায়। তিনি বলিলেনঃ ইহাই বা কতটুকু যোগ্যতা, কেননা শয়তান তো মাশরীক হইতে মাগরীব পর্যন্ত এক পলকে পৌঁছিয়া যায়। সর্বশেষে তিনি বলিলেনঃ পুরুষ সেই ব্যক্তি যিনি বিবাহ করেন, লোকালয়ে বসবাস করেন, কারবার করেন এবং সর্ব অবস্থায় এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল (বিরত) থাকেন না।

শত্রুর সহিত ভাল ব্যবহার

একবার আমি (লেখক) আলা হজরতকে বলিলাম, যদি কোন ব্যক্তি আলেম সম্প্রদায়ের অপমান ও নিন্দা করে, ধর্মীয় কাজে যথা মসজিদ নির্মাণ ও ইসলাম সংস্কারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও বিদায়াত চালু করিতে চায়, তাহা হইলে কি তাহার জন্য বদদোয়া করা এবং তাহার ক্ষতি হয় এইরূপ কোন কাজ করা জায়েজ হইবে? আ'লা হজরত বলিলেনঃ আমি এই বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিনা। অতঃপর একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলেনঃ যদি একান্ত দোয়া কবুল হইবার আশা থাকে তাহা হইলে এই দোয়া করা উচিৎ যে, আল্লাহ পাক, আপনি তাহাকে (সেই ব্যাক্তিকে) ভাল করিয়া দিন যেন সে আলেমদের সম্মান করে এবং ধর্মীয় কাজে সাহায্যকারী হয়।

পীরের ভালবাসা

আলা হজরত একদিন বলিলেনঃ আমি যৌবনকালে অনেক শক্তিশালী ছিলাম। মরহুম পিতার ইচ্ছা ছিল আমাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিবেন এবং এই জন্য আমাকে বিশেষ-ভাবে অশ্ব পরিচালনার শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার শক্তি এইরূপ ছিল যে, একবার হজরত খাজা সিরাজউদ্দিন (রঃ) শেষ রাত্রের দিকে সুন অঞ্চল হইতে সওয়ার হইলেন। উদ্দেশ্য খোশাব যাইবেন। খোশাবের দূরত্ব ছিল ১২ মাইল। তিনি আমাকে বলিলেন, পথে পানি শুধু হিন্দুদের বাড়ীতেই পাওয়া যাইবে। অজুর জন্য বড়ই কষ্ট হইবে। আমি তৎক্ষনাৎ পানির লোটা সাথে নিলাম এবং পায়ে হাঁটিয়াই হজরতের সওয়ারীর সহিত রওয়ানা হইলাম। হজরতের সওয়ারী এত দ্রুত গতিতে চলিতেছিল যে, সাথের অন্য সকল সওয়ারী এবং হজরতের অন্য সকল সংগী সাথীরা অনেক পিছনে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু আমি হজরতের সওয়ারীর সাথে সাথেই রেকাব ধরা

অবস্থায় দৌড়াইতেছিলাম। ফজরের নামাজের সময় খোশাব পৌছিলাম এবং আমি হজরতের অজুর পানি পেশ করিলাম।

হজরত আর একবার বলিয়াছেনঃ আমি মরহুম সিরাজউদ্দিনের (রঃ) জিয়ারতের জন্য মুসাযায়ী শরীফ যাইতাম। তখন শুধু দরিয়া খান পর্যন্ত রেলগাড়ীতে যাওয়া যাইত, বাকী পথ হাঁটিয়া যাইতে হইত। পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল। মাইলের পর মাইল পানির কোন নাম নিশানাও পাওয়া যাইত না। কিন্তু আমি আমার আগ্রহের কারণে কোন কষ্টই অনুভব করিতাম না। এই পথ আমি অতি আনন্দের সহিত অতিক্রম করিতাম।

মিস্ত্রী জহুরউদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেন ঃ একবার আলা হজরত মদ্দে জিল্লুহুল আলী হজরত মরহুম সিরাজুদ্দিন দামানী (রঃ) এর সহিত হজ্জ করিতে যান। তাওয়াফের সময় হযরে আসওয়াদ চুম্বনকারীদের এত ভীড় হইতেছিলো যে, হযরে আসওয়াদ চুমা খাওয়া সম্ভব হইতেছিল না। হজরত মরহুমের চুমা খাওয়ার একান্তই আগ্রহ ছিল। কিন্তু তাঁহার কোন সুযোগই পাইতেছিলেন না। তখন আলা হজরত সাহস করিয়া সম্মুখের ভীড় ঠেলিয়া আগে গেলেন। পিছনে ছিলেন হজরত মরহুম আলা হজরত। হযরে আসওয়াদের সামনে তিনি দুইহাত ছড়াইয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই সুযোগেই হজরত মরহুম অতি সহজেই চুম্বন প্রদান করিলেন। সেই ভীড়ের মধ্যে এমন শক্তিশালী জওয়ান ছিলনা যে আলা হজরতের সেই শক্তিশালী হাতকে সরাইয়া দেয়।

শেরমস্ত নামে একজন আল্লাহর পাগল

লেখক বলিতেছেনঃ আমি খানকা শরীফে অবস্থানকালে শেরমস্ত নামে একজন দরবেশের আগমন আর্শ্চয্য ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আল্লাহর পাগল আলা হজরতের একজন অতি পুরাতন ভক্ত মুরীদ। এবার দীর্ঘ ১৫ বৎসর পর তিনি আসিলেন। এইজন্য খানকা শরীফের নূতন খাদেমগণ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ শফী সাহেব ও অন্যান্য আরো কয়েকজন পুরাতন খাদেম তাঁহাকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। তিনি এখানে আসার পর তাঁহার সেই বিশেষ জুব্বা খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। অতঃপর অজু করিলেন এবং আলা হজরতের মজলিশে উপস্থিত হইয়া প্রথমে হজরতের সহিত তারপর অন্যদের সহিত মুসাফাহা করিলেন। মুসাফাহার সময় তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শেরমস্ত কে ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মানুষরূপী শক্তিশালী বাঘের ন্যায় এক আল্লাহ পাগল। সাদা ঘন দাড়ি, জালালী চেহারা, আয়তলোচন এবং দাঁতগুলি সাদা মতির মত সাজান। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহাকে জওয়ানের মত মনে হইতেছিল। তাঁহার মানসিক অবস্থা এই ছিল যে, কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক আলোচনা

পরিচয় কি? একজন খাদেম বলিলেন যে, ইনারা সাইয়েদ বংশের লোক। তৎক্ষনাৎ তিনি তাঁহাদের সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় বার তাঁহাদের সহিত মুসাফাহা করিলেন এবং উভয়ের হাঁটুতে হাত বুলাইলেন। কিছুক্ষণ পর আলা হজরতের নিকট সাইয়েদ আব্দুস সালাম সাহেবের জন্য এইরূপ অনুরোধ জানাইলেনঃ ইনিতো নূরুন আ'লা নূর হইয়াছেন, এখনো উনাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। উনাকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন কারণ উনার স্ত্রী অপেক্ষায় রহিয়াছেন। ইহার পর তিনি তাঁহার সেই বিশেষ পোষাকটি উঠাইলেন এবং জংগলের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।

وَفَرْعُهَا شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فِى السَّمَاءِ

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা প্রশাখা উর্দ্ধে প্রসারিত।

— o —

করিয়া পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেন। এক পর্যায়ে আ'লা হজরতের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি এই পনের বৎসরে মাত্র দুইবার আসিয়াছি, কিন্তু একবারও আপনার সাক্ষাৎ পাই নাই।

অতঃপর তিনি এই যুগের খানকাগুলির দুরবস্থার কথা আলোচনা করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। একটি বিশেষ খানকার ব্যাপারে তিনি খুব কাঁদিলেন। ঐখানকার সহিত তাঁহার আত্মার সম্পর্ক ছিল। এই জন্য দুঃখ করিলেন যে, উহার গদীনশীনের সন্তানগণ বর্তমানে ইংরেজদের রূপ ধারণ করিতেছে। এই আলোচনার মধ্যে তিনি শিয়াদেরও অনেক নিন্দা করিলেন। তারপর উপস্থিত সকলের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, ইহারা সব দরবেশ। ফয়েজ হাসিল করার জন্য দূরদূরান্ত হইতে আসিয়াছেন। অতঃপর হজরতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আপনি ফয়েজের খনি নিয়া বসিয়া আছেন, এই গরীবদের প্রতি দয়া করুন, এদেরকেও কিছুকিছু দিন। তারপর বলিলেন, হজরত ফয়েজ লাভ করার পথ হইল এই যে, খাদেম তাহার পীরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হইবেন এবং পীর হইবেন খাদেমদের জন্য অনুপ্রেরণা।

ইহার পর অন্য একটি প্রসংগ নিয়া আলোচনা করিবার সময় তিনি খুব জোরে আহ শব্দ করিলেন এবং বলিলেন, মুসা (আঃ) একটি তাজাল্লী (জ্যোতি)ও সহ্য করিতে পারে নাই। ইহার পর নিজের বুকে আঘাত করিয়া বলিলেন, এখানে প্রত্যহ তিনশত ষাটটি জ্যোতি সৃষ্টি হয় এবং তাহা আমাকে সহ্য করিতে হয়। আ'লা হজরত এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, লা–হাওলা ওয়ালা কুয়ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। ইহার কিছুক্ষণ পর দরবেশ বলিলেন, পিপাসা লাগিয়াছে, পানি খাওয়ান। আ'লা হজরতের নির্দেশে একজন খাদেম দইয়ের শরবতের একটি পিয়ালা আনিল। পাগল তাহা পান করিবার পর খালি পিয়ালার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট পানি চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে চিনিতাম। সে ছিল একজন শিয়া। পিপাসিতকে পানি পান করান আমার কর্তব্য ছিল। তাই পিয়ালা ভরিয়া তাহাকে পান করাইলাম। সে যখন পানি পান করিয়া শেষ করিল তখন আমি বলিলাম যে, এই পিয়ালাটাই তুমি নিয়া যাও। ইহা আমার ব্যবহারের যোগ্য নয়। অতঃপর আ'লা হজরতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হজরত! তিনটি জিনিষ সব চাইতে বেশী নাপাক, শুকর, কুকুর ও ইঁদুর। কিন্তু আমার নিকট শিয়ারা ইহার চাইতেও বেশী নাপাক, কারণ এই তিনটির ব্যবহৃত পাত্রতো পবিত্র করা যায়, কিন্তু শিয়াদের ব্যবহৃত পাত্র পাক করা যায় না।

পাগল কথা বলিতে বলিতে এদিক ওদিক দেখিতেছিলেন। সাইয়েদ আব্দুস সালাম এবং সাইয়েদ মুখতার আহমদ সাহেবানদের দেখিয়া জিজ্ঞেস করিলেন, ইহাদের

নিম্নে প্রদত্ত সাজরাহ (অর্থাৎ তরীকায় নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া বুজুর্গানের নামের তালিকা যাহা অজীফা স্বরূপ পাঠ করিবার বিধান রহিয়াছে) যাহা আলা হজরতের নির্দেশে মাওলানা নজীর আহমদ আরশী সাহেব কাব্যে রূপদান করিয়াছেন।

১। ইলাহী বিহুরমাতি শাফিয়ীল মুজনানিবীন রাহমাতুল লিল আলামীন হজরত মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

২। ইলাহী বিহুরমাতি খলীফায়ে রসুলুল্লাহ (সঃ) হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু।

৩। ইলাহী বিহুরমাতি সাহেবে রসুলুল্লাহ্ হজরত সালমান ফারসি রাদিআল্লাহ্ তায়ালা আনহু।

৪। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাদি-আল্লাহু তায়ালা আনহু।

৫। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত ইমাম জাফর সাদেক রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু।

৬। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত বায়েজীদ বুস্তামী রহমাতুল্লাহহি আলাইহি।

৭। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা আবুল হাসান খারকানী রহমাতুল্লাহহি আলাইহি।

৮। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা আবু আলী ফারমাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৯। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা ইউসুফ হামদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা আব্দুল খালেক গাজদোয়ানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১১। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা আরীফ রিউগরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১২। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা মাহমুদ আব খায়ের ফাগনাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৩। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা আজীজাঁ আলী রামীতানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৪। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা মুহাম্মদ বাবা সামসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৫। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত সাইয়েদ মীর কেলাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৬। ইলাহী বিহুরমাতি খাজা খাজেগান পীরে পীরান হজরত সাইয়েদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রহমাতুল্লাহ আলাইহি।

১৭। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৮। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৯। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২০। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত মাওলানা মুহাম্মদ জাহেদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২১। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা দরবেশ রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২২। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত মাওলানা খাজা আম্ কানগী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

২৩। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা মুহাম্মদ বাকি বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

২৪। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেছানী শায়খ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

২৫। ইলাহী বিহুরমাতি আল্ ওরওয়াতুল বুছকা হজরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

২৬। ইলাহী বিহুরমাতি সুলতানুল আউলিয়া হযরত শায়খ ছাইফউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

২৭। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত সাইয়্যেদ নুর মুহাম্মদ বাদাউনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

২৮। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত মীর্জা মাজহার জান জানান শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

২৯। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত মাওলানা ওয়া সাইয়েদিনা আবদুল্লাহ আল মারুফ বাশাহ গোলাম আলী দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

৩০। ইলাহী হজরত শাহ আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

৩১। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত শাহ্ আহমদ সাঈদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩২। ইলাহী বিহুরমাতি হাজী দোস্ত মুহাম্মদ কান্ধারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত খাজা মুহাম্মদ ওসমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৪। ইলাহী বিহুরমাতি কাইউমে জমান, কুতুবে দাওরান, মাহবুবে রববুল আলা মীন হজরত খাজা হাজী মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন রহমাতুল্লহহি আলাইহি।

৩৫। ইলাহী বিহুরমাতি কাইউমে জমাঁ কুতুবে দাওরাঁ মাহবুবে রববুল আল আমিন হজরত মাওলানা ওয়া সাইয়িদানা আবু সা'দ আহমদ খান রহমতুল্লাহ আলাইহি।

৩৬। ইলাহী বিহুরমাতি হজরত সাইয়েদিনা ওয়া সানাদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি।

৩৭। ইলাহী বিহুরমাতি সাইয়েদিনা ওয়া মাওলানা আবুল খলীল খান মুহাম্মদ সাল্লামাহুমাল্লাহু তায়ালা।

প্রত্যেক শিজরা পাঠকারীর উপর আল্লাহর মারেফাত ও দয়া বর্ষিত হউক।

নায়েবে কাইউমে জামান সিদ্দিকে দাওরান হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কুদ্দুসু সিররহুর (গদীনশীন খানকায়ে সিরাজীয়া, কুন্দিয়া, জিলা মিয়ানওয়ালী) জীবনী।

হজরতের নাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। পিতার নাম জনাব নূর মুহাম্মদ এবং দাদার নাম জনাব কুতুবউদ্দীন। জন্ম স্থান এবং বাসস্থান সেলিমপুর, জিলা লুধিয়ানা। জন্ম তারিখ সার্টিফিকেট মতে ৫ই অক্টোবর ১৯০৪ মোতাবেক ১৩২২ হিঃ।

তাঁহার পিতা হজরত মিঞা নূর মোহাম্মদ সাহেব নিজ এলাকার মধ্যম শ্রেণীর জমিদার ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, পবিত্র স্বভাব, সরলমনা এবং দয়ালু। তিনি কোন কোন কোন রোগের ফলপ্রসূ ঝারফুঁকও জানিতেন। তিনি এরূপ জনদরদী ছিলেন যে, কোন ব্যক্তি গভীর রাত্রেও ঝারফুঁকের জন্য আসিলে তিনি বিরক্ত হইতেন না। বরং বাড়ীর সকলকেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রাত্রে যখনই কোন রুগী আসুক, তাহাকে যেন জাগাইয়া দেওয়া হয়। এই খেদমত তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে করিতেন। তাঁহার মায়ামমতা এতই ছিল যে, যদি তিনি এমন কোন গ্রামে যাইতেন যেখানে তাঁহার নিজ গ্রামের কোন মেয়ের বিবাহ হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে তিনি নিজের সন্তানের মতই খোঁজ খবর নিতেন। তাঁহার এই অভ্যাস ছিল জীবনভর।

নিজ বংশের এবং এলাকার লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। আপনপর সবাই তাঁহাকে মান্য করিতেন। নামাজ, রোজা এবং আল্লাহর আনুগত্য সম্পর্কিত সকল কাজ তিনি নিয়মিত পালন করিতেন। এই ব্যাপারে তিনি নিজ বংশ এবং আত্মীয় স্বজনের ছেলেমেয়েদের উপরও সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন এবং সকলকে শরীয়াতের নির্দেশ পালনের প্রতি যত্নবান হওয়ার আদেশ দিতেন।

তাঁহার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে ছিল। বড় ছেলে হজরতে আক্দাস মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ কুদ্দুসু সিররুহু গদীনশীন, খানকায়ে সিরাজীয়া, কুন্দিয়া। দ্বিতীয় ছেলে মাষ্টার বদরউদ্দিন সাহেব মদ্দে জিল্লুহু। ইনি বর্তমানে স্কুলের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বস্তি সিরাজী খানী ওয়ালে অবস্থান করিতেছেন। ছোট ছেলে মিয়া মুহাম্মদ ইব্রাহীম মুদ্দেজিল্লুহুল আলী। তিনি কাপড়ের ব্যবসা এবং জমিদারী করেন এবং তিনিও বস্তি সিরাজীয়াতে আছেন।

পরিবেশঃ গ্রামের জীবন যাপনের ধরণ ছিল সাদাসিধা এবং অনাড়ম্বর। সেখানকার মুসলমানদের ঘরে সাধারণভাবে এবং আলা হজরতের ঘরে বিশেষভাবে ধর্মীয় চেতনা উজ্জীবিত ছিল। অত্যন্ত অকৃত্রিম পরিবেশে ইংরেজী চাল চলন এবং আধুনিকতার ছাপ মোটেই ছিল না। ইসলামী শিক্ষা কুরআন শরীফ পাঠ এবং নামাজ রোজার মাসয়ালা সকলেই জানিতেন। চিঠি পত্র লেখার জন্য উর্দু প্রাইমারী অথবা মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। পাশ্চাত্য

সভ্যতা এবং ঐ ধরণের চালচলনকে ঘৃণা করা হইত। পারিবারিক জীবন ছিল সরলতায় ভরপুর। পোষাক পরিচ্ছদে ইসলামী সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হইত। সহজলভ্য এবং উপাদেয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। গ্রামবাসীরা বেশীর ভাগই মুত্তাকী এবং পরহেজগার ছিলেন। সকলেই ফজরের আগে ঘুম হইতে জাগিতেন, তাহাজ্জুদ পড়িতেন এবং এবাদত শেষ করিয়া নিজ নিজ দৈনন্দিন ব্যস্ততায় মনোনিবেশ করিতেন। মসজিদসমূহ হইতে আল্লাহর জিকিরের আওয়াজ উঠিয়া পরিবেশকে সুমধুর করিয়া তুলিত।

রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং ঐ মাসেই যাকাত আদায় করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত। প্রত্যেক ঘরে কমপক্ষে একবার করিয়া এক-দেড়শত লোকের খানা পাক করিয়া গ্রামবাসীকে দাওয়াত করা হইত। এই আপ্যায়ন হইত সিরাজের আপ্যায়নের মত অত্যন্ত সাদাসিধা যাহাতে সকল দাওয়াতী লোক বিনা সংকোচে শরীক হইতে পারেন। সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে আহার করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করিতেন। সকল মানুষ সুস্থ এবং শক্তিশালী ছিলেন। ২০/২৫ মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটা তাহাদের জন্য ছিল সাধারণ ব্যাপার। গ্রামে ২টি মসজিদ ছিল এবং প্রত্যেকটিতে ছিল বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়ার সুব্যবস্থা।

জন্মঃ এরূপ একটি পাক পবিত্র পরিবেশে হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মিঞা নূর মুহাম্মদের ঘরে ইংরাজী ১৯০৪ সনের ৫ই অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁহাকে দেখিয়া এইরূপ মনে হইতেছিল যে তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদা করিতেছেন।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি মাতাপিতার আদর যত্নে লালিত পালিত হন। ছয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে নিকটস্থ একটি মসজিদের মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। মসজিদের ইমাম সাহেবই ছিলেন তাঁহার প্রথম শিক্ষক। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কায়েদা ও আমপারা শেষ করিয়া নামাজের নিয়ম কানুন এবং যাবতীয় দোয়া দরুদ এবং সুরা কেরাত মুখস্ত করিয়া ফেলেন এবং নিয়মিত নামাজ পড়িতে আরম্ভ করেন। কুরআন শরীফ শেষ করার পূর্বেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সেলিমপুর প্রাইমারী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। ১৯১৬ সন পর্যন্ত এই স্কুলেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। হজরত তাঁহার স্কুলে ভর্তির সেই ঘটনাটি নিজেই আলোচনা প্রসংগে বলেনঃ যখন মাষ্টার সাহেব স্কুলের খাতায় আমার নাম লিখিয়া নিলেন এবং স্কুলে বসিবার জন্য আমাকে তিনি বলিলেন, "তাশরীফকা টোকড়া রাখখিয়ে," আমি তখন স্কুলের বারান্দায় এবং এদিক সেদিক টোকড়া তালাশ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি

ওখানে টোকড়া কোথায় পাইব। পরে যখন এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম, তখন নিজের অজ্ঞতার জন্য নিজে নিজেই লজ্জিত হইলাম।

বাল্যকাল হইতেই হজরতের একটি ভাল অভ্যাস এই ছিল যে, সকলের সহিত তিনি খুব উত্তম ব্যবহার করিতেন এবং বয়স্ক ও বিশিষ্ট লোকদের সম্মান করিতেন। স্কুলে যাওয়া আসার পথে কেহ যদি তাঁহাকে গণনা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে 'আচ্ছাজী' বলিয়াই গণনা শুরু করিয়া দিতেন। আল্লাহ পাক তাঁহার জন্মলগ্ন হইতেই অন্তরে ধর্মের প্রতি আগ্রহ দিয়াছিলেন। বালেগ (বুদ্ধি) হওয়ার পর তিনি কখনও নামাজ ছাড়েন নাই। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ও মেধাবী ছিলেন। প্রত্যেক ক্লাশেই তিনি বিশেষ সাফল্যের সহিত কৃতকার্য্য হইতে থাকেন। ১৯১৬ সনে তিনি প্রাইমারী শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত বৃত্তি লাভ করেন।

ধর্মীয় শিক্ষার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা

হজরতে আক্‌দাস স্বয়ং ঐ সময়ের এই ঘটনাটি বর্ণনা করেনঃ আমাদের গ্রামে একজন বয়স্ক আলেম মাঝে মাঝে তশরীফ আনিতেন এবং তিনি আমাদের মসজিদেই অবস্থান করিতেন। সেবার যখন আমি প্রাইমারী বৃত্তিলাভ করিয়াছি, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমি মসজিদে গেলে তিনি আমাকে কাছে ডাকিলেন এবং আমার নিকট নামাজের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার জানা মতে উত্তর দিতে লাগিলাম এবং ঠিক উত্তরই দিলাম। একদিন তিনি আমাকে এমন একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন যা আমার জানা ছিল না। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া আমি তাহার উত্তর ঠিকভাবে দিয়া দিলাম। উত্তর ঠিকই ছিল কিন্তু অনুমান করিয়া দিয়াছিলাম। মাওলানা সাহেবও আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, উত্তরতো ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু তুমি জানিয়া বলিয়াছ? নাকি অনুমান করিয়া বলিয়াছ। আমি বলিলাম, অনুমান করিয়াই বলিয়াছি। ইহার পর মাওলানা সাহেব আমাকে 'সাবাস' বলিলেন এবং সাথে সাথে সাবধান করিয়া বলিলেন, দেখ, ধর্মীয় মাসয়ালা যে পর্যন্ত ভালভাবে না জানিবে তাহা কখনও বলিব না। যদি অনুমান করিয়া ঠিক উত্তর দাও তবুও গুনাহগার হইতে হইবে। ভবিষ্যতে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। অতঃপর তিনি আমাকে দ্বীনি ই'লম শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, স্কুল শিক্ষা শেষ করিয়া কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিবে। তাঁহার সহিত আমার এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, ইতিমধ্যে আমার পিতা আসিয়া পড়িলেন। মাওলানা সাহেব আমার পিতাকে বলিলেন, মাশাআল্লাহ আপনার ছেলে অত্যন্ত গুণী এবং মেধাবী। ইহা শুনিয়া আমার পিতা বলিলেন, জী

এবার স্কুলেও বৃত্তি লাভ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া মাওলানা সাহেবের চেহারা পরিবর্তন হইয়া গেল এবং খুব আফসোসের সহিত বলিলেন, আপনি ইহা খুব খারাপ খবর শুনাইলেন। ওকে যদি এখনই সরকারী পয়সা খাওয়ানোর অভ্যাস বানাইয়া দেন তাহা হইলে ও দ্বীন কিভাবে শিখবে? শেষে তো একজন স্কুল মাষ্টার হইয়া যাইবে।

হজরতে আকদাস অতঃপর বলেনঃ মাওলানা সাহেবের সেই আফসোস বাক্য এবং এই কথাগুলি আমার অন্তরে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, সেই হইতে আমার অন্তরে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আগ্রহ এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর সেই জন্যই আমি স্কুলের পরিবেশ ছাড়িয়া আরবী মাদ্রাসায় ভর্তি হইলাম।

বাল্যকালের কেরামত

৭–৮ বৎসর বয়সে তিনি একবার ছাদে উঠিয়াছিলেনা। তাঁহার হাতে ছিল পানির একটি পিয়ালা, আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। হঠাৎ জোরে বজ্রপাতের একটি বিকট শব্দ হইল। তিনি একটুও ভয় পাইলেন না বরং রাগের সহিত মেঘের উদ্দেশে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, ওহে মেঘ, তুমি কেন গর্জন করিতেছ। দেখ, যদি আর একবার গর্জন কর তবে এই পিয়ালা ছুঁড়িয়া মারিব। আল্লাহর কুদরতে সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন বন্ধ হইয়া গেল।

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা

খুব অল্প বয়সেই বাপ চাচার ইচ্ছা অনুযায়ী ১৪ এপ্রিল তিনি লুধিয়ানার সাওয়াদ্দিতে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯১৯ ইং সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঐ স্কুলেই পড়াশুনা করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন।

ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত ঘটনাঃ মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়নের সময় তিনি স্কুলের বোর্ডিং–এ থাকিতেন। রবিবারের বন্ধে বাড়ীতে আসিতেন। ঐ সময়ের একটি ঘটনা হজরত কেবলা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেনঃ যখন আমি সাওয়াদ্দিতে লেখাপড়া করিতাম তখন হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলেই একত্রে বোর্ডিংয়ে থাকিতাম। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এবং একে অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এত বেশী ছিল যে, মুসলমান ছেলেরা হিন্দু এবং শিখ ছাত্রদের ধর্মীয় চেতনার সম্মান রক্ষার্থে তাহাদের রান্না ঘরে যাওয়া হইতে বিরত থাকিত। ঠিক তেমিন হিন্দু এবং শিখ ছেলেরাও মুসলমান ছাত্রদের নামাজের ঘরে প্রবেশ করিত না। নিজেদের মধ্যে কখনও কলহ বিবাদ হইত না। বরং যখন সাথীদের সহিত আমরা রবিবারের ছুটি কাটাইতে শনিবার বিকাল বেলা সেলিমপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইতাম, তখন আমি পথের মধ্যে সকল ছেলেকে

পাঞ্জাবী ভাষায় পবিত্র কালিমার জিকির করাইতাম। হিন্দু এবং শিখ ছেলেরাও মুসলমান ছেলেদের সহিত একত্রে ইহাতে সামিল হইত।

মাধ্যমিক শিক্ষার পর

মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনের সময় তিনি বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। জিলা শিক্ষা বোর্ড হইতে তাঁহাকে স্কুলের চাকুরী দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। চাকুরী তো দূরের কথা, এই মাধ্যমিক শিক্ষাও তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ ছিল মাওলানা কামরুদ্দিন সাহেবের সেই উপদেশ এবং সেই কারণেই তখন হইতেই হজরতের অন্তরে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার পাশের পর মুরব্বিরা আবার কোন কাজের নির্দেশ দিয়া বসেন ধারণা করিয়া তিনি তাহাদেরকে না জানাইয়াই মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব সেলিমপুরীর নিকট ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চলিয়া যান। হজরতের পিতা এবং মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের মধ্যে পুরাতন বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একদিকে যেমন হজরতকে শিক্ষা অর্জনে সাহায্য করিতে পারিবেন, অন্যদিকে তাঁহার পিতাকেও সান্ত্বনা দিতে পারিবেন ভাবিয়াই তিনি তাঁহার নিকটই শিক্ষা অর্জন করিতে থাকেন। দুই বৎসর তিনি লুধিয়ানার মাদ্রাসায়ে আজীজিয়ায় পাড়াশুনা করিলেন এবং কিছুদিন অমৃতসরের মাদ্রাসায়ে আরাবীয়াতেও শিক্ষা লাভ করেন। পরিশেষে ১৩৪২ হিজরীতে তিনি মাদ্রাসায়ে দারুল উলুম দেওবন্দে চলিয়া এবং দরসে নিজামীর মাঝামাঝি হইতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সকল কিতাবই তিনি দারুল উলুমেই অধ্যয়ন করেন। ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। তিনি যে সকল সম্মানিত শিক্ষকদের নিকট বিভিন্ন কিতাব পড়িয়াছেন, তাঁহারা হইলেনঃ

(১) হাদীস ও তফসীর বিষয়ে হজরত আল্লামা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মেরী (রঃ) (প্রধান শিক্ষক দারুল উলুম দেওবন্দ), হজরত মিঞা মাওলানা আসগার হোসাইন সাহেব (রঃ), হজরত মাওলানা মুর্তাজা হাসান সাহেব (রঃ), হজরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান সাহেব ওসমানী (রঃ), ফিক্বাহ ও আরবী সাহিত্যে মাওলানা মুহাম্মদ এজাজ আলী সাহেব (রঃ), হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব বান্ধলভী (রঃ), মান্তেক এবং ফালসাফা মাওলানা মুহাম্মদ রসুল খাঁন সাহেব এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব (বালইয়াবী)।

তিন বৎসরের পরীক্ষা সমূহ

১৩৪৩ হিজরীতে তিনি দারূল উলুম দেওবন্দে জালালাইন শরীফ, হেদায়া আউয়ালাইন, সাল্লামুল উলুম, রশীদিয়া, এবং মাকামাতে হারেরী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। পুরস্কার বিতরণী সভায় তাঁহাকে তিন খানা

কিতাব যাহা মিরকাত, আনোয়ারুল ফিতির এবং এরশাদে মুরশেদ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। ১৩৪৪ হিজারীতে তিনি মিশকাত শরীফ, নখবাতুল ফিকীর, হেদায়া আখেরাইন, দেওয়ানে মুতানাব্বী, মুল্লা হাসান ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা দেন এবং সকল বিষয়ে অতি উচ্চ নম্বর পাইয়া পাশ করেন। এবং মাদ্রাসা হইতে তাঁহাকে আনোয়ারে আহ্‌মদিয়া পুরস্কার দেওয়া হয়। অতঃপর ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দাওরায়ে হাদীস যথাঃ সিহা সিত্তাসহ মোট ১১ খানা কিতাবের পরীক্ষা দেন। এসব বিষয়ের নাম ও নম্বর নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

বিষয়	পূর্ণমান	প্রাপ্ত নম্বর
(১) মুসলিম শরীফ	৫০	৪৯
(২) আবুদাউদ শরীফ	৫০	৪৯
(৩) মুয়াত্তা ইথামে মুহাম্মদ	৫০	৪৬
(৪) বোখারী শরীফ	৫০	৪৫
(৫) নেসায়ী শরীফ	৫০	৪৫
(৬) তাহাবী শরীফ	৫০	৪৫
(৭) ইবনে মা-জাহ্ শরীফ	৫০	৪৫
(৮) শামায়েলে তিরমীজী	৫০	৪৫
(৯) মুয়াত্তা ইমামে মালেক	৫০	৪৫
(১০) তাফসীরে বাইদাবী শরীফ	৫০	৪৩
(১১) তিরমীজী শরীফ	৫০	৪০

দারুল উলুম দেওবন্দের পরিবেশ

চার বৎসর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে অতিবাহিত করেন। সেখানকার দ্বীনি পরিবেশ ছিল আশ্চর্য রকেমের উন্নত। ত্যাগী আলেমগণ ছাত্রদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষকই ইলম ও আমলে ছিলেন নিষ্ঠাবান। তাঁহারা ছিলেন সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং সৎ ও পবিত্র জীবনের দর্পন। এখানকার ছাত্রদের পড়াশুনার প্রতি খুব বেশী সম্পর্ক ছিল। দুনিয়ার কোন বিষয়ে তাদের সম্পর্ক ছিলনা বলিলেই চলে। তাদের অন্তর সকল প্রকার আশংকা হইতে মুক্ত ছিল। তাদের অভ্যাস এরূপ ছিলঃ খুব ভোরে উঠা, নফল ইবাদাত করা, ফজরের পর কিতাব পড়া, পূর্বের সবক পুনরাবৃত্তি করা এবং সামনের সবক দেখিয়া নেওয়া। ক্লাশের ঘন্টা বাজার

সাথে সাথে সকল ছাত্র এবং শিক্ষক পড়াশুনার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। শ্রেণীকক্ষ হইয়া উঠিত আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসুলের জিকিরে মুখরিত। সময়সূচী ছিলঃ প্রত্যহ জোহরের আগে ৪ ঘন্টা এবং জোহরের পরে ২ ঘন্টা। মাগরীবের নামাজের পর ছাত্রগণ বিভিন্ন স্থানে দলে দলে বসিয়া নিজেদের পড়াশুনা প্রস্তুত করিত। তাহারা একে একে প্রত্যেকটি কিতাবের পাঠ সম্পন্ন করিত এবং শিক্ষকের নিকট ক্লাসের পড়াশুনা বুঝাইয়া যাইত। পুরাতন পাঠগুলি তাকরার শেষ করয়া ছাত্ররা নিজ নিজ কক্ষে চলিয়া যাইত। কক্ষের সাথীগণ একই আলোর নিকট অথবা বিভিন্ন স্থানে বসিয়া চুপ করিয়া প্রত্যেক কিতাবের সামনের সবক দেখিত। এই অবস্থায় প্রায় রাত ১২টা বাজিয়া যাইত। নাজায়েজ খেলাধুলা পছন্দ করা হইত না। হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্র আছরের নামাজের পর অল্পক্ষণের জন্য মাদ্রাসার পিছনের মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিত।

দারুল উলুমের পরিচালক—পৃষ্ঠপোষকদের তালিকা

দারুল উলুমের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সর্বদা অতি সম্মানী চিন্তাবিদ এবং অভিজ্ঞ বুযুর্গ ব্যক্তিদের উপরই ন্যস্ত ছিল। প্রধান পরিচালক ছিলেন হজরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহম্মদ (রঃ)। তিনি দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতবী (রঃ) এর একমাত্র ছেলে। ইলম ও আমলে তিনি ছিলেন পুরাতনদের মতই গুণী এবং যোগ্য ব্যক্তি। উপপ্রধান পরিচালক হজরত মাওল্যানা হাবীবুর রহমান ওসমানী (রঃ) ছিলেন মাওলানা শিব্বির আহ্মদ ওসমানী সাহেবের ভাই, মুফতী আজীজুর রহমান সাহেবের আত্মীয় এবং হজরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গুহী (রঃ) এর মুরীদ। ইলম ও আমলে তিনি পরিপূর্ণ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। দারুল উলুমে এই ধরণের ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সকলের অন্তরকে শান্ত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সায়খুল হিন্দু ইমামুল হাদীস হজরত মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ্ সাহেব কাশ্মেরী (রঃ), হজরত মাওলানা মিঞা আসগর হোসাইন সাহেব (রঃ), হজরত মাওলানা শিব্বির আহ্মদ সাহেব ওসমনী (রঃ), হজরত মাওলানা মুর্তজা হাসান সাহেব চাঁদপুরী, হজরত মাওলানা এজাজ আলী সাহেব আমরোহী (রঃ), হজরত মাওলানা আব্দুস্‌সামী সাহেব (রঃ), হজরত মাওলানা নবীহুল হাসান সাহেব (রঃ), হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম সাহেব বালইয়াবী, হজরত মাওলানা রসূল খাঁন সাহেব হাজারভী এবং হজরত মাওলানা সিরাজ আহ্মদ সাহেব রশিদী (রঃ)। ইহারা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত আলেম। হয়তবা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় দেখা যাইবেনা।

শিক্ষদের আন্তরিকতা ও ভূমিকা

সম্মানিত শিক্ষকগণ কেবল নিজ নিজ উৎসাহ অনুযায়ী হাদীস, তফসীর, ইলমে কালাম, ফিকাহ, আদব, মানতেক, ফালসাফা, সরফ ও নাহু, মায়ানী ও বয়ান, ইফতাহ্ ও মানাজেরা ইত্যাদি বিষয় নিয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। আত্মিক তথ্যাদি ইলমে দীন, হিকমাতে রব্বানীয়া এবং মারেফাতে ইলাহির দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন। তাঁহারা শরীয়তের বাহ্যিক নিয়মাবলী এইরূপভাবে পালন করিতেন যে, কেবল একজন তরীকাপন্থী ব্যক্তিই তাঁহাদের আত্মিক অবস্থা বুঝিতে পারিত। অনেক শিক্ষককেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় হইতে উচ্চ বেতনে ডাকা হয়, কিন্তু তাঁহারা দারুল উলুমের ৬০/৭০ টাকা বেতনকে কলেজের হাজার টাকার উপরে প্রধান্য দিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা

হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব উলুম দেওবন্দে ছাত্র জীবনেই হজরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান নকশবন্দী মুজাদ্দেদীর নিকট তরীকা নকশবন্দীয়ায় বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দারুল উলুমের অধিকাংশ ছাত্র আছরের নামাজের পর আত্মিক প্রশান্তি এবং অন্তরের স্থিরতার জন্য হজরত আল্লামা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মেরী (রঃ) এবং মাওলানা আজগার হোসাইন সাহেবের পবিত্র মজলিশে উপস্থিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে কতিপয় ছাত্র হজরত মুফতী আজীজুর রহমান সাহেবের নিকটও উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেবও ছিলেন অন্যতম। হজরত আকদাস লেখকের নিকট বর্ণনা করেনঃ আমি মাঝে মাঝে সকল বুযুর্গদের নিকট আছরের নামাজের পর উপস্থিত হইতাম। আস্তে আস্তে হজরত মাওলানা আজীজুর রহমান সাহেবের আত্মিক আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে তাঁহার নিকট মুরীদ হওয়ার জন্য আবেদন জানাইলাম, হজরত মুফতী সাহেব প্রথমতঃ আমার ছাত্র হওয়ার কারণে মুরীদ করিতে ইতস্তত করিলেন কিন্তু কয়েকবার অনুরোধের পর শেষ পর্যন্ত তরীকা নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদীয়ায় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি এই উপদেশ দিলেনঃ যেকোন এক ওয়াক্ত নামাজ এই ছোট্ট মসজিদে আদায় করিবে।

হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেনঃ বাইয়াতের পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই ঐ মসজিদে পড়িবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। হজরত মুফতী সাহেব মুজাদ্দেদীয়া তরীকার সম্পর্কের দ্বারা যে আত্মতৃপ্তি দান করিয়াছিলেন তাহাই শেষ পর্যন্ত আমাকে আলা হজরত কাইউমে জমান কুদ্দুসু সিররুহুর খেদমতে খানকা সিরাজীয়ায় টানিয়া আনিয়াছে।

খানকা সিরাজীয়ায় উপস্থিতিঃ ১৩৪৫ হিজরীর শাবান মাসে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে পড়াশুনা শেষ করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া আসেন। শিক্ষা সমাপনান্তে বিবাহের প্রশ্ন দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, পরিবার পরিজন এবং সম্মানীত মাতা-পিতার জন্য আয় উপার্জন করা কর্তব্য। গ্রামে আলেমদের জন্য মসজিদের ইমামতি, ওয়াজ-নসিহাত অথবা ধর্মীয় মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করা সম্ভব ছিল না। তিনি এই ধরণের কাজের জন্য তাঁহার বংশের ঐতিহ্যের কারণে প্রস্তুত ছিলেন না। দারুল উলুমে তাঁহার এক বন্ধু মাওলানা সাইয়েদ মুগীসউদ্দিন তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, সারগোদায় মাওলানা হাকীম আব্দুর রসুল কালা সাহেব ইউনানী চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা বিষয়ে তিনি শিক্ষা দেন এবং ইউনানী চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান গরিমার তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব তাই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ইউনানী চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন এবং ইহা দ্বারা জনসেবার মাধ্যমে নিজ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সারগোদায় উল্লেখিত হাকীম সাহেবের নিকট চলিয়া গেলেন। হাকীম সাহেবও তাঁহাকে আগ্রহী ও মেধাবী পাইয়া পড়াইতে শুরু করেন।

হাকীম সাহেব আলা হজতের অন্যতম মুরীদ এবং তরীকায় আলা হজরতের খলীফাও ছিলেন। আলা হজরত একদিন হাকীম সাহেবের নিকট সারগোদায় আসেন। হাকীম সাহেবের ক্লাশে একজন নওজোয়ান আলেমকে দেখিয়া তার সম্পর্কে জানিতে চাইলেন। হাকীম সাহেব বলিলেন, ইনার নাম মাওলানা আব্দুল্লাহ। দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা অর্জন করিয়াছেন। এখন ইউনানী বিষয় জ্ঞান অর্জনের জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন। আলা হজরত ইহা শুনিয়া কাশফের দৃষ্টিতে বলিলেনঃ ইনি চিকিৎসক হইবেন বলিয়াতো মনে হয় না? অবশ্য আপনি পড়াইয়া যান যাহাতে তাঁহার আগ্রহ পূর্ণ হয়। যেগাযোগের মাধ্যমে হজরতে আকদাসের সহিত হজরত মুফতী আজীজুর রহমান সাহেবের তরীকায় নকশবন্দীয়ার সম্পর্ক কায়েম হইয়াছিল। এখন আলা হজরতের আকর্ষণ অনুভব করিলেন এবং সেইখানেই আলা হজরতের নিকট নূতনভাবে বাইয়াত গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয়বার বাইয়াত হওয়ার ব্যাপারে আর একটি বর্ণনা এইরূপ আছে যে, হজরতে আকদাস আলা হজরত কুদ্দুসু সিররুহুর নিকট হইতে হাকীম আব্দুর রসূল সাহেবের নামে একটি অনুরোধ পত্র নেওয়ার জন্য খানকায়ে সিরাজীয়ায় আসিলেন। আলা হজরত একটি অনুরোধ পত্র লিখিয়া দিলেন। যখন হজরতে আকদাস হাকীম সাহেবের নিকট সারগোদায় পৌছিলেন, তখন হাকীম সাহেব আলা হজরতের আদেশ একান্ত কর্তব্য

কাজ মনে করিলেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া শুরু করিলেন। কিন্তু সাক্ষাতের ঐ সংক্ষিপ্ত সময় যখন তিনি অনুরোধের চিঠি সংগ্রহ করার জন্য আলা হজরতের নিকট যান, তখন তিনি একটি অদ্ভুত অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথম পীর হজরত মুফতী আজীজুর রহমান সাহেবের নিকট দেওবন্দে যে চিঠি লেখেন তার মধ্যে আলা হজরতের আলোচনা, তাঁহার নিকট উপস্থিতি এবং তাঁহার রূহানী ফয়েজ ও বরকতের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। মুফতী সাহেব ইহার জবাবে লিখিয়াছিলেনঃ উল্লেখিত বুযুর্গের সহিত আপনার খুবই ভাল সম্পর্ক মনে হইতেছে। অতএব আমার পক্ষ হইতে অনুমতি আছে, আপনি তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়া যান। খুব কাছে হওয়ার জন্য তাঁহার সাহিত যোগাযোগ করাও সহজ হইবে। এই পবিত্র তরীকায় উন্নতি লাভ করা পীরের সহিত সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে। আলা হজরত হাকীম সাহেবের নিকট সারগোদায় তশরিফ আনিয়া হাকীম সাহেবের নিকট তাঁহার আশা আকাংখা পূর্ণ করার এবং এই শিক্ষা চালু রাখার অনুরোধ করেন। এই দ্বিতীয় সাক্ষাতে হজরতে আকদাস অধিক পরিমান আত্মিক প্রেরণা অনুভব করেন। তিনি বাইয়াত গ্রহণ করার আবেদন জানান। হজরতে আলা কাশফের দ্বারা বলিলেনঃ আপনি প্রথম হইতেই নকশবন্দীয়া তরীকার সহিত জড়িত। পীরের অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয়বার বাইয়াত গ্রহণ করা উচিৎ হইবে না। অতঃপর হজরতে আকদাস হজরত মুফতী সাহেবের অনুমতিপত্রখানা তাঁহার সামনে পেশ করেন। পত্র দৃষ্টে তিনি তাঁহাকে তাঁহার মুরীদদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন। হাকীম সাহেবকে তিনি বলিলেনঃ ইনাকে ইউনানী শিক্ষা তাড়াতাড়ি শেষ করাইয়া দিন।

হজরতে আকদাস তাঁহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাকে চিঠি লিখিতেন এবং মাঝে মাঝে উপস্থিতও হইতেন। একবার তিনি হাকীম সাহেবের সহিত আলা হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলে আলা হজরত হাকীম সাহেবকে বলিলেনঃ আপনি আপনার হেকমাত ইনাকে তাড়াতাড়ি শিক্ষা দিয়া দিন কেননা ইহার পর আমার নিজস্ব হিকমাত শিখাইতে হইবে। অতঃপর এই কবিতাটি পড়িলেন।

چند خوانی حکمت یونیان = حکمت ایمانیه راهم بخوان

অর্থঃ তুমি যত খুশি ইউনানী চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন কর কিন্ত ঈমানী জ্ঞানও তো কিছু অর্জন কর।

হজরতে আকদাস বলিতেনঃ আলা হজরতের পবিত্র মুখে এই কবিতা শুনিয়া আমার অন্তর ইউনানী চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় তিনি হাকীম সাহেবের সহিত সারগোদা যান এবং নিজের আভ্যন্তরীণ হাল সম্পর্কে আলা হজরতকে অবহিত করেন।

আলা হজরত আব্দুল্লাহ সাহেবের স্মরণ শক্তি এবং দ্রুত অগ্রসর হওয়া দেখিয়া হাকীম সাহেবকে লিখিলেনঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের হাকীমী শিক্ষা যে- পর্যন্ত হইয়াছে উহাই যথেষ্ট। এখন আপনি তাঁহাকে খানকা শরীফে পাঠাইয়া দেন। এদিকে হজরতে আকদাসের অন্তরও হাকীমী শিক্ষা লাভে নিরুৎসাহ এবং ঈমানী শিক্ষা অর্জনের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অতি উৎসাহ সহকারে হাকীমী শিক্ষা স্থগিত রাখিয়া আলা হজরতের নিকট খানকা শরীফে উপস্থিত হন এবং এমনই উপস্থিত হইলেন যে, সারা জীবন এখানেই থাকিবেন। এই উপস্থিতির উসিলায় তিনি স্থায়ী সম্মানের অধিকারী হইলেন— যাহা তাঁহার জন্মলগ্ন হইতেই ভাগ্যে লেখা ছিল। সারাটা জীবন তিনি পীরের খানকা শরীফের খেদমতে উৎসর্গ করেন এবং সেই পবিত্র মাটিতেই তিনি শেষ আশ্রয় পান।

این سعادت بزور بازونست = تانه بخشد خرائے بخشنره

অর্থাৎ, এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জন করা যায় না যতক্ষণ না দয়ালু ও দাতা আল্লাহ দান করেন।

ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْم

অর্থ– ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অবদান; যাহাকে আল্লাহ ইচ্ছা দান করেন। এবং তিনিই মহান অনুগ্রহশীল।

পীরের খেদমতের জন্য তিনি সবসময়ই খানকা শরীফে উপস্থিত থাকিতেন। একাধারে ১৪/১৫ বৎসর তিনি আলা হজরতের খেদমতে অতিবাহিত করেন। ভ্রমণে ও বাড়ীতে সব সময়ই তিনি হজরতের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। আভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা লাভ করার পর তিনি তরীকার খলীফা এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন। পীরের জন্য তাঁহার এরূপ ভালবাসা ছিল যে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র এক দুইবার তিনি নিজ গ্রাম সেলিমপুরে মাতাপিতা এবং পরিবার পরিজনদের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মারেফাতের নেশা আপন সত্ত্বা ও আপনজনদের সম্পর্ক হইতে যাঁহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, কিভাবে তিনি বাড়ীঘরের দিকে খেয়াল দিবেন নিজের উদ্দেশ্যে

হাসিলের পূর্বে? তাঁহার সম্মানিত পিতা এবং অন্যান্য আপন জন জীবিকা উপার্জনে তাঁহার সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অবস্থায় তাঁহারা কেবল নিরাশই হইলেন না উপরন্তু তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পর যখন এই খোদা প্রদত্ত সম্পদের সাহায্য অনুভব করিতে পারিলেন (যাহার সামনে সাত রাজার ধনও সামান্য) তখন তাঁহারা সীমাহীন খুশি হইলেন এবং তাঁহার সম্মানিত অস্তিত্বকে তাঁহারা নিজেদের বংশের জন্য অত্যন্ত গৌরবজনক মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হইলেন।

পীরের দায়িত্ব পালন

আলা হজরত কুদ্দুস্ সিররুহু নিজ জীবদ্দশায়তেই তাঁহাকে স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ মাসুম সাহেব তখন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এই আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্বভার উত্তরাধিকারসূত্রে নয়, বরঞ্চ যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। এইজন্য তাঁহাকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

وَاَنْ تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلىٰ اَهْلِهَا =

অর্থাৎ, "আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন।" এই আয়াত অনুযায়ী আলা হজরত নিজ বংশভিত্তিক উত্তরাধিকার উপেক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক ছেলেকে এই দায়িত্ব দান এবং সেইসঙ্গে খানকার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। তাঁহার উপস্থিতিতেই নামাজ পড়ান, জিকির ও খতমের যাবতীয় কাজ এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বও তিনি তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। যখন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ১২ই সফর ১৩৬০ হিজরীতে আলা হজরত কুদ্দুস্ সিররুহুর ইন্তেকাল হইল, তখন হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবই আলা হজরতের লাশ মুবারক কানপুর হইতে খানকা শরীফে নিয়া আসেন। তাঁহার ঈমামতিতেই বিপুল সংখ্যক লোক নামাজে জানাজা আদায় করেন। তিনি নিজ হাতেই অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সহিত আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজ প্রিয় পীরকে কবরে শোয়াইয়া দেন। কবরে মাটি ফেলার পূর্বে হজরত মাওলানা জহুর আহমদ সাহেব (বাগবী) (রঃ) যিনি আলা হজরতের বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন, উপস্থিত সকলের উদ্দেশে উচ্চস্বরে আলা হজরত কুদ্দুস্ সিররুহুর উপদেশ বাণী পড়িয়া শুনান। অতঃপর হজরতে আকদাসের পবিত্র হাতে হাত রাখিয়া সকল তরীকাপন্থী ভাই নূতনভাবে বাইয়াত হইলেন। ইহার পর কবরের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হইল। আল্‌হামদুলিল্লাহ, তরীকার ভাইদের মধ্যে যাহারা জানাজায় শরীক ছিলেন তাহাদের কাহারো কোন অভিযোগ ছিল

না। সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে আলা হজরতের উপদেশ মানিয়া নেন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সত্য অন্বেষণকারীদিগকে আলা হজরতের ইন্তেকালের পর হজরতে সানী (রঃ) অর্থাৎ মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের উসিলায় আভ্যন্তরীণ স্থিরতা এবং যাবতীয় কল্যান দান করিলেন।

ধৈর্য্য ও স্থিরতা

হজরতে আকদাস (রঃ) ধৈর্য্য ও স্থিরতায় পর্বত প্রমাণ ছিলেন যাহার মোকাবিলায় পার্থিব সকল বাধা বিপত্তি নিজেরাই নিঃশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। এই পথে সকল কঠিনতা তিনি ধৈর্য্য ও স্থিরতার সহিত মোকাবিলা করিয়াছেন, নিজ পদমর্যাদা ঠিক রাখিয়াছেন এবং দৃঢ় পদক্ষেপে সামান্যতম ত্রুটিও ঘটিতে দেন নাই। পীরের উপদেশের প্রত্যেকটি কথাকে তিনি প্রতিকূল অবস্থাতেও পূর্ণ সাহসিকতার সহিত রক্ষা করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম ও শিক্ষামূলক ইংগিত ঃ ১৩৭৪ হিজরীর শাউয়াল মাসে হজরতে আকদাস মানসাহারায় পদার্পন করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার সহিত ছিলাম। সে সময় পরিবেশ ছিল নির্জন। সেবক এবং সেবাগ্রহণকারী ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। জানিনা তখন হজরতে আকদাসের অন্তরে কোন প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধারণের মত অবস্থা ছিল কিনা, হঠাৎ তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে যে কোথাও চলিয়া যাই। কিন্তু তখনই মনে পড়ে যে দায়িত্ব পালনের ওয়াদা করিয়া বসিয়াছি।

নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন

এই মহান কর্তব্য পালনের দাবী ইহাই ছিল যে, তিনি কোন অবস্থাতেই সত্যান্বেষণকারীদের পথ প্রদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইতে বিরত থাকিবেন না। সুতরাং তিনি নিজেকে সকল প্রকার ব্যস্ততা ও অস্থিরতা হইতে বিমুক্ত রাখিয়া পূর্ণ খেয়ালে তরীকা অন্বেষণকারীদের প্রশিক্ষণ ও উপদেশ দানের মাধ্যমে অন্তরকে শান্তির প্রতি নিবদ্ধ রাখিতেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে মারেফাতের ধ্যানের অপরিসীম শক্তি দ্বারা ধন্য করিয়াছেন। যেই ভক্তের প্রতি সামান্য ধ্যানও করিয়াছেন, তাহার অন্তর ও আত্মাকে আল্লাহর পরিচয় লাভের খুশিতে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। পীরের দায়িত্ব পালন কোন ফুলের মালা নয় বরং উহা একটি কন্টক বিশিষ্ট মুকুটের ন্যায়। তাহা সেই বিদগ্ধ ব্যক্তির শিরেই শোভা পায় যিনি সত্য অনুসন্ধানের পথে অসংখ্য দুর্গম ঘাঁটিসমূহের কন্টকাকীর্ণ পথকে সংযম ও তাওয়াক্কুল এর মাধ্যমে স্থিরতার সহিত অতিক্রম করিতে সক্ষম। বিশেষভাবে তখন, যখন একজন সিদ্ধ ও অতি উচ্চ

মর্যাদাবান পীর তাঁহার মারেফাতের গদীর সম্মান রক্ষার্থে তাঁহাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া দেন। যে কোন সাধারণ মানুষ এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বিশ্বাসিগণ যাহারা প্রকাশ্যে পীর সাহেবদের বাহ্যিক চাল চলন লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহারা মনে করিবেন যে, পীরত্ব শুধু প্রাচুর্য্য ও বিলাসিতা লাভের একটি পথ। কিন্তু ইহারা জানেন না যে, হক্কানী পীরের দৃষ্টিতে কোন ধনী ব্যক্তিকে নিজের মুরীদের অন্তর্ভুক্ত করার খেয়াল করাও কুফ্‌রীর সমতুল্য। তাঁহারা সম্পদ জমা করেন না, বরং সম্পদ বিলাইয়া দেন। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এর বক্তব্য হইল এই যে, রোজে নও, রুজিয়ে নও। সেই অনুযায়ী সেই সকল হজরতের প্রত্যেকটি নূতন দিন নূতন কিছু নিয়া আসিত। চির মহান দাতার অদৃশ্য খাজানা হইতে যাহা কিছু তাঁহাদের নিকট আসিত তাহা রাতের পূর্বেই হকদারের নিকট পৌছিয়া যাইত। দুঃখের বিষয় এই যে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক গদীনিশীন পীর সত্যিকারের পীরদের মর্তবাকেও কলুষিত করিয়া দিতেছে। হজরতে আকদাসের পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে জ্ঞাত শত সহস্র সত্য সাক্ষী বিদ্যমান আছেন যে, তিনি যেরূপ সংযম, ত্যাগ ও নিঃসার্থ সেবার মাধ্যমে তাঁহার জীবনের ১৪/১৫ বৎসর লেখাপড়ায় এবং প্রায় তৎসমতুল্য সময় গদীনিশীন অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছেন, উহার দৃষ্টান্ত প্রথম যুগের মানুষের মধ্যে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও বর্তমান যুগে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

দ্বিতীয় কাইউমে জামান

হজরতে আকদাস আলা হজরতের উপদেশ অনুযায়ী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পূর্বে তিনি এই পদের দায়িত্ব পালন করার কথা কখন কল্পনাও করেন নাই। ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাহা আলা হজরত আল্লাহর ইশারায় তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। এই পথের বিপদসমূহের কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু সম্মানিত পীরের নির্দেশের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবোধ ছিল যে বাকী জীবন তিনি তরীকার প্রচার ও প্রসারের কাজেই ব্যয় করে।

তিনি হজরতে আলার প্রধান খলীফা ছিলেন। এই মর্যাদাপূর্ণ আসনের দাবীও ইহাই ছিল যে, তিনি নিজের ও পরিবার-পরিজনদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া পীরের খানকায় সম্মান এবং ইজ্জতকে নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী ঠিক রাখিবেন। অতএব তিনি পবিত্র তরীকার খেদমতকে নিজের মৌলিক কাজ হিসাবে স্থির করিলেন। ইহাই ছিল পীরের দাবী এবং নায়েবে কাইউমে জামান হওয়ার জন্য শর্ত। তিনি অন্যান্য কাজ হইতে দৃষ্টি রাখিয়া ইহাকেই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য স্থির করেন।

হজরতে আলার ইন্তেকালের পর যে সকল তরীকাপন্থী ব্যক্তির অন্তর দুঃখে জর্জরিত, চেহারা মলিন এবং দুর্বল মনে হইতেছিল, তাহাদের অন্তরে সাহস, চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব এবং মনোবলকে বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং তরীকার স্তরসমূহ অতিক্রম করানোর কাজে নিজের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

মাওলানা সাইয়েদ জামিল আহমদ সাহেব বর্ণনা করেনঃ আলা হজরত কুদ্দুসু সিররুহুর ইন্তেকালের পর আমি অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিজের মধ্যে নূতন করিয়া মুরীদ হওয়ার সাহস পাইতেছিলাম না। বরং কখনও কখনও এরূপ চিন্তাও হইত যে, এখন চিস্তিয়া ও সাবেরিয়া তরিকার মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি আনার চেষ্টা করিব। অন্তরের এরূপ বিভিন্ন অস্থিরতার মধ্যে আমি হজরতে আকদাসের নিকট আলা হজরতের ইন্তেকালের জন্য দুঃখ এবং হৃদয়ের অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া একটি চিঠি লিখিলাম। চিঠির উত্তরে হজরতে আকদাস লিখিলেনঃ নিঃসন্দেহে আলা হজরতের ইন্তেকাল একটি বিরাট দুর্ঘটনা যাহা তরীকাপন্থীদের জন্য একটি কঠিন ও বেদনাদায়ক ব্যাপার এবং অস্থিরতার কারণও বটে। কিন্তু জানিবেন যে, আলা হজরত এরূপ শক্ত হাতে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উপস্থিতিতে ইনশা আল্লাহ্ তরীকার ভাইদের নিরাশ হইবার কোন আশংকা নাই। হজরতে আকদাসের এই উৎসাহদান এবং আন্তরিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া আমি তাঁহার হাতে নূতনভাবে বাইয়াত গ্রহণ করিলাম এবং আলহামদু লিল্লাহ, আমি ধারণাতীতভাবে তাঁহার সুদৃষ্টি ও বুযুর্গীর সুফল দ্বারা ধন্য হইতে পারিয়াছি।

মাওলানা জামীল আহমদ সাহেব আরো বর্ণনা করেনঃ যখন আমি নূতনভাবে বাইয়াত হওয়ার জন্য উপস্থিত হইলাম, তখন পূর্বের ন্যায় সরলভাবে বলিলাম যে, নূতনভাবে বাইয়াত গ্রহণ করার ইচ্ছাতো পোষণ করিতেছি, কিন্তু আপনার জালালীয়াতের ভয় পাইতেছি। এইজন্য আশংকা এই যে, পূর্বের খোলামেলা ব্যবহারের অভ্যাসের কারণে পীরের সম্মান রক্ষা করিতে কোন ত্রুটি হইয়া যাইতে পারে এবং আলা হজরত যাহা কিছু দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আবার হারাইয়া ফেলিতে পারি। ইহা শুনিয়া হজরতে আকদাস মুচকি হাসিলেন এবং স্নেহ ও আদরের সহিত জড়াইয়া ধরিলেন। অতঃপর বলিলেনঃ এইরূপ কোন চিন্তা করিবেন না। আপনার সহিত যেরূপ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা ইনশা আল্লাহ বহাল থাকিবে।

মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেবের উপর স্নেহ ও সুদৃষ্টি

হজরত মাওলানা আব্দুল খালেক (রঃ) মাদ্রাসায়ে আরাবীয়া কবীর ওয়ালার বানী এবং মুহতামীম ছিলেন। ঐ সময় তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকও ছিলেন এবং

সেইসঙ্গে আলা হজরতের নিকট তরীকার সবক গ্রহণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায়ই আলা হজরত ইন্তেকাল করিলে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিলেন। কেননা তিনি সবক গ্রহণের মাঝপথে হজরতে আলাকে হারান। হজরতে আকদাসের গদীনিশীন হওয়ার খবর জানিতে পারিয়া তিনি পূর্ব সম্পর্কের সূত্রে তাঁহার নিকট দয়ার আশা করিলেন। কিন্তু সরাসরি আবেদন করিতে সাহস না পাইয়া হজরত আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এর দ্বারা একটি অনুরোধ লিপি লিখিয়া পাঠান এবং নূতনভাবে মুরীদ হওয়ায় আবেদন জানান। অনুরোধ লিপির কথাগুলো নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

সম্মানিত জনাব মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, সালাম অন্তে জানিবেন যে, আমি বর্তমানে আল্ হামদুলিল্লাহ অনেকটা সুস্থ আছি। সামান্য রোগ এখনও আছে। ইনশাআল্লাহ তাহাও দূর হইয়া যাইবে। যাহাই হোক, আমার জন্য দোয়া করিবেন। এই চিঠি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ পাক তাঁহার অসীম দয়ায় আপনাকে তাঁহার নৈকট্যদান করিয়াছেন এবং আপনার পীরের বিশেষ ফয়েজের দ্বারা আপনাকে ধন্য করিয়াছেন। এই কারণেই আলা হজরতের ইন্তেকালের পর তাঁহার মুরীদদের অন্তর আপনার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই অসীম অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন, আপনি যথাসম্ভব অন্যদের পিপাসা দূর করিতে ত্রুটি করিবেন না। পত্রবাহক মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব দারুল উলুমের শিক্ষক। তিনি আলহামদুলিল্লাহ আলা হজরতের মুরীদ ছিলেন। কিন্তু অন্তরের পিপাসা মিটিবার পূর্বেই পীরের ইন্তেকাল তাঁহাকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাঁহার যাবতীয় আশা আপনার উপর নির্ভরশীল, যদিও এই ব্যাপারে অনুরোধ করার প্রয়োজন নাই। আপনার প্রতি মাওলানা সাহেবের বিশেষ ভক্তি এবং সম্পর্ক আছে। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আপনার সহিত আমার পুরাতন সম্পর্কের সূত্র ধরিয়া আমিও সুপারিশ করিয়া সওয়াবের ভাগী হইতে ইচ্ছুক। আমি আশা করি যে, আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া উল্লেখিত মাওলানা সাহেবকে দয়া করিবেন ও তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন। এই অবস্থায় আমিও সৎ কর্মের উপদেশ দাতার ন্যায় পুণ্য অর্জনের আশা রাখি।

অচ্ছালাম শিব্বির আহমদ ওসমানী
দেওবন্দ দারুল উলুম
৬ই জিলহাজ, ১৩৬৪ হিজরী।

হজরত আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী সাহেব হজরতে আকদাস মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের হাদিসের ওস্তাদ ছিলেন। সে কারণে এই অনুরোধ লিপি পাইয়া হজরতে আকদাস মাওলানা আব্দুল খালেকের প্রতি বিশেষ স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করেন

এবং কয়েক বছরের মধ্যেই নকশবন্দীয়া তরীকার শিক্ষা ও জ্ঞান পূর্ণ করিয়া দেন। হজ্জের সময় হারাম শরীফে বসিয়া তিনি তাঁহাকে এই পবিত্র তরীকার অনুমতিও দান করেন। প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, উল্লেখিত মাওলানা সাহেব এমনই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যা পীরসাহেবকে অতিশয় দয়া ও অনুগ্রহ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুতঃ একদিকে ছিল সত্যিকারের গ্রহণের আগ্রহ এবং অন্যদিকে ছিল প্রদানের আগ্রহ। কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। যেভাবে চাওয়ার নিয়ম আছে সেইভাবে চাও, আল্লাহর নিকট হইতে মানুষ কিনা পাইতে পারে?

কুতুবখানার সম্প্রসারণ

আলা হজরত কুদ্দুসু সিররুহু তাঁহার উপদেশলিপি অনুযায়ী হজরতে আকদাসকে কুতুবখানার সংরক্ষণ এবং উহার উন্নতি ও সম্প্রসারণের দায়িত্বভারও ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কাজেই হজরতে আকদাস অতীতে বুযুর্গদের এবং গুণীজনদের মূল্যবান কিতাবসমূহের সর্বদা কেবল সংরক্ষণই করেন নাই, উপরন্তু এই মূল্যবান সম্পদের যথাসাধ্য উন্নতির প্রতিও খেয়াল রাখেন। একবার হজ্জ পালন করিতে যাইয়া মদীনা শরীফের কুতুবখানা হইতে তসাওউফ বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর হাতে লেখা একটি দুষ্প্রাপ্য কিতাব ৭০০ রিয়াল দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি কুতুবখানার সৌন্দর্য বর্ধন করেন। হজ্জব্রত শেষ করিয়া তাঁহার দেশে ফিরিবার সময় করাচী কাষ্টমস অফিসে মালপত্র চেকিং হইতেছিল। এক পর্যায়ে কাষ্টমস অফিসার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট স্বর্ণ আছে কি? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আমার নিকট স্বর্ণ হইল এই কিতাবগুলি। যদি আমার নিকট আরো টাকা থাকিত তাহা হইলে এই স্বর্ণ আরো ক্রয় করিয়া আনিতাম।

মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ সাহেবকে (ফাজেলে মাজাহের উলুম) কুতুবখানার দেখাশুনা এবং কিতাবসমূহের বাঁধাই করার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। উল্লেখিত মাওলানা সাহেব বর্তমানেও খানকা শরীফে অবস্থান করিয়া কিতাবের দেখাশুনা এবং যাবতীয় খেদমত সম্পন্ন করিতেছেন।

খানকা শরীফের সহিত সম্পর্কিত দালানসমূহ যথা কুতুবখানা, তসবীহ খানা, মেহমান খানা এবং মুরীদদের জন্য ৪টি কক্ষ, মাদ্রাসায়ে সা'দীয়া এবং একটি বিরাট মসজিদ আলা হজরতের জীবদ্দশায়ই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আস্তর করাইবার পূর্বেই হজরতে আলা ইন্তেকাল করেন। হজরতে আকদাসের গদীনিশীন অবস্থায় দালানের কাজের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। একবার কুন্দিয়া রেল ষ্টেশনের কর্মচারিগণ প্রস্তাব দিয়াছিলেন, "অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা মাসে মাসে

টাকা জমা দিতে থাকিব, যাহাতে গম্বুজ ও মিনারের কাজ এবং মসজিদের ভিতর ও বাহিরের আস্তর সম্পূর্ণ করা যায়।" কিন্তু হজরতে আকদাস অনাগ্রহভরে বলিলেনঃ আমার পক্ষে চাঁদার হিসাব নিকাশ রাখা অসম্ভব। এজন্য আমি আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, তিনি বর্তমান ইমরাতসমূহের কাজ সম্পন্ন করা অথবা উহার উন্নতি সাধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু অভিজ্ঞ মহল জানেন যে, তাঁহার দৃষ্টিতে পীরের উপদেশ বাণী পালন করা প্রথম কর্তব্য ছিল। তাঁহার প্রতি তরীকার প্রচারের কাজে পূর্ণ শক্তি নিয়োগের নির্দেশ ছিল। নির্মাণ কাজের ব্যাপারে তেমন কোন বিশেষ আদেশ দেওয়া হয় নাই। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনবোধে পরিবার পরিজনদের জন্য রক্ষিত খালি জায়গায় একটি ঘর লংগর খানার খরচে নির্মাণের সুযোগ তাঁহার ছিল।

অতএব জীবনের শেষ সময়টুকুতে তিনি দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি থাকার ঘর নির্মাণ করেন এবং মাত্র বছর খানেক সময় সপরিবারে সেখানে বসবাস করেন। কুতুবখানার উন্নতির লক্ষ্যে একটি বড় দালান নির্মাণ করার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বাস্তবায়নের পূর্বেই তিনি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেন। নিম্নে প্রদত্ত বর্ণনাদি হজরত জনাব কাজী শামসুদ্দিন সাহেব মদ্দেজিল্লুহু কর্তৃক বর্ণিতঃ

বিশেষ অবদান ঃ

কাজী সাহেব বর্ণনা করেনঃ প্রথম দিকে আমি যখন খানকা শরীফে উপস্থিত হইতাম তখন হজরতে আকদাস আমাকে তাঁহার সহিত চা পান করাইতেন। দুই একদিন পর জানিতে পারিলাম, লংগরখানা হইতে চা শুধু হজরতের জন্যই আসে এবং হুজুর অনুগ্রহপূর্বক আমাকেও তাহার শরীক করেন। কাজেই আমি একবার চা পানের সময় মসজিদের দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেলাম। চা আসিলে হজরত আমাকে ডাকাইলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। তিনি মিঞা গুল মুহাম্মাদ মাখদুমকে বলিলেনঃ কাজী সাহেবকে খুঁজিয়া আন। আমি উপস্থিত হইলাম। হজরত বলিলেনঃ কাজী সাহেব! আপনি আমার সহিত চা পান করিবেন। এই ঘটনা প্রথম উপস্থিতির। ইহার দুই দিন পর বাইয়াতের সৌভাগ্যে ধন্য হইয়াছি। বাইয়াতের পর যখনই যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছি, তখনই এই খেয়ালে থাকিয়া গিয়াছি যে, না জানি আবার কবে আসিতে পারিব। দুই চারদিন আরও থাকিয়া যাই। এইভাবে জ্বিলহজ্জ মাসের ৭ তারিখ আসিয়া পড়িল। ঈদ উপলক্ষে বাড়ী যাইবার ইচ্ছা করিলাম এবং অনুমতি নেওয়ার জন্য হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুনরায় কবে

আসিবেন? বাড়ী যাইয়া আমাকে ভুলিয়া যাইবেন না তো?" এই বিশেষ স্নেহ ও যত্নের ফল এই হইল যে, যদিও তখন বাড়ী গিয়াছিলাম কিন্তু ঈদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৪ই জিলহজ্জ ১৩৬০ হিজরীতে পুনরায় খানকা শরীফে উপস্থিত হইলাম। হজরত অত্যন্ত খুশি হইলেন। এইবার হজরতের কক্ষের নিকটেই একটি কক্ষে আমাকে থাকিতে দিলেন। ফলে সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া হজরতের খেদমত করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।

সুমহান চরিত্র

হজরতে আকদাস অতি উন্নত স্বভাবের অধিকারী এবং সকলের নিকট একান্ত প্রিয়জন ছিলেন। কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ খেদমত গ্রহণের ইচ্ছা করিলে তাহা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিতেন। আমি যতদিন তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়াছি তন্মধ্যে হজরত কখনও আমাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। পানি পান করার প্রয়োজন হইলেও এইভাবে বলিতেনঃ কাজী সাহেব। একটু পানি পান করাইবেন কি?

একদিন আমার খুব চা পান করার ইচ্ছা হইল। দরজার নিকটে সূফী আব্দুল্লাহ সাহেবকে দেখিয়া খুব আস্তে তাঁহাকে ডাকিলাম। কিন্তু তিনি ডাক শুনিলেন না এবং চলিয়া গেলেন। হজরতে আকদাস তাঁহার নিজ কক্ষে বসিয়াই আমার ডাক শুনিলেন এবং কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিছু লাগিবে কি?' আমি বলিলাম, না হজরত, কিছুই লাগিবে না। হজরত বলিলেন, তাহা হইলে আব্দুল্লাহকে কেন ডাকিয়াছিলেন? আমি যতই কথা ঘুরাইতে চাহিলাম তিনি ততই বারবার জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কি প্রয়োজন সত্যি করিয়া বলুন। আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া বলিলাম, হজরত ঐ সময় আমার চা খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়া আব্দুল্লাহকে ডাকিয়াছিলাম। তিনি বলিলেনঃ মুখ ঢাকিয়া রাখুন যেন ঠান্ডা না লাগে। আমি সূফী আব্দুল্লাহকে পাঠাইয়া দিতেছি। সে আসিয়া চা বানাইয়া দিবে। আমি তাঁহার আদেশ অনুযায়ী মুখ ঢাকিয়া রাখিলাম এবং হজরত আকদাস তখন নিজেই চা তৈয়ার করিতে শুরু করিলেন। চা তৈরির পর ট্রের উপর টি পট এবং একটি পিয়ালা সহ আমার চৌকির নিকট রাখিলেন এবং আমাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ কাজী সাহেবজী, আব্দুল্লাহ চা বানাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। আপনি উঠুন এবং চা পান করুন।

আরও একবার আমার খুব জ্বর হইয়াছিল। আমি কাপড় জড়াইয়া শুইয়াছিলাম। হঠাৎ কে যেন আসিয়া আমার শরীর টিপিতে শুরু করিলেন। মুখ খুলিয়া দেখিলাম, স্বয়ং হজরতে আকদাস। ইহা দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম এবং উঠিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে উঠিতে দিলেন না। ভাবিলে অবাক হইতে হয়

যে, মানবতাবোধ ও পরোপকারের প্রতি তাঁহার এইরূপ আকর্ষণ ছিল যে, মখদুম নিজেই খাদেমের খেদমত করিতেন এবং খাদেমদের যাবতীয় কষ্ট অত্যন্ত স্নেহমাখা কথার দ্বারা দূর করিয়া দিতেন।

পীরের সহিত ভালবাসার সম্পর্ক

আলা হজরতের সহিত হজরতে আকদাসের অত্যন্ত গাঢ় সম্পর্ক ও ভালবাসা ছিল। আলা হজরতের কথা মনে পড়িলেই বিচ্ছিন্নতার জন্য ব্যথিত হইতেন এবং অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে এই কবিতাটি পড়িতেনঃ

باز گواز بخد واز یاران بخر = تاد ردریواررابو
اموردینیه من رسوخ اور پختگی .

ধর্মীয় কাজের দক্ষতা ও দৃঢ়তা

ফরজ ব্যতীত সুন্নত এবং মুস্তাহাব যত্ন সহকারে আদায় করার কাজে আমাদের হজরত বিশেষ তৎপর থাকিতেন। হানাফী ফেকাহ্ শাস্ত্র মতে আজানের মুস্তাহাব সময় নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে সৌর ঘড়ি নির্মাণ করিয়া মসজিদের পাশে রাখিতেন। প্রত্যেক দিন নিয়মিতভাবে সূর্য ঢলিয়া পড়ার সময় নিজের পকেটের ঘড়ি মিলাইয়া নিতেন। পোষাক পরিচ্ছদে তিনি সুন্নতের এত বেশী অনুসারী ছিলেন যে, তাহাকে একপ্রকার হজরতে আলার কেরামতই বলা যাইতে পারে। তাঁহার দেহ একটু মোটা ধরনের ছিল। এবং মোটা মানুষের লুঙ্গি সাধারণতঃ টাখনুর নীচে নামিয়া যায়। কিন্তু তাঁহার লুঙ্গি কখনই টাখনুর নীচে পড়িত না। শরীয়াতের অনুসরণ এবং সুন্নাতের অনুকরণে তিনি এইরূপ যত্নবান ছিলেন যে, মসজিদে আগমনকারী অথবা নিগর্মনকারীর পা যদি ভুলবশতঃ সুন্নাতের বিপরীত হইত তাহা হইলে তাহাকে ডাকিয়া সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, প্রবেশ করিবার সময় ডান পা এবং বাহির হইবার সময় বাম পা আগে রাখিতে হইবে।

উত্তম কাজের প্রতি যত্ন

যেসব কাজ সুন্নত হওয়া না হওয়া নিয়া মুফ্তীদের মধ্যে দ্বিমত দেখিতেন, ফেকাহ্মতে তাহার উপর স্পষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকিলে তিনি সেসব পছন্দ করিতেন। যেমন ফজরের সুন্নতের পর কয়েক মিনিটের জন্য তিনি শয়ন করিতেন কিন্তু ইহা নিয়মিত পালন করিতেন না। এইভাবে দুই সিজদার মাঝখানে বসিয়া আল্লাহুম্মাগ ফিরলী অর হামৃনী অহ্দীনী অরজুক্নী, অজবুড়নী– এই দোয়াটি তিনি পাঠ করিতেন। ফরজ নামাজের মধ্যে আল্লাহুম্মাগ ফিরলী অরহামনী পর্যন্ত পড়িতেন; কেননা ইমাম

আহমদ ইবনে হাম্বল এর মতে ইহা পড়া ওয়াজীব। বিতেরের নামাজের পর তিনবার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, দুইবার আস্তে এবং তৃতীয়বার একটু জোরের সহিত কুদ্দুস এর ওয়াওকে টানিয়া পড়িতেন। হজরতে আকদাস বলিতেনঃ আমি দেওবন্দের মুতাওয়াল্লী মুহাম্মদ ইব্রাহীম (রঃ), যিনি বন্টনকারীদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তাঁহাকে এই সুন্নতের উপর আমল করিতে দেখিয়াছি।

সুরা অলীফলাম মীম আস্‌সিজদা পড়ার অভ্যাস ঃ

কাজী শামসুদ্দিন আলী মুদ্দা জিল্লুলুল বর্ণনা করেনঃ আমি হজরতে আকদাসকে একটি সিজদাহ করিতে দেখিয়াছিলাম এবং তাহার কারণ আমার জানা ছিল না। একদিন জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলিলাম, আপনি প্রত্যহ একটি সিজদাহ্ কেন আদায় করেন? তিনি বলিলেনঃ সাথীদেরকে জানাইয়া দাও যে, আমি সুরায়ে আলীফ লাম মীম আস্‌সিজদাহ তেলাওয়াত করি; এই জন্যই সিজদাহ আদায় করি। কেহ যেন ইহাকে সিজদায়ে শুকরিয়া মনে করিয়া আমার অনুকরণ আরম্ভ করিয়া না দেয়। হজরত রমজান শরীফের শেষ রাত্রে বিতেরের পর এই সুরাটি তেলাওয়াত করিতেন। অতঃপর এই সময় পরিবর্তন করিয়া দেন।

ফরজ নামাজের পর একটি বিশেষ দোয়া পাঠ করা

প্রত্যেক ফরজ নামাজের সালাম ফিরাইবার পর তিনি ডান হাতটি মাথার উপর দিয়া পিছনের দিকে নিয়া যাইতেন। উল্লেখিত কাজী সাহেব একদিন এই সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন, হজরত, নামাজের পর আপনি মাথার উপর কেন হাত বুলান? তিনি উত্তর দিলেনঃ কুতুবখানা হইতে হাসানে হাসীন কিতাবখানা নিয়া আস। কাজী সাহেব কিতাবখানা নিয়া আসিলেন। তিনি কিতাব খুলিয়া সংশ্লিষ্ট হাদীসটি বাহির করিয়া দেখাইলেন যে, হুজুর (দঃ) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এইরূপ ভাবেই মাথার উপর হাত রাখিয়া এই দোয়াটি পড়িতেনঃ

"বিসমিল্লা হিল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রহীম। আল্লাহুম্মা আজহিব অন্নীল হাম্মা ওয়াল হুজনা।

ফেকাহ্ শাস্ত্রে মধ্যমপন্থা

রাফইদাইন করা এবং উচ্চস্বরে আমীন বলার ব্যাপারেও তিনি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করিতেন না। নিজে বলিতেন না, কিন্তু যাহারা বলিত তাহাদিগকে পড়ার নিষেধও করিতেন না। ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার ব্যাপারে তিনি একই মনোভাব পোষণ করিতেন। মাওলানা মুহাম্মদ ওমর সাহেব বস্তবী তাঁহার বাইয়াত গ্রহণ করেন।

তিনি আহ্‌লে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বলিলেন, আমি হানাফীদের মাদ্রাসায় ফেকাহে হানাফী পড়িয়াছি। আমি দুই পক্ষের দলিলসমূহই জানি। কিন্তু ইমামের পিছনে আমি সুরায়ে ফাতেহা না পড়িয়া পারিনা। এই কথা শুনিয়া হজরতে আকদাস তাঁহাকে অনুমতি দিয়া বলিলেনঃ আপনি পড়িতে পাড়েন। এজন্য যে, কোন কোন ইমামের মতে ইমামের পিছনে কেরাত জায়েজ আছে। অতঃপর মাওলানা মোহাম্মদ ওমর সাহেব হজরতে আকদাসের পিছনে নামাজের মধ্যে ফাতেহা পড়ার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মাওলানা সাহেব শত চেষ্টা করিয়াও কেরাত পড়িতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, জবান যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হজরতে আকদাস এ ভাবেই উল্লেখিত মাওলানা সাহেবের অন্তরকে অকল্পনীয় ভাবে তাঁহার অনুকরণে বাধ্য করিয়াছিলেন। মাওলানা সাহেবও এই বুযুর্গি ও কেরামত দেখিয়া হানাফী মতবাদের সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলেন। সুবহানাল্লাহ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কিরূপ নিয়ম ও পদ্ধতি ছিল, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে পরিবর্তন আসিয়া যাইত।

পীরের সম্মানের প্রতি যত্নবান হওয়া

কাজী সামসুদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেনঃ কুন্দিয়াতে একজন মাওলানা সাহেব ছিলেন যিনি আলা হজরত কুদ্দুসুসিররুহুর সহিত শত্রুতা রাখিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা করিতেন। একবার তিনি কোন একটি মাসয়ালা সম্পর্কে জানার জন্য খানকায়ে সিরাজিয়ার কুতুবখানায় কিতাব দেখিতে আসিলেন। হজরতে আকদাসকে খবর দিলাম যে, অমুক মাওলানা সাহেব কিতাব দেখার জন্য আসিয়াছেন। হজরত বলিলেন ঃ কুতুবখানা খুলিয়া দাও। তিনি অনেকক্ষণ কিতাব দেখার পর হজরতে আকদাসের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুরু করিলেন। এক পর্যায়ে হজরতে আকদাসের চেহারায় রাগের ভাব দেখা দিল। তিনি বলিলেনঃ বাস্! মাওলানা সাহেব বেশী কথা বলিবেন না। আপনি আমাদের পীর আবু সা'দ আহ্‌মদ খান সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন। ছিঃ ছিঃ নাউজুবিল্লাহ মিন গজাবিল হালীম। অতঃপর মাওলানা সাহেব সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

সুন্নত বিরোধী কাজের কড়াকড়িঃ আলা হজরত কদ্দুসু সিররুহুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মালিক হাকীম খান সাহেব খানকা শরীফে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের দুই চার দিন পর অন্য মহল্লার কিছু সংখ্যক মহিলা শোক প্রকাশ করার জন্য আসিল এবং তাহাদের গ্রামের নিয়ম অনুযায়ী উচ্চস্বরে কান্নাকাটি আরম্ভ করিল। এই আওয়াজ হজরতে আকদাসের কানে আসিলে তিনি খালি পায়ে দৌড়াইয়া দরজার নিকট আসিয়া

বলিলেনঃ এই সব বন্ধ করুন কেননা ইহা শরীয়াতে নিষিদ্ধ। যাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হয় চুপে চুপে কাঁদিবেন।

হজরতে আকদাসের আওয়াজ শুনিয়া সকল মহিলা চুপ হইয়া গেল। আলা হজরতের মৃত্যুর এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি দাবী করিলেন যে, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হউক। হজরতে আকদাস জানিতেন যে, এই প্রথা ভবিষ্যতে বাৎসরিক ওরসে রূপান্তরিত হইবে। এই কারণেই তিনি ইহাতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু সকলেই খুব জোরাল আবেদন করিলে তিনি তিনটি শর্তের উপর অনুমতি দান করিলেন। শর্তগুলি এইঃ

(১) কোন খবরের কাগজ অথবা পোষ্টারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা যাইবে না,

(২) শুধু পুরুষরাই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন, মহিলা ও বাচ্চারা আসিতে পারিবেনা।

(৩) কুরআন খানী, দোয়া এবং জিয়ারতের মধ্যেই অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ থাকিবে।

এই শর্তসমূহ মানিয়া নেওয়া হইল এবং অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। প্রথম ও তৃতীয় শর্ত মানা সম্ভব হইলেও দ্বিতীয় শর্ত অনুসৃত হইল না। অনেক মহিলা এবং বাচ্চারা আসিয়াছিল। ফলে লংগরখানা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি দেখা দিল। বাচ্চারা লোকের ক্ষেত নষ্ট করিল। হজরতে আকদাস বলিলেনঃ আল্লাহর বন্দাদের হক নষ্ট করার এই অপরাধ কে মাথায় নিবে? কাজেই আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আগামী বৎসর কোনরূপ জামায়েত হইবেনা। ইহার ফলে অতঃপর বাৎসরিক খতমের ব্যবস্থাও স্থগিত হইয়া গেল। ভক্তদের মধ্যে যাহার ইচ্ছা হইত আসিত এবং ফাতেহা পাঠ করিয়া চালিয়া যাইত। কোনরূপ অনুষ্ঠান হইতনা। বর্তমান গদীনিশীন হজরত আবুল খলীল খান মুহাম্মদ সাহেব হজরত আকদাসের ইন্তেকালের পর এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং স্থায়ী ইসালে সওয়াবের সিলসিলা সর্বদা নীরবেই চালু রহিয়াছে।

পবিত্র অভ্যাসঃ পবিত্র অভ্যাসের এইরূপ প্রকাশ ছিল যে, যদি হজরতে আকদাসের উপস্থিতিতে কোন ঘৃণিত বস্তুর উল্লেখ হইত তাহা হইলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার মন খারাপ থাকিত। একবার বাগড়ে খাওয়ার সময় তিনি মাছ খাইতেছিলেন। উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে একজন মাছের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হজরত ইহা নদীর মাছ। নদীর মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। পক্ষান্তরে সমুদ্র ও পুকুরের মাছ এত খারাপ লাগে যে , মাছতো নয়, মনে হয় যেন গোবর খাইলাম। একথা শুনিয়া হজরতে আকদাস ঐ

ব্যক্তিকে সাবধান করিয়া বলিলেন যে খাওয়ার সময় কোন নাপাক জিনিষের আলোচনা করা উচিৎ নয়। এই কথা বলিয়া তিনি খাওয়ার মজলিস হইতে উঠিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন খারাপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর সেখান হইতে চলিয়া আসার পর একটু শান্ত হইলেন।

বস্তুবাদীদের প্রতি অমনোযোগিতা ঃ

রমজানুল মুবারকে মান সাহারায় অবস্থানকালে একদিন আহারের সময় কোন এক প্রদেশের গভর্ণরের লোক আসিয়া বলিল যে, গভর্ণর সাহেব সাক্ষাতের জন্য সময় চাহিতেছেন। হজরত বলিলেনঃ এখন সাক্ষাতের সুযোগ হইবেনা কারণ, আসরের নামাজের সময় হইয়া গিয়াছে। অতঃপর খতমে খাজেগান পড়িব এবং তাহার পরতো ইফতারীর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। আগামীকাল জোহরের পর তিনি সাক্ষাত করিতে পারেন।

অতএব গভর্ণর সাহেব সরকারী ডাক বাংলায় অবস্থান করিলেন এবং পরের দিন জোহরের নামাজের পর তাঁহার লোকজন সহ হজরতে আকদাসের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি হজরতের বরকতময় বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। এবং যাওয়ার সময় হাদীয়া স্বরূপ পাঁচশত টাকা পেশ করিলেন। হজরতে আকদাস অত্যন্ত ভদ্রভাবে হাদীয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। গভর্ণর সাহেব একটু মনঃক্ষুন্ন হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর হজরত বলিলেনঃ আমাদের মুরুব্বীদের অভ্যাস এই ছিল যে, তাঁহারা অপরিচিত ব্যক্তির হাদীয়া গ্রহণ করিতেন না। কেননা ইহার মধ্যে কোন না কোন দুনিয়াদারী উদ্দেশ্য থাকে। এই গভর্ণর সাহেব বর্তমানে কোন এক বিপদে আছেন, যেখানেই কোন পীর দরবেশের নাম শুনেন, সেখানেই উপস্থিত হইয়া হাদীয়া পেশ করেন ও দোয়া করিতে বলেন। আমার ধারণা যে, তিনি সফলকাম হইবেন না। এবং যখনই তিনি সফলকাম হইবেন না তখনই যাহারা হাদীয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্পর্কে না জানি কত কি বলিবেন। আলহামদুলিল্লাহ্, এই তালিকায় আমর নাম যুক্ত হইবে ন।

অতঃপর তিনি আলা হজরত কুদ্দুসু সিররুহুর একটি ঘটনা শুনাইলেনঃ যখন আলা হজরত দিল্লীতে হাকীম নাবীনা সাহেবের চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন কোন এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ অন্তে উল্লেখযোগ্য অংকের টাকা হাদীয়া স্বরূপ পেশ করিলেন। আলা হজরত নিজ অভ্যাস অনুযায়ী টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। উক্ত ধনী ব্যক্তির অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তাহা গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি বলিলেন, এই টাকা আপনি যাহাকে খুশি বিলাইয়া দেন, তবুও গ্রহণ করুন। হজরত

বলিলেনঃ সওদাগর সাহেব, ইহা আপনার কষ্টার্জিত উপার্জন। আপনার ইহার জন্য মায়া আছে। কাজেই আপনি খুঁজিয়া সঠিক অভাবী লোকদিগকে দান করুন। আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। অগত্যা সওদাগর সাহেব নীরবে চলিয়া গেলেন।

যাকাত গ্রহণ করিতে আপত্তি ঃ

হজরতে আকদাস তাঁহার দরিদ্র মুরীদগণ কর্তৃক যাকাতের টাকা গ্রহণ পছন্দ করিতেন না। একবার এক ধনী ব্যক্তি যাকাতের কিছু টাকা আনিয়া বলিলেন, ইহা যাকাতের টাকা। ইহা আপনার গরীব মুরীদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। হজরতে আকদাস বলিলেনঃ এখানে যাকাত পাইবার যোগ্য কেউ নাই। ইহারা সকলেই ধনী। আপনি আপনার টাকা ফেরত নিয়া যান এবং নিজেই উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া বন্টন করুন।

মান সাহারায় অবস্থানকালে হজরতে আকদাসের পক্ষ হইতে লংগরখানার খরচ বহন করা হইত। সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁহার এবং তাঁহার মুরিদদের শান শওকত দেখিয়া অবাক হইয়া যাইত। তাহারা মখমলের জামা পড়িতেন। ময়দার রুটি খাইতেন এবং অন্যকে খাওয়াইতেন। কাহারো কোন লেনদেন ছিলনা অথচ তাহারা ছিলেন ফকীর হিসেবে পরিচিত।

হজরতে আকদাসের দৃষ্টিতে তীরকার ফলাফল

কাজী সানাউল্লাহ পানিপাতি (রঃ) তাঁহার এরশাদুত তোয়ালেবীনের ইসবাতে বেলায়েতের অধ্যায়ে কাশফ ও কেরামতকে বেলায়েতের জন্য দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তদনুযায়ী যদি কেরামত প্রদর্শনকারী পরহেজগারী ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত থাকেন তবে কেরামত যাদুর গন্ডি বহির্ভূত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওলীত্ব প্রমাণিত হয়। হজরতে আকদাসের দ্বারা অনেক কেরামত প্রকাশ পাইয়াছে। আউলিয়াদের কেরামত সত্য (কেরামাতুল আউলিয়ায়ু হক্কুন)– এই মত সম্পর্কে কেরামতের আলোচনা এবং বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ্যে কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর না হইলেও তিনি কাশফ এবং কেরামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না এবং ইহা প্রকাশ করাও পছন্দ করিতেন ন। সেই কারণেই অসংখ্য ঘটনা থাকা সত্ত্বেও লেখক তাহা উল্লেখ করেন নাই। তবুও ঘটনাক্রমে দুই একটির উল্লেখ আলোচনার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার দৃষ্টিতে তাখল্লু কবি আখলাকিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, আন্তরিকতা, সংযম, আত্মশুদ্ধি, সচেতনতা, সর্বদা জিকিরে মশগুল থাকা এবং কথা ও কাজের মধ্যে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ, বিশেষ মর্যাদার অধিকার রাখে। সারাটি জীবন

তাঁহার কথা ও কর্মের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বত্রই ছিল যাহার মধ্যে হুজুর (সঃ) এর উসওয়ায়ে হাসানাতের পূর্ণ অনুসরণ পরিলক্ষিত হইত। হাঁটার সময়ও হুজুর (সঃ) এর হাঁটার মতই হাঁটিতেন। এইরকম মনে হইত যেন তিনি ঢালু জমিনের দিকে নামিতেছেন।

হাফেজ আমানউল্লাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি সারা জীবনে কখনও সাহেবে নেসাব হন নাই অর্থাৎ যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত হন নাই। ভক্তগণ যাহা কিছু হাদীয়া পেশ করিতেন তিনি তাহা সকলকে বিলাইয়া দিতেন। জীবনে এইরূপ কোনকাজ দৃষ্টিগোচর হয় নাই যাহা শরীয়ত বিরোধী। সংশোধন এবং প্রশিক্ষণের নিয়ম পদ্ধতি অতি সাধারণ এবং পবিত্র ছিল। কখনও কোন অপছন্দনীয় কাজ দেখিলে সে সম্পর্কেও তিনি সরাসরি নিষেধ না করিয়া কুরআন হাদীসের অনুসারী হইতে বলিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তিনি অজু করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বসা সকল মুরীদ দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন তিনি তাহাদের কোন এক জনকে বলিলেনঃ মাওলানা সাহেব, হাদিসে বলা আছে ঃ

وَمَاتَقُومُوا كما يَقُومُوالْيَهُودُوالنَصارٰى

(অর্থাৎ তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদের ন্যায় দাঁড়াইও না। যে রূপ তাহারা একে অপরের সম্মানার্থে দাঁড়াইত)? এই হাদিসের তাৎপর্য বলিতে পারেন কি মাওলানা সাহেব? অথবা, এশার নামাজের পর কেহ আলোচনা শুরু করিলে তিনি তাহাদের মধ্যে কোন একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেনঃ 'লা মুসামারাতা বাদা'ল ইশাই' (অর্থাৎ ইশার নামাজের পর কথা বলা উচিৎ নয়)– এই কথার কি অর্থ হইবে? ইহার দ্বারা সকল সাথীরা নিজ নিজ দুর্বলতা ও ত্রুটি বুঝিতে পারিতেন এবং সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। একবার উল্লেখিত হাফেজ সাহেব বিসমিল্লাহ না বলিয়াই পানির পিয়ালা পেশ করিলে হজরতে আকদাস বলিলেনঃ আপনি কি আমাকে বরকত বিহীন পানি পান করাইতে চান? ইহার পর হাফেজ সাহেবের অভ্যাস এমন হইল যে, বিসমিল্লাহ্ ছাড়া কোন কাজই তিনি করিতেন না।

কৃত্রিমতা ও প্রদর্শনী প্রবণতা হইতে বিরত থাকা

কৃত্রিমতা ও লোক দেখানো কাজ তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। যদি পদব্রজে খাদেমবৃন্দ সহ সফরে যাইতেন তখন তিনি খাদেমগণকে বলিতেনঃ সাথীগণ, ভিন্ন ভিন্ন হইয়া হাঁটো যাহাতে মানুষ তোমাদের দেখিয়া আকৃষ্ট না হয় এবং এই ধারণা না করে যে, কোন পীর সাহেব হয়ত তাঁহার দলবল নিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে যদি দুইজন সাথীও থাকিতেন, তাহা হইলেও একজন তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং অন্যজন

আগে আগে যাইতেন। একবার এই রকমটি ঘটিয়াছিলঃ তিনি লাহোরে হাকীম সাইফী সাহেব মরহুমের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে একদিন তিনি হাসপাতালে একজন রুগী দেখার এবং সেখান হইতে মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস সাহেবের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিলেন। পায়ে হাঁটিয়াই তিনি তসরীফ নিলেন। কাজী শামসুদ্দিন সাহেব এবং আমি (লেখক) সঙ্গে ছিলাম। রুগী দেখার পর তিনি মাওলানা সাহেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হইলেন। কাজী সাহেব হজরতে আকদাসের সহিত হাঁটিতেছিলেন এবং আমি পিছনে পিছনে আসিতেছিলাম। হঠাৎ হজরতে আকদাস পিছনের দিকে তাকাইয়া আমাকে বলিলেনঃ আপনি আগে আগে আমাদেরকে পথ দেখাইয়া নিয়া যান। আসলে রাস্তা দেখান কোন উদ্দেশ্য ছিলনা, উদ্দেশ্য ছিল এই যে কেহ তাঁহার পিছনে পিছনে খাদেমের ন্যায় চলুক তিনি তাহা পছন্দ করিতেন না। ঐ সময় যদিও ভয়ের কারণে আগে আগে চলা আমার পক্ষে কঠিন মনে হইতেছিল, কিন্তু আদেশ অমান্য করার উপায় ছিলনা। মাওলানা সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত এ অবস্থায় পৌছিলাম।

একটি স্বপ্ন এবং তাহার ব্যাখা

আমার (লেখক) বাইয়াত গ্রহণ করার কয়েকদিন পর স্বপ্নে দেখিলাম যে, একটি বিরাট কক্ষের মধ্যে চাদর বিছানো আছে এবং চতুর্দিকে দেওয়াল ঘেঁসিয়া যুগের আওলিয়াগণ সারিবদ্ধভাবে বসিয়া আছেন। মাঝ বরাবর একটি সুসজ্জিত আসনে হজরতে আকদাস বসিয়া আছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং আশে পাশে বসা আউলিয়া কেরামদের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই সোজা হজরতে আকদাসের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম। এই পর্যন্ত স্বপ্ন দেখার পর পরই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অতঃপর আমি হজরতে আকদাসের নিকট লিখিত ভাবে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলাম। সুবহানাল্লাহ, নিজ বুজুর্গী গোপন রাখিয়া তিনি শুধু আমার সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিলেনঃ আপনার স্বপ্ন ভাল। ইহাতে গভীর এবং দৃঢ় সম্পর্কের কথা প্রমাণ হয়। কারণ এই যে, আপনি কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজ পীরের নিকট চলিয়া আসিয়াছেন। বস্তুতঃ হজরতে আকদাস নিজ বুযুর্গী ও মর্তবার প্রতি সামান্যতম ইংগিতও করিলেন না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি বর্তমান যুগের ওলি আল্লাহদের সরদার। তাই সকল ওলী আল্লাহ্‌গণ তাঁহার খেদমতে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করিবার জন্য তসরীফ আনিয়াছিলেন।

বিরাট অট্টালিকাঃ হজরতে আকদাসের দৃষ্টিতে দুনিয়ার চাকচিক্যের কোন মূল্যই ছিলনা। তিনি দুনিয়াবী বিষয়াদির আলোচনায় আগ্রহও প্রকাশ করিতেন না। একবার

শেখ মুহাম্মদ সাদেক হজরতে আকদাসের নিকট রাও জামশেদ সাহেবের জন্য বরাদ্দকৃত বিরাট বাড়িটি নির্মাণের পর বলিলেন যে, রাও জামশেদ সাহেব আলীশান একটি অট্টালিকা পাইয়াছেন। কিন্তু হজরতে আকদাস এই অস্থায়ী জগতের কোন কিছুকে আলীশান বলিয়া আখ্যায়িত করাকে অন্যায় মনে করিতেন। তাই তাহাকে বলিলেনঃ মসজিদের দিকে তাকান, আলীশান বাড়ীতো ইহাকে বলে। সেই ঘরটি কি ইহার সমান হইবে? ইহা শুনিয় শেখ সাহেব মাথা নীচু করিলেন এবং লজ্জিত হইলেন। অতঃপর এই কথা তিনি রাও সাহেবকে বলিলেন। রাও সাহেবের সাথে হজরতে আকদাসের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন ঐ বাড়ীর আলোচনায় হজরতে আকদাসের অসন্তুষ্টির কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই বাড়ীটি ছাড়িয়া দিলেন। অবশ্য বাড়ীটি সত্যিই সত্যই একটু আলীশানই ছিল। ইহার পর রাও সাহেব খানকা শরীফে উপস্থিত হইলে হজরতে আকদাস জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনি নাকি খুব ভাল বাড়ী পাইয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, পাইয়াছিলাম কিন্তু আমি তাহা ছাড়িয়া দিয়াছি। হজরত বলিলেনঃ কেন ছাড়িয়া দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, উহার আলোচনা আপনার নিকট খারাপ লাগিয়াছে, তাই।

হজরত মুচকি হাসিয়া বলিলেনঃ আমিতো শেখ সাহেবকে সাবধান করিয়াছিলাম। যাক যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে। অতঃপর তিনি রাও সাহেবের জন্য একটি ভাল বাড়ীর দোয়া করিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই রাও সাহেব একটি সুন্দর বাড়ী পাইয়া গেলেন। বর্তমানে তিনি মিয়ানওয়ালীর সেই বাড়ীতেই বসবাস করিতেছেন।

হজরতে আকদাসের হস্তক্ষেপের একটি ঘটনা

হজরতে আকদাসের একজন বিশ্বস্ত খাদেম সূফী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাভা প্রদেশের একজন ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। একবার হিন্দু ও শিখ পুলিশরা সাম্প্রদায়িক কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে পেট্রোল এর ব্যাপারে প্রতিরক্ষা আইনের অধীনে একটি মিথ্যা মামলা রুজু করিল। লুধিয়ানার একজন কঠোর শিখ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলা নির্দিষ্ট হইল। সূফী সাহেব নিজের এই বিপদের কথা দুনিয়াবী ঝামেলা মনে করিয়া হজরতে আকদাসের নিকট কিছুই জানান নাই। ঘটনাক্রমে ঐসময় একদিন হজরতে আকদাস খানকা শরীফ হইতে নিজ দেশ সেলিমপুর বেড়াইতে আসেন। উল্লেখিত সূফী সাহেব এবং মাষ্টার মুহাম্মদ সাদী খান সাহেব হজরতে আকদাসের তসরীফ আনার কথা শুনিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। এ সময় সুফী সাহেবের মামলার তারিখ নিকটবর্তী ছিল। তিনি আদবের সহিত মাষ্টার সাহেবের মাধ্যম হজরতে আকদাসের নিকট বিদায় চাহিলেন। হজরতে আকদাস বলিলেনঃ অসম্ভব, আমার যাওয়ার পূর্বে আপনি কিছুতেই যাইতে পারেন না। এই কথায় মাষ্টার সাহেব সূফী সাহেবের মামলার উল্লেখ করিলেন।। মামলার বিস্তারিত

বিবরণ শুনিয়া হজরতে আকদাস সূফী সাহেবকে বলিলেনঃ আপনিত আশ্চর্য মানুষ! সূফী সাহেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আপনার সহিত আমার সম্পর্ক শুধু আল্লাহর জন্য। এই কারণেই দুনিয়াবী ঝামেলার কথা আলোচনা করা ভাল মনে করি নাই। একথা শুনিয়া হজরতে আকদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। অতঃপর সূফী সাহেবকে বলিলেনঃ যান কোন চিন্তা করিবেন না। ইনশাআল্লাহ কোন অসুবিধা হইবে না। নির্দিষ্ট তারিখ মত সূফী সাহেব বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মামলা উঠিবার পূর্বে এইরূপ যতগুলি মামলা উঠিয়াছে, বিচারক সাহেব তাহার প্রত্যকটিতেই কোন না কোন শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু যখন সূফী সাহেবের মামলা শুরু হইল তখন বিচারক সাহেব মামলার কাগজ পত্র এক নজর দেখিয়াই সূফী সাহেবকে নির্দোষ ঘোষণা করিলেন। সরকারী উকিলগণ, এই মামলার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য অনেক আবেদন জানাইলেন, কিন্তু বিচারক সাহেব বলিলেন, আমি সূফী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবকে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। অতএব এই হুকুমই বলবৎ থাকিবে। মোট কথা, হজরতে আকদাসের দোয়ার বরকতে সুফি সাহেব সফলকাম হইয়া লুধিয়ানা ফিরিয়া আসিলেন এবং আটককৃত সকল মালামালও ফেরত পাইলেন।

মন রক্ষা ও আত্মতৃপ্তির একটি মহান দৃষ্টান্ত

সূফী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব পার্থিব বিবেচনায় খুব বড় ব্যাবসায়ী ছিলেন না বটে, কিন্তু পীরের ভালবাসা ও সম্পর্কের মাধুর্যে পূর্ণ ছিলেন। তাঁহার ঘরে স্বর্ণের একজোড়া কানবালা ছিল। তিনি ভাবিলেন যে, হজরতে আকদাসের মেয়ের বিবাহের সময় হয়তবা আমার নিকট কিছু স্বর্ণ না–ও থাকিতে পারে। সুতরাং এই কানবালা দুইটি এখনই দিয়া আসা উচিৎ। এই ভাবিয়া তিনি খানকা শরীফে উপস্থিত হইয়া এই হাদিয়া পেশ করিলেন। হজরতে আকদাস তাহার মন রক্ষার্থে তাহা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঘরে গিয়া বেগম সাহেবকে বলিলেনঃ এই কানবালা আমার এক গরীব সাথী মুহাম্মদ সাদেকের আমানত। ইহা যত্ন করিয়া রাখিও। সময় মত তাঁহাকে ফেরত দিতে হইবে। হজরতে আকদাসের ইন্তেকালের পর নির্দেশ অনুযায়ী হজরতে মাই সাহেবা সূফী সাহেবের সেই রক্ষিত জিনিসটি তাঁহাকে ফেরত দিলেন। সূফী সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, হজরতে আকদাস তখন শুধু তাঁহার মন রক্ষার্থে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা তিনি দুনিয়ার সম্পদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও পছন্দ করিতেন না।

সন্তান জন্ম লাভের পর তাঁহার প্রতিক্রিয়া

আলা হজরত সায়াদ সাহেব কুদ্দুসু সিররুহুর ইন্তেকালের পর হজরতে আকদাস খানকা শরীফে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পরিবার পরিজন , মাতা পিতা এবং

অন্যান্য প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব সকলেই লুধিয়ানার সেলিমপুরে বসবাস করিতেন। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পরেও যতদিন তাঁহার মাতাপিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিও তাঁহার পত্নীকে খানকা শরীফে আনেন নাই। এক–দেড় বৎসর পর পর মাত্র কয়েকদিনের জন্য দেশে যাইতেন।

সূফী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ তায়ালা হজরতে আকদাসকে সন্তান দান করেন। তিনি টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছেলে হওয়ার সংবাদ পান। এই শুভ সংবাদ পাইয়া হজরতে আকদাসের মধ্যে ভয় ও খুশির এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল যে, তিনি ক্রন্দন করিলেন। তাঁহার কান্নায় উপস্থিত সকলে চিন্তিত ও বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেনঃ দেশ হইতে ছেলে হওয়ার খবর আসিয়াছে।। নিশ্চই সন্তান আল্লাহ্ তায়ালার দেওয়া একটি নেয়ামত। কিন্তু কখনও কখনও ইহা একটি কঠিন পরীক্ষার কারণও হইয়া থাকে। এমনকি উহা মাতাপিতার পরকালও বিনষ্ট করিয়া দেয়। আপনারা সকলেই দোয়া করিবেন, আল্লাহ্ তায়ালা যেন নবজাত সন্তানকে নেককার করেন। সে যেন কোন পরীক্ষা ও বিপদের কারণ না হয়।

হজরত মাই সাহেবা হজরতে আকদাসের পুত্র হওয়ার সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। তাঁহাকে আসা যাওযার ভাড়া দিয়া বলিলেনঃ আপনার দেশে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। হজরতে আকদাসের বাড়ী যাওয়ার কথা শুনিয়া মুলতানের হজরত মিঞা জান মুহাম্মদ সাহেব মরহুম সহ কিছু সংখ্যক মুরীদ হজরতে আকদাসের সহিত একত্রে সফর করার জন্য লাহোরে আসিয়া সাক্ষাত করিলেন। অতঃপর সকল সাথী সহ তিনি সেলিমপুর উপস্থিত হইলেন। তিনি ছেলের নাম মুহাম্মদ আবেদ রাখিলেন এবং আকীকা আদায় করিলেন। হজরতে আকদাস নিজ হাতে গোস্ত রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইলেন। সুবহানাল্লাহ্, এভাবে তিনি দাউদ (আঃ) এর সহিফার নির্দেশ "ইজা রআইতালি তালিবান ফাকুন লাহু খাদেমান" – অর্থাৎ হে দাউদ, যখন তুমি আমার কোন ভক্তকে পাও তখন তুমি তাহার সেবা কর" এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইন্তেকালের পর পীরের সন্তানদের প্রতি দৃষ্টি

সাহেবজাদা মুহাম্মদ আরীফ সাল্লামাহুল্লাহু তা'য়ালা বর্ণনা করেনঃ হজরতে আকদাসের ইন্তেকালের পর একদিন নিঃসঙ্গতা অনুভবের কারণে আমার মন ভীষণ অস্থির ছিল। এই অবস্থা হইতে স্বস্তি পাওয়ার ইচ্ছায় হজরতে আকদাস নায়েবে কাইউমে জমান মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেবের কবর জিয়ারতের জন্য উপস্থিত হইলাম। ফাতেহা পাঠ করার পর তাহার প্রতি ধ্যান করিয়া কবরের নিকট বসিলাম।

ইহার মধ্যে আমার তন্দ্রা আসিল এবং দেখিলাম যে, হজরতে আকদাস এশার নামাজ মসজিদে আদায় করিয়া তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী সুন্নত ও বেতের পড়ার জন্য তাঁহার কামরায় যাইতেছেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে মসজিদের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম যে, মসজিদের সামনের মাঠে অনেক পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন পুলিশ মসজিদে প্রবেশ করিয়া হজরতে আকদাসের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আরীফ কোথায়? তিনি বলিলেন, কেন, তোমাদের তাহার নিকট কি প্রয়োজন? পুলিশ উত্তর দিল, আমরা তাহাকে শেষ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। তিনি ইহা শুনিয়া আমাকে মসজিদে গিয়া বাকি নামাজ আদায় করার ইংগিত দিলেন এবং মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান সাহেবকে বলিলেন, এই পুলিশটিকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দাও। তদনুযায়ী মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান সাহেব পুলিশটিকে টানিয়া মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আমি হজরতে আকদাসের নির্দেশ অনুযায়ী বাকী নামাজ আদায় করার পর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, সকল পুলিশ চলিয়া গিয়াছে এবং হজরতে আকদাস নিজ কক্ষের সামনে বন্দুক নিয়া পায়চারী করিতেছেন। আমি নিকটে আসিয়া বলিলাম, হজরত, আমিও কি আমার বন্দুক নিয়া আসিব? তিনি বলিলেন, না তুমি ঘরে গিয়া বিশ্রাম নাও, আমিই পাহারার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আমার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। যখন আমার চোখ খুলিল তখন আমার অন্তর শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরপুর ছিল। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া যে, ইহার পর আর কখনও কোন প্রকার ভয় –ভীতি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সুবাহানাল্লাহ্, হজরতে আকদাসের স্নেহ ও সহানুভূতি তাঁহার ইন্তেকালের পরেও নিজ পীরের পরিজনদের প্রতি কিরূপ বহাল ছিল। নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু।

বাইয়াতের উদ্দেশ্য

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমার (লেখক) বোনের বিবাহ উপলক্ষে হজরতে আকদাস লাহোর আসিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে আমার ভাই মাকবুল ইলাহী এম, এ, আলীগড় আসিয়াছিলেন। হজরতে আকদাসের সহিত সাক্ষাতের পর একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ বাইয়াতের উদ্দেশ্য ও অর্থ কি এবং ইহার দ্বারা কি লাভ হয়? আমি অনেক বুযুর্গের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছি কিন্তু তাহাদের জওয়াবের দ্বারা আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমি এই ধারণা করিলাম যে, হয়ত আমার উত্তরও মনঃপুত হইবেনা এবং বিতর্কের সৃষ্টি হইবে। তাই তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলাম, হজরতে আকদাস এখানে উপস্থিত আছেন। আপনি এই কথা স্বয়ং তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি বলিলেন, হজরতে আকদাসের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে এইজন্য ভয় পাইতেছি যে, হয়তবা আমার কোন কথায় তিনি মনে কষ্ট পাইতে পারেন। আমি বলিলাম,

হজরতে আকদাস অত্যন্ত স্নেহশীল। উনি কোন কথায় কষ্ট নিবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে কথা বলিতে পারেন।

একথায় তিনি হজরতে আকদাসের নিকট বাইয়াতের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরতে আকদাস বলিলেনঃ আপনি আপনার ভাইয়ের নিকট কেন জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি জানাইলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে আপনার নিকট আসার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হজরতে আকদাস বলিলেনঃ আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, শরীয়াতের জ্ঞান এবং ধর্মীয় শিক্ষা থাকা সত্বেও মানুষের জন্য চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং সৎ কর্মসমূহের প্রতি অবিচল থাকা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এমন অনেক মুসলমান আছেন যাহারা নামাজ রোজা আদায় করেন কিন্তু মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা এবং পরনিন্দার মত অপরাধ হইতেও বিরত থাকেন না। বাইয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের চারিত্রিক অবক্ষয় দূর করিয়া তদস্থলে মহান চারিত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা। ইহার দ্বারাই সৎকর্ম করা সহজ হয় এবং অসৎ কর্মের প্রতি ঘৃণা জন্মায়।

হজরতে আকদাসের এই জবাব মকবুল ইলাহী সাহেবের জন্য এরূপ তৃপ্তিদায়ক হয় যে, তৎখনাৎ তিনি বাইয়াতের জন্য আবেদন জানান। তিনি তরীকায় প্রবেশ করিলেন। সুবহানাল্লাহ, হজরতে আকদাস ঐ বরকতময় কথার মাধ্যমে মকবুল ইলাহী সাহেবের শরীয়াত এবং তরীকতের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

হজরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী সাহেবের সহিত সম্পর্ক

একবার হজরতে আকদাস তাঁহার সাথীদের সহিত সারহিন্দ শরীফ হইতে দিল্লী যাইতেছিলেন। হজরত মাওলানা খান মুহাম্মাদ সাহেব তাঁহাদের সফর সঙ্গী ছিলেন। পথে খাজা মুহাম্মদ সাদেক কাশ্মিরীর দাওয়াতে তাঁহারা আম্বালায় একদিন অবস্থান করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ হজরত মাওলানা রায়পুরী সাহেবও আম্বালায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে হজরতে আকদাস মাওলানা রায়পুরীর সহিত মাওলানা খান মুহাম্মদ সাহেবের পরিচয় করাইয়া দেন। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলেনঃ দয়া করিয়া ইনাকে কিছু উপদেশ দিয়া দিন। ইহা শুনিয়া হজরত রায়পুরী সাহেব মাওলানা খান মুহাম্মদ সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি হিসাবে আপনাকে এই উপদেশ দিতেছি যে, ইচ্ছা হোক অথবা না–ই হোক, আপনি মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে ছাড়িবেন না।

একবার হজরত রায়পুরী সাহেব হজরতে আকদাসের দাওয়াতে খানকায় তসরিফ আনিয়াছিলেন। তিনি আসরের নামাজের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত হজরতে আলার মাজার জিয়ারত করিলেন এবং মাগরিবের নামাজের সময় হইয়া গিয়াছে বলিয়া জিয়ারত শেষ

করিয়া হজরতে আকদাসকে বলিলেন, মাওলানা সাহেব, নামাজের সময় হইয়া গিয়াছে, নতুবা উঠিতে মন চাহিতেছিল না।

মাগরিবের পর তসবিহখানায় মজলিশ বসিল। হজরতে আকদাস হজরত রায়পুরীকে গদীতে বসিতে বলিলেন। হজরত রায়পুরী অনেক অনুরোধের পর গদীর এক কোণায় বসিলেন। অপর কোণায় হজরতে আকদাস বসিলেন। কথাবার্তার সময় একবার হজরত রায়পুরী হজরতে আকদাসের নিকট নকশ্‌বন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে তিনি বিলায়েতে সালাসা, কামালাতে সালাসা এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিষয়াদির উপর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে হাকীম মুহাম্মদ মাজহার সাহেবের এরূপ জয্‌বাহ ও কাইফিয়াত দেখা দিল যে, তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে উচ্চস্বরে আল্লাহ্‌ আল্লাহ বলিয়া চিৎকার শুরু করিয়া দিলেন। হজরতে আকদাস একজন খাদেমকে বলিলেনঃ ইনাকে বাহিরে নিয়া যাও। এই কথায় হজরত রায়পুরী সাহেব বলিলেন, মাওলানা সাহেব, ইহা কিছুই না। এইরকম হইয়াই থাকে। অতঃপর হজরত রায়পুরী তাঁহার খাদেমদিগকে বলিলেন, দেখ! প্রশিক্ষণ ইহাকেই বলে যে, পীরের প্রভাব সকল মুরীদের উপর বিস্তার করিয়া আছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত।

হজরত রায়পুরীর সহিত হজরতে আকদাসের আন্তরিক সম্পর্ক এরূপ ছিল যে, যদি হজরত রায়পুরী খানকার নিকটস্থ কোন স্থানে অবস্থান করিতেন তাহা হইলে হজরতে আকদাস তাঁহার সাক্ষাতের জন্য অবশ্যই সেখানে যাইতেন। এরূপ এক সাক্ষাতের সময় হজরত রায়পুরী নিজ খাদেমদিগকে কক্ষের বাহিরে যাওয়ার জন্য বলিলেন। অতঃপর দুই হজরতের মধ্যে আনেকক্ষণ পর্যন্ত মারেফাতের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইল। আলোচনাকালে রায়পুরী সাহেবের একটি প্রশ্ন এইরূপ ছিল যে, হজরত! কামাল কিসে কাহ্‌তে হেঁ? (অর্থাৎ কামালিয়াত কাহাকে বলে?) আমি এইপথে এত দিন অতিবাহিত করিলাম অথচ কোথায়ও কামালিয়াতের দেখা পাইলাম না। হজরতে আকদাস বলিলেনঃ হজরত, ইহাই কামালিয়াত।

ইমামে রব্বানী (রঃ) মাজার শরীফের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা

হজরত সাইয়েদ গুল হাসান শাহ সাহেব গুজরাটি হজরত আ'লার সহিত এবং অতঃপর হজরতে আকদাসের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি ইরাণের একটি তৈল কোম্পানীতে চাকুরী করিতেন। অনেক দিন চাকুরী করার পর দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দেশে উপার্জনের কোন সুযোগ সুবিধা করিতে না পারিয়া পুনরায় সেই চাকুরী গ্রহণ করার জন্য হজরতে আকদাসের নিকট বারবার দোয়ার দরখাস্ত করিতেছিলেন।

সেসময় হজরতে আকদাস সারহিন্দ শরীফে মুজাদ্দেদে আলফে সানীর মাজার শরীফে যাওয়া স্থির করিয়া শাহ সাহেবকে সেইখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য চিঠি লেখেন। শাহ সাহেব নিজ গ্রাম হইতে সূফী আব্দুল জলীল সাহেবের (তিনি হজরতে আ'লার মুরীদ এবং খুব আল্লাহওয়ালা ছিলেন) সহিত হজরতের খেদমতে সারহিন্দ শরীফ গমন করেন।

একদিন হজরতে আকদাস মুরীদদের সহিত ইমামে রব্বানীর মাজার মুবারকে মুরাকাবা করিলেন। মুরাকাবার মধ্যে সূফী আব্দুল জলীল সাহেব দেখিলেন যে, হজরত ইমামে রব্বানী একটি চিঠি হজরতে আকদাসকে দিলেন। চিঠিতে একথা লেখা ছিল যে, যদি সাইয়েদ গুল হাসান শাহ চাকুরীর জন্য পুনরায় ইরাণ যান তাহা হইলে তিনি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এমন কি, তাঁহার জীবনও বিপন্ন হইতে পারে। মুরাকাবা শেষ করিয়া হজরতে আকদাস তাঁহার কক্ষে চলিয়া আসিলেন এবং সাথীদিগকে বলিলেন ঃ আপনাদের মধ্যে কেহ কিছু দেখিয়া থাকিলে তাহা বর্ণনা করুন। এই আদেশ অনুযায়ী সূফী আব্দুল জলিল সাহেব উপরে উল্লেখিত ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। হজরতে আকদাস বলিলেনঃ আপনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা শাহ সাহেবকেও জানাইয়া দিন। উল্লেখিত শাহ সাহেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, হুজুর! আমার আর চাকুরীর দরকার নাই। আপনি শুধু এই দোয়া করুন যেন ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করিতে পারি।

হজরত দাতা গাঞ্জ বখশ (রঃ) এর সহিত আত্মিক সম্পর্ক ঃ

একবার হজরতে আকদাস লাহোর গমন করেন। সেখানে সূফী মুহাম্মাদ আসলাম সাহেব যিনি হজরতে আকদাসের এক জন বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন, তাঁহার সাক্ষাতের জন্য আসেন। হজরতে আকদাসের সেখানে অবস্থানকালে সূফী সাহেব হজরত সাইয়েদ মাখদুম আলী দাতা গাঞ্জ বখশ (রঃ) এর মাজারে যান। মুরাকাবার অবস্থায় তিনি হজরতে দাতা গাঞ্জ বখশ সাহেবের দর্শন লাভ করেন। হজরত দাতা গাঞ্জ বখশ সাহেব তাঁহার প্রতি আন্তরিক সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনাদের পীর সাহেব মাঝে মাঝে লাহোর আসেন। তাঁহাকে বলিবেন, তিনি যেন আমার সহিত দেখা করিয়া যান।

সেখান হইতে ফিরিয়া সূফী সাহেব হজরতে আকদাসের নিকট সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন কিন্তু তাঁহার বিশেষ খবরটি বলিতে ভুলিয়া যান। পরদিন হজরতে আকদাস সূফী সাহেবকে বলিলেনঃ আপনি হজরত দাতা সাহেবের কোন একটি বিশেষ খবর বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সূফী সাহেব বলিলেন, দুঃখের বিষয় যে, আমার তাহা একদম মনেই ছিলনা। হজরত দাতা সাহেব বলিয়াছিলেন যে, আপনার পীর সাহেবকে

বলিবেন তিনি যেন আমার সহিত একটু দেখা করেন। ইহা শুনিয়া হজরতে আকদাস বলিলেনঃ এখন আপনি তাঁহার মাজারে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থণা করুন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি।

খতমে নবুওয়াতের প্রসঙ্গে

হজরতে আকদাস ইসলাম এবং ইসলামের প্রবর্তক আলাইহিস সালাতু আচ্ছালাম এর সম্মান রক্ষা করা খতমে নবুওয়াতের বিশ্বাসের ভিত্তি মনে করিতেন। কাজেই তিনি এই বিশ্বাসকে ঈমানেও পূর্ব শর্ত মনে করিতেন এবং ইহা রক্ষা করার বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী এবং এই বিশ্বাসের মধ্যে মনগড়া ব্যাখ্যাকারী এবং নকল নবুওয়াতে বিশ্বাসীদেরকে তিনি ইসলামের প্রধান শত্রু মনে করিতেন।

১৯৫৩ ইং সালে খতমে নবুওয়াতের আন্দোলন শুরু হইলে তিনি তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সত্য আকীদা প্রচারকারীদেরকে বন্দী করা হইতেছিল এবং তাঁহাদের উপর গুলি বর্ষিত হইতেছিল। হজরতে আকদাসের মুরীদগণ এই আন্দোলনে শরীক হন। স্বয়ং হজরতে আকদাস এই আন্দোলন পরিচালনা করিতেন। তিনি বর্তমান গদীনিশীন হজরত খান মুহাম্মদ সাহেবকে প্রকাশ্যে সত্য ঘোষণার এবং মিয়ানওয়ালীতে জনসভা করার জন্য পাঠান। হজরত খান মুহাম্মদ সাহেব আদেশ পালনার্থে যাবতীয় ভয়ভীতি উপেক্ষা করিয়া মিয়ানওয়ালী গমন করেন। তিনি একাজে নিজকে বিপদের সম্মুখীন করেন। প্রথমে তাঁহাকে মিয়ানওয়ালীর কারাগারে এবং পরে সেখান হইতে লাহোরের ব্রষ্টাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য তখনকার প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন সাহেব লাহোরে সামরিক শাসন জারী করেন। মাওলানা গোলাম গাউস হাজারবী সম্পর্কে এই নির্দেশ জারী করা হয় যে, তাঁহাকে দেখা মাত্রই গুলি করা হইবে। মাওলানা হাজারবী সাহেব হজরতে আকদাসের মুরীদ ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার জীবন রক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত হইয়া পড়েন। এবং তাঁহাকে বিশেষ কৌশলে লাহোর হইতে খানকা শরীফে আনিয়া খুব সাবধানতার সহিত রাখা হয়।

লাহোরে এই আন্দোলন সম্পর্কে এক অনুসন্ধান কমিশন গঠন করা হয়। খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারিগণকে ইসলাম বর্হির্ভূত করা এবং খতমে নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হিসাবে প্রমাণ করার জন্য ওলামায়ে ইসলামের এক প্রতিনিধধি দল হাকীম আব্দুল মজীদ সাহেব সাইফীর বাড়ীতে আলোচনায় বসেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা হইল। কাদিয়ানীদের সম্পর্কে যাবতীয় পত্র পত্রিকা ও ফাতওয়া জমা করা হইল। ওলামায়ে কেরামগণ খতমে নবুওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার পক্ষে গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন। এমনকি, মাওলানা মওদুদী সাহেবের জামায়াতে ইসলামীর লোকজনও এই মজলিশ হইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া নেন।

হজরতে আকদাস দ্বিতীয়বার বাইতুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ করেন। দ্বিতীয় হজ্জের পরে ইহ জগত হইতে বিদায় গ্রহণের লক্ষণ অধিক দেখা দিয়াছিল। হাফেজ সৈয়দ আব্দুল হামীদ সাহেব ভাওয়ালপুরী বর্ণনা করেন যে, দ্বিতীয় হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হজরতে আকদাস বলিলেনঃ আলা হজরত যে সকল কথা বলিযাছিলেন তাহা সকলই এই হজ্জের সময় ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটি সমস্যা এখন বাকী আছে। ইনশা আল্লাহ তাহাও অতি শীঘ্র সমাধা হইয়া যাইবে। এই ইংগিত এরূপ ছিল যে, মাকামাতে আলীয়া মুজাদ্দেদিয়ার সমস্ত ভেদ ও পরিচয় এবং তরীকার সকল সিলসিলার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু আত্মা ও দেহের সম্পর্কের ব্যাপারটি বাকী আছে, যাহাতে আত্মা দেহবন্দী হইতে মুক্ত হইয়া মহাশুণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মহান বন্ধুর দিকে এইরূপে উর্ধ্বগামী হয় যে, ইহার পর আর অবতরণের প্রশ্নই উঠেনা। সার কথা এই যে, হজরতে আকদাসের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছিল যে, এখন তাঁহার অন্তর এই বস্তু জগত হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বরকতময় স্বভাবের মধ্যে দৈহিক উত্তাপ ছাড়াও আল্লাহর ভালবাসার আগ্রহও এক প্রকার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিল। তিনি শ্বাস কষ্ট পাইতেছিলেন এবং এই অবস্থায় হৃদরোগও দেখা দেওয়ায় দূর্বলতা অনেক বাড়িয়া গেল। স্থানীয় চিকিৎসায় যখন কোন ফল হইল না, তখন হাকীম আব্দুল মজিদ সাইফী সাহেব তাঁহাকে স্থায়ী চিকিৎসার জন্য লাহোরে আসার অনুরোধ জানাইলেন। শেষ পর্যন্ত ১৩৭৫ হিজরীর রজব মাসে লেখকের বোনের বিবাহ ও চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি লাহোরে পৌছিলেন। হাকীম সাইফী সাহেব তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা করিলেন এবং ২০/২২ দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সারহিন্দ শরীরে শেষ সফর ঃ

হজরতে আকদাস ১৩৭৫ হিজরীর দ্বিতীয় সপ্তাহে সারহিন্দ শরীফ, মালিয়ার কোটলা এবং দিল্লীর উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান রওয়ানা হইলেন। ভিসায় মালিয়ার কোটলার নাম আগে থাকার জন্য প্রথমেই তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইল। ইহার পর তিনি সারহিন্দ শরীফ যান এবং প্রায় এক সপ্তাহ সেখানেই অবস্থান করেন। হাজী জান

মুহাম্মদ সাহেব, মাওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব এবং সূফী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তি তাঁহার সফরসঙ্গী ছিলেন। আমিও (লেখক) সময় সুযোগ করিয়া সারহিন্দ শরীফ উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাদের সহিত দিল্লীতে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলাম। মাওলানা আহ্‌মদ রেজা সাহেব বিজনুরীকে (যিনি হজরতে আকদাসের মুরীদ ছিলেন) আগেই আমাদের প্রোগ্রাম জানান সত্ত্বেও আমাদের চিঠি পাইতে বিলম্ব হওয়ার জন্য তিনি তারিখমত আসিতে পারেন নাই। তদুপরি হাকীম সাহেবের অসুস্থতা দেখা দিল। হজরতে আকদাস এজন্য দিল্লী সফর স্থগিত ঘোষণা করিলেন। লাহোরে ফিরিয়া আসার সিদ্ধান্ত হইল। ইতিমধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আহমেদ রেজা সাহেবও দিল্লী হইতে আসিলেন। কিন্তু হজরত তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিলেন না এবং পরের দিনই লাহোর রওয়ানা হইলেন। লাহোরে দুই একদিন অবস্থানের পর তিনি খানকা সিরাজীয়ায় চলিয়া গেলেন। রমজান মাস নিকটবর্তী ছিল। শারীরিক অসুস্থতা এবং গরমের প্রখরতার কারণে তিনি রমজান মাস মানসাহারায় অবস্থান করিতেন কেননা, এই স্থানটি তুলনামূলকভাবে একটু ঠান্ডা ছিল। কিন্তু এবৎসর রোজার সময় মধ্যম আবহাওয়া থাকাতে তিনি খানকা শরীফেই অবস্থান করিলেন এবং অভ্যাস অনুযায়ী পুরামাসই সেহরী পর্যন্ত তারাবীহ নামাজ এবং দোয়া দরুদের মধ্যমে অতিবাহিত করিলেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ, তাঁহার স্বাস্থ্যও ভালই ছিল।

শাওয়ালের মাঝামাঝি গরম বাড়িয়া যাওয়ায় তিনি মান সাহারা যাওয়ার ইচ্ছা করিতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গেল এবং আভ্যন্তরীণ কারণে খুবই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুরীদদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হাকীম মাওলানা চিনপীর সাহেব এবং হাকীম মুহাম্মদ জুবায়ের সাহেব তাঁহার চিকিৎসার জন্য খানকা শরীফে আসিলেন। চিকিৎসা চলিতেছিল কিন্তু অসুস্থতা বাড়িয়াই চলিল। কাজী সামসুদ্দিন সাহেব এবং সূফী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবকে মান সাহারা পাঠান হইল যাহাতে আগেই সবকিছু ব্যবস্থা হইয়া যায় কিন্তু এর মধ্যে রোগ আরও কঠিন রূপ ধারণ করে। তিনি কিছুই খাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। উপস্থিত চিকিৎসকগণ সর্ব প্রকার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। এ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ছেলে মুহাম্মদ আরীফ ২৬ শাউয়াল সকালে লাহোরে পৌছিলেন এবং ঐ সময়ই হাকীম সাইফী সাহেবকে সঙ্গে নিয়া সন্ধ্যার পরই খানকা শরীফে উপস্থিত হইলেন। হজরতে আকদাস হাকীম সাহেবকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনি কি প্লেনে আসিয়াছেন?

চিকিৎসকবৃন্দ এবং উপস্থিত লোকজন সকলের মধ্যেই নিরাশা ও শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল কিন্তু হজরতে আকদাস সকলকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। হাকীম

মুহাম্মদ জুবাইর সাহেব কান্নার সুরে বলিলেন, হুজুর আপনি আমার কঠিন রোগের সময় যেরূপ রোগ মুক্তির জন্য খাস দোয়া করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, এখন আপনার নিজ রোগমুক্তির জন্যও না হয় একটু সেইরূপ দোয়া করুন। কিন্তু ইহার উত্তরে তিনি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই বলেন নাই। সূফী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব অত্যন্ত কাতরভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁহার জন্য বারবার দোয়া করিতে থাকিলেন। কিন্তু হজরতে আকদাস বলিলেনঃ সূফী সাহেব, রাখুন। ঘটনা শেষ হইতে দিন। অতঃপর তিনি দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলা হইল, বুধবার শেষ হইয়া বৃহস্পতিবারের রাত্র আসিয়াছে। শুনিয়া তিনি একটু সান্ত্বনার নিঃশ্বাস ফেলিলেন। হাকীম সাইফী সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি অবস্থা? হাকীম সাহেব বলিলেন আল্লাহ্ পাক রহম করুন, নাড়ী খুবই দুর্বল। ইহা শুনিয়া হজরত "মাশা আল্লাহ" বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। হজরতের স্ত্রী তাঁহার ভাইয়ের নিকট গিয়াছিলেন। ঘরে ছিলেন তাঁহার কন্যা। পিতার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। হজরত কন্যাকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন।

দুঃখের বিষয়, শেষ সময় আসিয়া পড়িয়াছিল। তাই তিনি কথাবার্তা বন্ধ করিয়া নিজ মহান প্রভু আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ধ্যান করিলেন। মোট কথা, এই সর্বগুণে গুণান্বিত নেকীর ভান্ডার আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া ২৭ শে শাওয়াল দিবাগত রাত্র সাড়ে ১২ টার সময় মহান আল্লাহর সমীপে চলিয়া গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। পরের দিন ২৮ শাউয়াল দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। মুফতী আতা মুহাম্মদ সাহেব এবং অন্যান্য ব্যক্তি গোসল করান এবং হজরত মাওলানা খান মুহাম্মদ সাহেব বিরাট জামাতের সহিত নামাজে জানাজা পড়ান। তাঁহাকে নিজ পীরের পশ্চিম পার্শ্বে দাফন করা হয়।

তিনি সর্বমোট ১৫ বৎসর ৮ মাস ১৫ দিন পীরের গদী অলংকৃত করিয়াছেন।

উত্তরসূরীবৃন্দ

হজরতে আকদাস তাঁহার সন্তানদের মধ্যে ছেলে মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবেদ সাহেব ও মেয়ে এবং তাঁহাদের সম্মানিত মাতা, দুই ছোট ভাই বদরউদ্দিন মিঞা ও মুহাম্মদ ইব্রাহীম ছাড়াও অসংখ্য মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ রাখিয়া গিয়াছেন। দেশ বিক্রির পর তাঁহার ভ্রাতাগণ ও আপনজন সেলিমপুর হইতে সিরাজীয়া বস্তির খানিওয়াল নামক স্থানে চলিয়া যান। তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার আত্মীয় স্বজন এই এলাকাতেই

বসবাস করিতে থাকেন। বর্তমানে তাঁহার ছেলে ও মেয়ে সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে শান্তিতেই বসবাস করিতেছেন। "অব্বাতা হুমাল্লাহু তা'য়ালা নাবাতান হাসানান।"

হজরতে আকদাস (রঃ) এর খলীফাগণ

হজরতে আকদাস (রঃ) এর সম্মানিত খলিফাগণের নাম নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

(১) হজরত মাওলানা আবুল খলিল খান মুহাম্মদ সাহেব মদ্দেজিল্লুহুল আলী যিনি হজরতে আকদাসের ওফাতের পর ১৩৭৬ হিজরীতে তঁহার নির্বাচিত স্থলাভিষিক্ত হইয়া আদেশের আসন অলংকৃত করেন। উহার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের শেষাংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) হজরত হাজী মিঞা জান মুহাম্মদ সাহেব (রঃ)। তিনি নকশবন্দী মুজাদ্দেদীয়া তরীকায় আ'লা হজরতের খলিফা ছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হজরতে আ'লার খলিফাদের বর্ণনার মধ্যে প্রদান করা হইয়াছে। তিনি দ্বিতীয়বার হজরতে আকদাসের খেদমতে থাকিয়া তরীকার পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছেন এবং তরীকায়ে নকশ বন্দীয়ার সঙ্গে সঙ্গে চার তরীকার মধ্যে হজরতে আকদাসের অনুমতির দ্বারা ধন্য হইয়াছেন।

(৩) হজরত মাওলানা সৈয়দ পীর আবদুল লতীফ শাহ সাহেব; গ্রাম আহমদ পুরসিয়াল; জিলা ঝং। হজরতে আকদাস গদীনিশীন অবস্থায় সর্বপ্রথম তাঁহাকেই খেলাফত দান করিয়াছিলেন। তিনি হজরত সৈয়দ মাখদুম জাহাগাশু (রঃ) এর বংশের লোক ছিলেন।হজরত পীর আব্দুল্লাহ শাহ সাহেব তাঁহার চাচা ছিলেন। তিনিও হজরতে আলার সম্মানিত খলিফা ও অত্যন্ত কামেল বুর্যগ ছিলেন। তিনি আরবী ফার্সীর প্রাথমিক শিক্ষা পাঞ্জাবের বিভিন্ন মাদ্রাসায় অর্জন করিয়াছেন এবং দাওরায়ে হাদীস জামেয়া ইসলামীয়া (ডাভেল) হজরত মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মেরী (রঃ) এবং মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এর নিকট পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তরিকায়ে নক্‌শবন্দীয়ার শিক্ষা আ'লা হজরতের নিকট শুরু করিয়া মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেবের নিকট পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি সর্ব প্রথম তরীকায়ে নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়ার খলিফা হন এবং পরে অন্য সকল তরীকার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলুহামদুলিল্লাহ, তিনি এই পবিত্র তরীকার প্রচারে সর্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন।

(৪) হজরত মাওলানা কাজী সামসুদ্দিন সাহেব মদ্দেজিল্লুহুল আলী, গ্রাম দরবেশ, জিলা হাজারা। তিনি ১৩৩৪ হিঃ মোতাবেক ১৯১৯ ইংরেজীতে হাজারার কোট নজীবুল্লার হজরত মাওলানা ফিরোজউদ্দিন কদ্দুসু সিররুহুর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মরহুম পিতা ইল্‌মে মা'কুলাত ও মনকুলাতের বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তাঁহার নানা ছিলেন মাওলানা ফয়েজ আলম হাজারবী (সম্পাদক নাবরাসুস সালেহীন)। তাঁহার

বিভিন্ন মূল্যবান মতবাদের মধ্যে ছোট ছোট গ্রামে জুমার নামাজ আদায় না হওয়ার ফতওয়া আছে। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মেরী (রঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ওয়া আউয়ালা মানিস তাদাল্লা বিহিল মাওলোভী ফয়েজ আলম হাজারবী।" অর্থাৎ ছোট ছোট গ্রামে জুমার নামাজ না হওয়ার প্রথম ফতওয়াদানকারী ব্যক্তি মাওলানা ফয়েজ আলম হাজারবী। উল্লেখযোগ্য, মাওলানা হাজারবী সাহেবই সর্বপ্রথম গাইর মুকাল্লিদ আলেম মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর ১০ টি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। মোটকথা, এইরূপ শিক্ষিত পরিবারে কাজী শামসুদ্দিন সাহেব শিক্ষার প্রথম স্তর অতিক্রম করেন। অতঃপর ১৩৫৫ হিজরী, মোতাবেক ১৯৩৬ ইংজেীতে হজরত আল্লামা মুফতি কেফায়েতউল্লাহ সাহেব এর নিকট মাদ্রাসায়ে আমিনিয়ায় (দিল্লী) দাওরায়ে হাদিস পাশ করেন। তিনি ছাত্র জীবনেই সর্বপ্রথম ১৩৫০ হিজরীতে হজরত পীর মেহের আলী সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু কাজী সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী ছাত্র জীবনের ব্যস্ততা তরীকা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। এই সময় ১৩৫৭ হিজরীতে তাঁহার পীর সাহেব ইন্তেকাল করেন এবং ১৩৬০ হিজরীতে হজরতে আকদাসের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিয়া নকশবন্দীয়া তরীকার পরিপূর্ণতা অর্জন এবং খলীফা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি ইল্‌মে ফিকাহ্ ও হাদীসের বিশেষ জ্ঞান অর্জন ছাড়াও বাতেল ফিকাহ্ বিশেষ করিয়া কাদিয়ানীদের সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত মেজাজ, উচ্চ সাহসিকতা এবং চরিত্রবান বুযর্গ ছিলেন। হজরতে আকদাসের ইন্তেকালের পর তিনি বর্তমান গদীনিশীন হজরত মাওলানা খান মুহাম্মদ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিয়া মারেফাতের উচ্চ মর্যাদা অর্জনে সচেষ্ট রহিয়াছেন। গ্রন্থরাজির যত্ন নেওয়া এবং আরও গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা তাঁহার বিশেষ অভ্যাসের অন্তর্গত ছিল। "আওসালা হুল্লাহ তা'য়ালা ইলা মা ইতামান্নাহু অ আবক্বা হু লি ইফাদাতিত তোয়ালেবীন।"

(৫) হজরত মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব (রঃ) বানীয়ে দারুল উলুম কবীরওয়ালা জিলা মুলতান। তিনি হজরতে আকদাসের মাধ্যমে চার তরীকারই খেলাফত লাভ করিয়াছেন। বাহ্যিক শিক্ষা প্রাথমিক ভাবে পাঞ্জাবে অতঃপর মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দে অর্জন করেন। তিনি বাহরুল উলুম হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তরীকার শিক্ষা আ'লা হজরতের নিকট আরম্ভ করেন এভং হজরতে আকদাসের নিকট তাহা পরিপূর্ণ করেন। তিনি অনেক দিন পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের উচ্চ স্তরের শিক্ষক ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি

কিছুদিন জামেয়া আব্বাসীয়া ভাওয়ালপুরে শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে দারুল উলুম কবীরওয়ালা প্রতিষ্ঠা করেন। হজরতে আকদাসের পরিচালনায় এই মাদ্রাসার উন্নতি সাধিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে এই মাদ্রাসা পাঞ্জাবের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইতেছে। একদিন ফজরের নামাজের পর মুরাকাবার মধ্যে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন তাগাম্মাদা হুল্লাহ বিফজলিহি।

(৬) হজরত মাওলানা হাফেজ আমান উল্লাহ সাহেব। তিনিও হজরতে আকদাসের বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা পাঞ্জাবে এবং পরে দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস শিক্ষালাভ করেন। তিনি অত্যন্ত আমলদার আলেম এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণে গুণান্বিত ছিলেন। হজরতে আকদাসের খলিফাদের মধ্যে তিনিই সর্বকণিষ্ঠ। বিচক্ষণ আলেম ছাড়াও তিনি ছিলেন হাফেজে কুরআন। হজরতে আকদাসের জীবদ্দশায়ই তিনি কুরআন শিক্ষা ও আরবী শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সাহেবজাদা মুহাম্মদ জাহেদ সাহেবও তাঁহার নিকটেই কুরআন শরিফ হিফজ করিয়াছেন। এছাড়া তিনি চিকিৎসা বিষয়েও জ্ঞান রাখিতেন। ইমামতি, ওয়াজ নসীহত এবং এই তরীকায়ে পাকের প্রচার ও প্রসারের কাজে তিনি সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন।

(৭) হজরত মাওলানা মুফতী আতা মুহাম্মদ সাহেব। গ্রাম চৌধয়ান, জিলা ডেরা ইস্মাইল খান। তিনিও হজরতে আকদাসের বিশিষ্ট মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষা অর্জন করেন। শিক্ষকতায় তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা রাখিতেন। তরীকার শিক্ষার পর হজরতে আকদাসের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মাদ্রসায়ে সায়াদীয়া খানকায়ে সিরাজিয়ায় শিক্ষকতা করেন। তরীকার অনুমতি লাভ করা সত্ত্বেও পীরের নিকটেই তিনি অবস্থান করেন। হজরতের ইন্তেকালের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সকলের সহিত তাঁহার দাফন ও কাফনে শরিক হইয়াছিলেন। দাফনের সময় যখন গদীনিশীন নির্বাচন করার প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন তিনি হজরত মাওলানা আবুল খলিল খান মুহাম্মদ সাহেবকে নির্বাচিত করার জন্য জোর দাবী জানান। তিনি নিজেও পুনরায় তাঁহার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং অন্যদেরকেও উহা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি তাঁহার খেদমতে থাকিয়া পূর্বের ন্যায় মাদ্রাসায়ে সায়াদীয়াতে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। বর্তমানে তিনি নিজ দেশ চৌধয়ানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নিজের ছেলে সহ দ্বীনের খেদমত করিতেছেন। নিজ অঞ্চলে তিনি মুফতী এবং ফেকাহ শাস্ত্রবিদ হিসাবে পরিচিত।

(৮) হজরত মাওলানা মুহাম্মদ মাকরানী (রঃ), তিনি নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকার শিক্ষা আ'লা হজরতের নিকট শুরু করেন এবং খলিফা নিযুক্ত হন। হজরতে আ'লার ইন্তেকালের পর হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কুদ্দুসু সিররুহুর নিকট তিনি তরীকার সর্বশেষ স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ইহার আলোচনা আ'লা হজরতের খলিফাদের তালিকায় বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

(৯) হজরত হাফেজ মুহাম্মদ সায়াদুল্লাহ্ সাহেব (খানওয়ানী)। তিনি প্রথমে আলা হজরতের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু তরীকার অনুমতি হজরতে আকদাসের নিকট হইতে লাভ করেন। দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে তিনি হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি মুলতানের প্রভাবশালী জমিদারদের মধ্যে গণ্য হইতেন। তাঁহার পরিবারের সকলেই মুজাদ্দেদীয়া তরীকার দ্বারা ধন্য হইয়াছেন। তিনি প্রবীন ও বুযুর্গ ব্যক্তি এবং নিজ অঞ্চলে তরীকায়ে পাকের প্রচারের কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

(১০) হজরত হাকীম আব্দুল মজিদ আহমদ সাহেব সাইফী (রঃ), ব্রেডেন রোড, লাহোর। তিনি হজরতে আকদাসের সর্বশেষ খলীফা। হজরতে আকদাস দ্বিতীয় হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খানকা শরীফে ৩রা রবিউল আউয়াল ১৩৭৫ হিজরীতে তাঁহাকে তরীকার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। হাকিমি চিকিৎসক হিসাবে তিনি ব্রেডেন রোডে অবস্থান করিতেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি জমিদার পরিবারের ছেলে ছিলেন। এফ, এ, পর্যন্ত শিক্ষা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্জন করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর (রঃ) এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে কিছুদিন তিনি জাতির সেবা করেন। অতঃপর ভাগ্যক্রমে হজরতে আ'লার খেদমতে আসার সুযোগ হয়। তরীকার অন্তর্ভুক্তির পর তিনি এই লাইনেই থাকিয়া গেলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর নিজ সম্পত্তি বিক্রি করিয়া তিনি লাহোরেই অবস্থান করেন এবং বছরের পর বছর আ'লা হজরতের খেদমতে থাকিয়া ফয়েজ হাসিল করেন।

হজরতে আ'লা তাঁহার প্রতি খুব খেয়াল রাখিতেন। তাঁহার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ছিল বলিয়া হজরতে আ'লা মাঝে মাঝে নিজেই তাঁহাকে ইংরেজী পত্রিকা আনাইয়া দিতেন। জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে তিনি তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ের শিক্ষক জনাব হাকিম আব্দুর রসূল সাহেবের নিকট হইতে চিকিৎসা বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করেন। ঔষধ তৈয়ারীর ব্যাপারে তিনি এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। আলা হজরতের ইন্তেকালের পর তিনি নায়েবে কাইউমে জামান হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেবের

সহিত সম্পর্ক ঠিক রাখিয়াছেন। হজরতে আকদাস লাহোরে আসিলে তাঁহার বাড়ীতেই অবস্থান করিতেন। তিনি আন্তরিকভাবে তাঁহার খেদমত করিতেন।

সাইফী সাহেবের বাড়ীতে সর্বদা মুরিদদের ভীড় লাগিয়াই থাকিত। আমি (লিখক) এবং সম্মানিত হাবিব আহমদ সাহেব এবং অন্যান্য তরীকার ভাইগণ খতমে খাজেগান এবং জিকিরের মজলিশে শরীক হইতাম। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহাকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করিয়াছিলেন। স্বয়ং হজরতে আকদাসও তাঁহার দৃঢ়তার প্রশংসা করিতেন। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার সহিত সম্পর্কিত কয়েকখানা কিতাব যথা, ইজাহুত্ তরীকা, মাবদাও মায়াদ, মায়ারিফে লাদ্নিয়া, এরশাদুত্ তোয়ালেবীন, কানজুল হোদায়াত ইত্যাদি কিতব ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এছাড়া মাকতুবাতে মায়াসুমিয়া, মাকতুবাতে সায়াদীয়া এবং ফাজায়েলে আজকারে মায়াসুমিয়া ইত্যাদি কিতাবও তিনি প্রকাশ করার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সেই সময়েই আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে ডাক আসিল এবং ২৪শে আগষ্ট ১৯৬০ ফজরের পর তসবীহ পড়া অবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট চলিয়া যান। আল্লাহুম্মাজ আল কবরাহু রাওজাতাম মিন রিয়াজিল জান্নাহ অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তাঁহার কবরকে জান্নাতের বাগিচায় পরিণত করুন।

— o —

হজরত মাওলানা আলহাজ খান মুহাম্মাদ সাহেব, গদীনিশীন খানকায়ে সিরাজিয়া এর জীবনী।

আল্‌হাজ্ব খান মুহাম্মদ সাহেব ১৯২০ ইংরেজী সনে মিয়ানওয়ালির ডিং নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ পরিচিতি এইরূপঃ হজরত মাওলানা খান মুহাম্মদ সাহেব, পিতা মালিক খাজা ওমর, পিতা মালিক মির্জা সাহেব, পিতা গোলাম মুহাম্মদ। বংশ তালুকর রাজপুত।

তাঁহার সম্মানিত পিতা হজরত খাজা ওমর (রঃ) আলা হজরত মাওলানা আবুস সায়াদ আহ্‌মদ খান সাহেব কুদ্দুসু সিররুহুর চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার এবং আল্লাহওয়ালা লোক। তিনি ইমামুল আউলিয়া হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন কুদ্দুসু সিররুহুর নিকট নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকায় বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাজা সাহেবের খেদমতে প্রায়ই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। হজরত খাজা গ্রীষ্মকালে যখন মুসাযায়ী শরীফ হইতে সুনসাকিসার সফরে যাইতেন, তখন পথিমধ্যে কয়েক দিন দরিয়া খানে অবস্থান করিতেন যাহাতে গ্রামে বসবাসকারী মুরীদ এবং ভক্তগণ কিছু বরকত হাসিল করিতে পারে। তাছাড়া হজরত খাজা সাহেবের জন্য তাহাদিগকে জিকিরের উপদেশ দেওয়া সহজ হইয়া যাইত। হজরত খাজা ওমর দরিয়া খান গ্রামে একধিকবার হজরত খাজা সিরাজ উদ্দিন সাহেবের সাক্ষাতের দ্বারা ধন্য হইয়াছেন। হজরত খাজা তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন, তাঁহাকে নিককা মুরীদ বলিয়া ডাকিতেন। হজরত খাজা ওমর সাহেব ছিলেন জমিদার। চাষাবাদের জন্য প্রচুর জমি ছিল। তাঁহার চার ছেলের নাম (১) মালিক শের মুহাম্মদ সাহেব, (২) হজরত মাওলানা খান মুহাম্মদ সাহেব এবং (৩) মালিক ফাতেহ মুহাম্মদ সাহেব (৪) মালিক মুহাম্মদ আফজাল।

প্রাথমিক শিক্ষা

স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁহাকে খাওলা প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হয় এবং এখানে তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর আ'লা হজরত মুহাম্মদ আবুস সায়াদ আহমদ খান তাঁহাকে আল্লাহর বান্দাদিগকে হেদায়েত এবং মায়ারেফাত

অন্বেষণকারীদের আত্মশুদ্ধির জন্য মনোনীত করেন। ফলে তাঁহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হয়। স্কুল ছাড়ার এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা আরম্ভ করার সময়কার একটি ঘটনা পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া পেশ করা হইলঃ

হুজরতে আ'লা কুদ্দুসু সিররুহু একবার তাঁহার পিতা হজরত খাজা ওমর এর নিকট বলিলেন, আপনার নিকট তিনটি এইরূপ বস্তু আছে যাহার একটিও আমার নিকট নাই। আপনি তাহা হইতে একটি আমাকে দান করুন। ঘটনাক্রমে তখন লংগরের একটি দুধের মহিষ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং হজরত খাজা ওমরের নিকট তিনটি দুধের মহিষ ছিল। বিষয়টি চিন্তা করিয়া হজরত খাজা ওমর ভাবিলেন, আলা হজরত হয়ত তাঁহার লংগরের মুরীদদের জন্য একটি মহিষ চাহিতেন। তাই তিনি বলিলেন, আপনি আমার তিনটি মহিষই নিয়া নেন। এই কথায় হজরতে আ'লা মুচকি হাসিয়া বলিলেনঃ খাজা ওমর, আমার কোন মহিষের প্রয়োজন নাই; আপনার একটি ছেলে আমাকে দিন। হজরত খাজা ওমর উত্তরে বলিলেন, আপনি যে ছেলেটিকে পছন্দ করেন, তাকেই নিয়া যান। অতএব আ'লা হজরতের নির্দেশ অনুযায়ী হজরত খান মুহাম্মদকে স্কুল হইতে আনিয়া তাঁহার খেদমতে খানকা শরীফে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তরীকায়ে নক্শবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়ার প্রচার ও প্রসারের জন্য আ'লা হজরতের দূরদর্শিতা তাঁকেই মনোনীত করিয়াছিল। "আল্লাহ ইজতাবী ইলাইহি মান ইশাউ ওয়াইয়াহদি ইলাই মান ইউনীব।

আরবী শিক্ষা

খানকা শরীফে আসার পর সর্বপ্রথম তিনি মাওলানা আব্দুল লতীফ শাহ সাহেবের নিকট কুরআন শরীফ শিক্ষা করিলেন। অতঃপর ফার্সী ও ইলমে সরফ, ইল্মে নহুর কিতাবাদি হজরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেবের নিকট পড়েন। ইহার পর দারুল উলুম আজীজিয়া ভেরাতে ভর্তি হইয়া তিনি আরবী মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে তিনি জামেয়া ইসলামীয়া, ডাভেল, জিলা সুরতে গমন করেন এবং সেখানে মিশকাত শরীফ, জালালাইন শরীফ, হেদায়াহ, মাক্বামাতে হারিড়ী এবং অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করেন। উল্লেখিত মাদ্রাসায় নিম্নোক্ত শিক্ষকদের নিকট হইতে তিনি সর্বপ্রকার ফয়েজ হাসিল করিয়াছেনঃ

(১) প্রধান শিক্ষক হজরত মাওলানা হাফেজ আব্দুর রহমান সাহেব আমরোহী, (২) হজরত মাওলানা বদরে আলম সাহেব (৩) হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বিন্নুরী, হজরত মাওলানা ইদ্রিস সাহেব (রঃ) (৫) হজরত মাওলানা আবদুল আজীজ সাহেব (কাম্বলপুরী)।

হাদীস এবং তফসীর শিক্ষা পরিপূর্ণ করার জন্য ডাভেল হইতে তিনি ১৩৬২ হিজরী সনে দারুল উলুম দেওবন্দ চলিয়া যান। ঐ সময় হজরত মাওলানা সাইয়েদ হোসেইন আহ্‌মদ মাদানী (রঃ) গৃহবন্দী ছিলেন। অতএব মাওলানা এজাজ আলী সাহেব (রঃ) এবং অন্যান্য শিক্ষকের নিকট তিনি দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন করেন। খানকায়ে সিরাজীয়াতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন একজন সুবিজ্ঞ আলেম ও গুণী ব্যক্তি হিসাবে। দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষালাভের পর তাঁর অন্তর আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির জন্য প্রস্তুত ছিল। আল্লাহর পরিচয় লাভের ঘাঁটি নিকটবর্তী মনে হইতেছিল কিন্তু আসলে পথ তখও ছিল অনেক দূর। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রঃ) এর মতে আভ্যন্তরীন জ্ঞান বাহ্যিক জ্ঞান ব্যতীত অসম্পূর্ণ এবং তারই অনুসরণে হজরতে আলার আভ্যন্তরীণ জ্ঞান এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আগ্রহ দেখা দিল। তিনি হজরতে সানী (রঃ) এর নিকট কানজুল হেদায়েত, মাকাতীরে হজরতে শাহ গোলাম আলী দেহলভী, মাকতুবাতে মাসমীয়া এবং হেদায়াতুত তোয়ালেবীন সবক ক্রমে ক্রমে পাঠ করিলেন। অতঃপর খানকা শরীফের আবহাওয়া ও পরিবেশ, যাহা সুন্নতে রসূলের অনুকরণে পরিপূর্ণ ছিল, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি সাধন করিল। অনুকূল আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ মারেফাতে ইলাহীর এই বাগানে সত্যান্বেষণকরিগণ সদাসর্বদা মনোরম সুগন্ধ দ্বারা ভরপুর হইতে থাকিবেন।

পাঠ্য জীবনের একটি মনোরম ঘটনা

হজরত কেবলা লংগরখানার ব্যস্ততা হইতে মোটেই অবসর পাইতেন না। তা' সত্ত্বেও হজরত সানী (রঃ) এর নির্দেশক্রমে মাদ্রাসায়ে সায়াদীয়ায় খানকা শরীফের অন্যান্য শিক্ষকদের সহিত তিনিও ছাত্রদিগকে গুলিস্তা, বোঁস্তা, মুনিয়াতুল মুসল্লি, কুদূরী উসূলু সশাশী এবং অন্যান্য কিতাব পড়াইতেন। একদিন হাফেজ জাফর আহ্‌মদ সাহেব (মুজাফফারগড়ের অধিবাসী) হজরত সানী (রঃ) এর নিকট বলিলেন, আমি কোন কোন কিতাব হজরত খান মুহাম্মদ সাহেবের নিকট পড়িতে চাই। হজরত সানী

(রঃ) জবাবে বলিলেনঃ তিনি সময় পাইবেন না। তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যা অর্জন করিবার একটিই মাত্র পথ আছে এবং তাহা এই যে, কিতাব নিয়া তাঁহার পিছনে লাগিয়া থাক। যখনই তিনি অবসর পান, সবক পড়িয়া নাও।

একদিন হজরত খান মুহাম্মদ অশ্বারোহী হইয়া কুন্দিয়া হইতে খানকা শরীফ আসিলেন। সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনি আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধিলেন এবং মাগরীবের নামাজ আদায় করিলেন। নামাজ শেষ করিয়া দেখিলেন যে, হাফেজ আহমদ জাফর একটি কিতাব নিয়া বসিয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কি প্রয়োজন? হাফেজ সাহেব উত্তর দিলেন, সবক পড়িতে চাই। তিনি বলিলেনঃ সবক পড়িবার এটা কেমন সময়? তবুও তিনি তাঁহাকে একটু পড়াইয়া দিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার যুগের পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহ খালেদ সাহেবও ছিলেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব।

হজরত কেবলার দাম্পত্য জীবন ঃ

বিবাহের উপযুক্ত হইলে হজরতে আ'লা নিজ কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন এবং আভ্যন্তরীণ ফয়েজ দান করার পর বাহ্যিক উপহার ও সম্মানের দ্বারা ধন্য করিলেন। "অ–আসবাগা আলাইকুম নিয়ামাহু জাহিরাতান অ–বাতেনা"। এই বিবাহে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহাকে তিনটি ছেলে (আজীজ আহমদ, খলীল আহমদ ও রশীদ আহমদ) এবং একটি মেয়ে দান করিয়াছেন। এই স্ত্রীর ইন্তেকালের পর তিনি আর বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন কিন্তু মুরীদদের পীড়াপীড়ির জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। এই স্ত্রী হইতে সাহেবজাদা সাঈদ আহমদ ও নজীর আহমদ সাহেব জন্ম লাভ করেন।

পীরের খেদমত

তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ হজরতে আ'লার খেদমতে ছিলেন। খানকা শরীফের তিনটি কক্ষ যথা মেহমান খানা, তসবীহ খানা এবং কতুবখানার নির্মাণ কাজে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন। হজরতে আ'লার সকল পরিবারিক কাজকর্ম দেখশুনার দায়িত্ব ছাড়াও ঘোড়া এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর দেখাশুনার ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। তিনি তাঁহার সারাটি জীবন মুরীদ এবং সাক্ষাৎকারীদের সেবায় নিবেদিত করিয়াছেন।

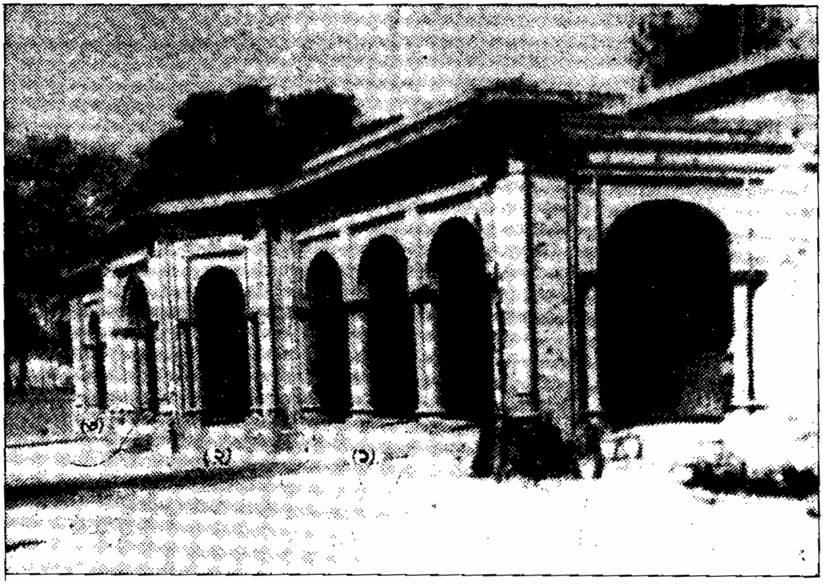

মেহমানখানা, তাস্‌বিহখানা এবং কিতাবখানার ইমারত

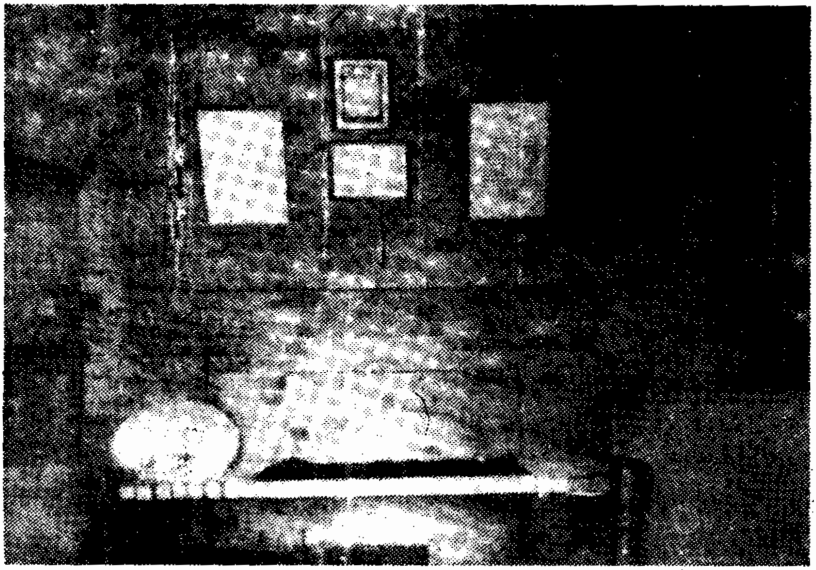

তাস্‌বিহখানার ভিতরের দৃশ্য

"তরীকত বজুয় খেদমতে খল কনিস্ত, ব তাসবীহ ও সাজ্জাদা ও দলক নিস্ত।"

হজরতে আ'লার ইন্তেকালের পর তিনি একাধারে ১৫টি বৎসর হজরতে সানী (রঃ) আলাইর এর খেদমতে একনিষ্ঠ ছিলেন। আল হামদুলিল্লাহ, তিনি মুজাদ্দেদীয়া তরীকার উভয় বুজর্গ এর নিকট হইতে তরীকার ফয়েজ হাসিল করিয়াছেন। একারণে তরীকার সকল পথ অতি সহজে তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। এইভাবেই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁহার সকল যোগ্যতা ও প্রতিভাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। ফলে তিনি ব্যাপকভাবে আমাদের সকলকে প্রশিক্ষণ দিতে পারিয়াছেন। এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সকল স্তর অতিক্রম করাইতে পরিয়াছেন।

হজরতে কেবলার বন্দী জীবন

১৯৫৩ ইংরেজী সালে খতমে নবুওয়াতের আন্দোলন জোরেসোরে আরম্ভ হইলে জাতিগতভাবে সকল মুসলমান স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। সর্বশেষ নবীর প্রতি আত্মোৎসর্গকারিগণ রক্তের সাগর অতিক্রম করিয়া জাতির ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করিতেছিলেন।

"না জবতক কাট মরুমাঁই খাজায়ে ইয়াস রাবকি হুরমত পর, খোদা শাহেদ হেয়, কামেল মেরা ঈমান হো নাহি সাক্তা।"

এই খতমে নবুওয়াতের আন্দোলনের কারণে ওলামাদেরকে গ্রেফতার করা শুরু হইল। হজরতে কেবলা খান মুহাম্মদ সাহেব হজরত সানী (রঃ) এর নির্দেশে মিয়ানওয়ালী গমন করিলেন এবং নিজেকে পুলিশের হাওয়ালা করিলেন। তিনি ১৯৫৩ ইংরেজী সনে ৫ই এপ্রিল শৃংখলা রক্ষা আইনের অধীনে গ্রেফতার হন। প্রথমে মিয়ানওয়ালী জেলে এবং সেখান হইতে তাঁহাকে ২৫ই এপ্রিল লাহোরের কেন্দ্রীয় জেলে পাঠান হয়। সেখান হইতে ২৮ এপ্রিল তাঁহাকে ব্রোষ্টাল জেলে স্থানন্তরিত করা হয়। সেখান হইতে পুনরায় তাঁহাকে কেন্দ্রীয় জেলে আনা হয়। তিনি যখন সেখানে বন্দীজীবনযাপন করিতেছিলেন তখন পাশের দালানেই নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বন্দী অবস্থায় ছিলেন ঃ

(১) আমীরে শরীয়াত হজরত সাইয়েদ আতা উল্লাহ শাহ সাহেব বোখারী (রঃ) (২) মাওলানা মুহাম্মদ জালেন্ধারী (৩) মাওলানা আবুল হাসানাত কাদেরী, (৪) মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব, (৫) মাওলানা আব্দুল হামেদ বদাইউনী সাহেব, (৬) সাহেবজাদা ফয়জুল হাসান সাহেব (৭) মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব নিয়াজী, (৮) জনাব

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী সাহেব, (৯) জনাব মাওলানা তকী আলী নকী সাহেব এবং আরো অনেকে।

সে সময়কার একটি ঘটনা স্বয়ং হজরত কেবলা বর্ণনা করিয়াছেনঃ বন্দী জীবন যাপনকালে একবার ঈদুল আজহা আসিয়া পড়িল। আমরা সকলে হজরত আতা উল্লাহ শাহ সাহেবের সহিত সাক্ষাত করার জন্য তাঁহার কক্ষে গেলাম। ঠিক সেই সময়ই মাওলানা মওদূদী সাহেবও তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। তিনি সকলের সহিতই সম্মানসূচক ব্যবহার করিলেন। এবং হাল অবস্থা জানিতে চাহিলেন। মওদূদী সাহেবের হাঁটুতে ফোঁড়া হইয়াছিল। শাহ সাহেব দেখিয়া বলিলেন, পানিতে ফিনাইল গুলিয়া লাগান, ইনশা আল্লাহ ভাল হইয়া যাইবেন। কিছুক্ষণ পর মাওলানা মওদূদী সাহেব তাঁহার সাথীদের সহ বিদায়ের অনুমতি চাহিলেন। শাহ সাহেব তাঁহাদের বিদায় জানাইবার জন্য উঠিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি মওদূদী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখন কোথায় যাইবেন? মওদূদী সাহেব বলিলেন, আমি এখন বমকেস এহাতর যাইতেছি, সেখানে বন্ধুরা ঈদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

একথা শুনিয়া শাহ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, জেলখানায় ঈদের নামাজ পড়া যাইবে কি? মওদূদী সাহেব উত্তর দিলেন, যদি কেহ পড়িতে চায় তবে পড়িতে পারে এবং না পড়িলেও কোন দোষ নাই।

শাহ সাহেব বলিলেন, ইহাতো কোন জওয়াব হইল না।

মওদূদী সাহেব বলিলেন, আমি জেল খানায় জুমার নামাজ আদায় করিনা।

শাহ সাহেব বলিলেন, আমিও জুমা পড়িনা; কিন্তু আমার না পড়াটা ইমামে আজমের অনুকরণে। কিন্তু আপনার না পড়ার যুক্তি অন্যরূপ।

শাহ সাহেবের এইরূপ উক্তি শুনিয়া মওদূদী সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

হজরত সানী (রঃ) এর একটি চমৎকার ইংগিত

হজরতে সানী (রঃ) একবার হজরত কাজী শামসুদ্দিন সাহেবের নিকট বর্ণনা করিলেন যে, হজরত শায়খুল হিন্দ যখন মাল্টায় বন্দী ছিলেন তখন মায়ারেফে কুরআনে হাকীমের উপর (কুরআনের পরিচয়) একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সামান্য অগ্রসর হওয়ার পর তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিলেনঃ আমি কিতাবের পরিবর্তে একটি ব্যক্তিত্বের উপর (হজরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী) কাজ শুরু করিয়াছি, যাহাতে আল্লাহর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য একটি সহজ সরল ব্যবস্থা হইয়া যায়। হজরতে আকদাস এই ঘটনা

বর্ণনা করার পর বলিলেনঃ আমিও একজন মানুষ তৈয়ার করিতেছি। পরে আকার ইংগিত দ্বারা বুঝা গেল যে, সেই মানুষটি হজরত খান মুহাম্মদ সাহেবই হইবেন। ফালহাদু লিল্লাহে আলা জালিকা।

হজরত কেবলা খান মুহাম্মদ সাহেবের গদীনিশীন হওয়া

হজরত সানী (রঃ) এর ইন্তেকাল তরীকায়ে নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়ার বুযর্গ ব্যক্তিদের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ও দুঃখজনক ঘটনা ছিল। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য সত্যান্বেষণকারীদিগকে উদ্ধার করে। সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি হজরত সানীর ইন্তেকালের সময় খানকা শরীফে উপস্থিত ছিলেন। হাকীম চিনপীর সাহেব, মুফতি আতা মুহাম্মদ সাহেব এবং হাকীম সাইফী সাহেবের মত বুযুর্গগণ ছিলেন তাঁহাদের অন্তর্গত। তাঁহারা সকলেই একমত হইয়া হজরত কেবলার নিকট নূতনভাবে বাইয়াত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সকল বিশিষ্ট মুরীদগণও ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ হজরতে সানীর পর নূতনভাবে মুরীদ হওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা স্বপ্নে হজরত সানী (রঃ) কে দেখিলেন এবং তিনি বলিলেনঃ আমার মধ্যে এবং খান মুহাম্মদ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, অতএব এখন হজরত খান মুহাম্মদ সাহেবের নিকট পুনরায় বাইয়াত গ্রহণের মাধ্যমেই মুজাদ্দেদীয়া তরীকার ফয়েজ হাসিল করা সম্ভব। এই নির্দেশের পর তাঁহারা সকলে তাঁহার সহিত সম্পর্ক কায়েম করিলেন। এইভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বিশেষ মেহেরবাণীতে এই পবিত্র তরীকার ফয়েজ বরকত চালু রাখিয়াছেন।

হজরত কেবলার গদীনিশীনের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে দৈনিক ঝং পত্রিকার কোষাধ্যক্ষ হাফেজ রিয়াজ আহমদ আশরাফী বর্ণনা করেনঃ হজরতে সানী (রঃ) এর ইন্তেকালের পর ১৯৬৫ ইংরেজী সালে একরাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি বাইতুল্লাহ শরীফের বাবে মুলতাজেমের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। মানুষের অত্যন্ত ভীড় ছিল। অনেক আলেমও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উনার মুরীদও ছিলেন। সেখানে হঠাৎ এই ঘোষণা হইল যে, হুজুর (সঃ) তশরীফ আনিতেছেন এবং তিনি বর্তমান যুগের ইমামের নাম ঘোষণা করিবেন। তখনই বাইতুল্লাহ শরীফের দরজা খুলিয়া গেল এবং হজরত মাওলানা কুদ্দুসুসিররুহু তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হজরত কেবলা খান মুহাম্মদ সাহেবর হাত ধরা অবস্থায় বাহির হইলেন। উপস্থিত সকলকে তিনি বলিলেনঃ তোমরা সকলে যুগের এই ইমামের মুরীদ। অতঃপর তিনি নিজের পাগড়ী খুলিয়া মাওলানা খান মুহাম্মদের মাথায় পরাইয়া দিলেন। তারপর খান মুহাম্মদ সাহেব সকলকে কালিমায়ে শাহাদাত ও তওবার মাধ্যমে তরীকার অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং

চুপে চুপে জিকির করার উপদেশ দিলেন। হজরতে আকদাস এরপর আজান দিলেন এবং তকবীর বলিলেন। হজরত কেবলা খান মুহাম্মদ সাহেব উপস্থিত সকলকে নামাজ পড়াইলেন।

ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার

হজরত কেবলা খান মুহাম্মদ সাহেব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুভব করিলেন যে, ইসলাম ধর্মের রক্ষণ, প্রসার, উন্নতি ও কামিয়াবী ইসলামী শিক্ষার উন্নতির মধ্যেই নিহিত আছে। যে পর্যন্ত একাত্ববাদীদের অন্তর ইসলামের ধর্মীয় এবং বৈষয়িক শিক্ষার দ্বারা পরিপূর্ণ না হয়, সে পর্যন্ত দ্বীন প্রচারের সঠিক উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হইবেনা। সুতরাং তিনি ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মহান উদ্দেশ্যকে নিজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য স্থির করেন সেইভাবে, যেভাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজেকে নিবেদিত করিয়াছিলেন মুহাম্মদ ওলী উল্লাহ দেহলভী এবং তাহা উজ্জীবিত রাখিয়াছেন হজরতে শায়খুল হিন্দ (রঃ)। প্রকৃত ঘটনা এই যে, এই সকল মহান ব্যক্তিদের আন্তরিক প্রচষ্টায় কুফর ও নাস্তিকতার অন্ধকার দূর হইয়াছে এবং এই উপমাহাদেশের মুসলিম উম্মাহ ইসলামের শান ও শওকাতের সহিত পরিচিত হইয়াছে।

হজরত কেবলা তরীকার অনুসারীদিগকে এই নেক কাজের গুরুত্বের কথা অনুধাবন করাইলেন এবং বলিলেন যে, পূর্ণাঙ্গ ধর্মের এই আলোকবর্তিকাকে (যাহা গোটা বিশ্বকে আলোকিত করিয়াছে) বহাল রাখা উচিৎ কেননা ইহার আলো আমাদের জীবন এবং ইহার স্থায়িত্ব আমাদের নিরাপত্তা। পবিত্র আরবী শিক্ষার অনুসরণের দ্বারাই বর্তমান যুগের অন্যায় ও অশ্লীলতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অপকারিতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া তিনি বিভিন্ন আরবী মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। যেসকল মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম দুর্বল ছিল, তাহাদের তিনি উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাহারা সাহায্য চাহিয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল মাদ্রাসা পরিচালিত, তাহার কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(১) দারুল উলুম কবীর ওয়ালা, (২) মাদ্রাসায়ে কাসেমুল উলুম ফকীরওয়ালী (৩) মাদ্রাসায়ে ফোরকানীয়া রাওয়ালপিন্ডি (৪) মাদ্রাসায়ে ওসমানীয়া রাওয়ালপিন্ডি (৫) মাদ্রাসায়ে সিরাজীয়া ফোর্ড আব্বাস (৬) দারুল উলুম মুজাদ্দেদীয়া মাক্কী শরীফ (৭) মাদ্রাসায়ে সায়াদীয়া খানকায়ে সিরাজীয়া।

তিনি দারুল উলুম হককানীয়ার মজলিশে আমেলার কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ শরীয়াতী আইন সম্মেলনের এক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ইসলামী সভ্যতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দিবারাত্র চেষ্টিত। তিনি জমীয়াতে ওলামায়ে ইসলামের একজন একাগ্র সহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক।

কতিপয় কেরামত সম্পর্কে

ওলী আল্লাহ্দের দ্বারা কেরামত প্রকাশিত হওয়া বিচিত্র নয় এবং ইহা কেহ অস্বীকারও করিতে পারেনা কিন্তু কেরামত অপেক্ষা আরেফীনদের নিকট দৃঢ়পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতি সম্মানজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ। আল্হামুদলিল্লাহ আমাদের হজরত কেবলার প্রত্যেকটি কথা এবং কাজ পবিত্র শরীয়াত এবং সুন্নাতের অনুসরণেই হয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের ও সম্মানের জন্য ইহাই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুরীদগণ হজরত কেবলার অসংখ্য কেরামত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রচনা দীর্ঘ হইয়া যাওয়ার আশংকায় সেসব দেওয়া সম্ভব হইল না। ইহা ছাড়া এই ভয়ও ছিল যে পাঠকবৃন্দ শুধু কেরামতের অধ্যায়কেই বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করিবেন এবং বরকতের ঝরণার দ্বারা পিপাসা দূর না করিয়া পিপাসিতই থাকিয়া যাইবেন। তাহাছাড়া হজরত কেবলাও কেরামতকে তেমন একটা গুরুত্ব দেন না এবং কেরামতের আলোচনাও পছন্দ করেন না। এই কারণেই আমরা শুধু দুই একটি ঘটনাই বর্ণনা করিব যাহাতে পাঠকগণ তাঁহার উচ্চ মর্তবা ও উচ্চ সম্মানের অনুমান মোটামুটিভাবে করিতে পারেন।

(১) জনাব হাবীবুর রহমান খান সাহেব আহমদপুরী ১৯৬৫ ইংরেজী সনে হজরত কেবলার নিকট মুরীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। একবার খান সাহেব তাঁহার স্ত্রী ও বোন সহ হজ্বব্রত পালনের ইচ্ছা করেন এবং এই পবিত্র সফর উপলক্ষে হজরতে কেবলার নিকট বিশেষ উপদেশ লাভের জন্য খানকা শরীফে উপস্থিত হন। হজরত কেবলা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও অনুগ্রহের সহিত মক্কা শরীফের সমস্ত পবিত্র স্থানসমূহের কথা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং এই সঙ্গে ইহাও বলিলেনঃ আমার কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করিবেন।

খান সাহেব রওনা হইয়া জহরান বিমান বন্দরে নামেন। সেখান হইতে গাড়ীতে করিয়া মক্কা শরীফ যাওয়ার খেয়াল ছিল। কিন্তু বিমান হইতে নামিবার সাথে সাথে সৌদি সরকারের এই ঘোষণা শুনিলেন যে, সকল হজ্ব যাত্রীকে জহরান হইতে বিমানযোগই জেদ্দা যাইতে হইবে। খান সাহেবের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা থাকিলেও

রিয়াল খুব কম ছিল। এই জন্য তিনি খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অস্থিরতার মধ্যে হজরত কেবলার উপদেশের কথা মনে পড়িল। তিনি তাহাজ্জদ নামাজ পড়িয়া আল্লাহর দরবার হজরত কেবলার উসিলা দিয়া দোয়া করিলেন। ফজরের নামাজের পর এক ব্যক্তি স্বাভাবিক পরিচয়ের পর তাহাদিগকে মালিক আব্বাস সাহেবের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং ১১২০ রিয়াল খান সাহেবের সামনে পেশ করিলেন। এই অর্থ দিয়াই খান সাহেব নিজ সফরের যাবতীয় খরচ সম্পন্ন করেন এবং ফিরিবার সময় উহা পরিশোধ করিয়া দেন। এছাড়া যখনই কোন ভয়ভীতি অথবা মানসিক অস্থিরতা দেখা দিত, তখনই তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে তাহা হইতে মুক্তি পাইতেন।

(২) ক্বারী মুহাম্মদ আরীফ মুজাফ্ফরগড়ের একটি দ্বীনি মাদ্রাসার শিক্ষক এবং হজরত কেবলার একজন বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন। একবার তিনি খানকা শরীফে উপস্থিত হইয়া হজরত কেবলার নিকট আরজ করিলেন, আমি আপনার মত এত বড় একজন বুযুর্গের মুরীদ অথচ আমি কখন বিশেষ কোন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা। আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করুন, আমি যেন হুজুর (সঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি। হজরত ইহা শুনিয়া মুচকি হাসিলেন এবং চুপ করিয়া থাকিলেন। ঐ রাত্রেই উল্লেখিত ক্বারী সাহেব হুজুর (সঃ) এর সাক্ষাতের দ্বারা ধন্য হন। ঐ স্বপ্নে হজরত কেবলাও হুজুর (সঃ) এর সঙ্গে ছিলেন। হজরত কেবলা বলিলেনঃ ক্বারী সাহেব, আপনি প্রাণ ভরিয়া হুজুর (সঃ) কে দেখিয়া নিন। ইহার পর তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পরদিন সকালে হজরত কেবলা মজলিশে তশরীফ আনিলে ক্বারী সাহেব পুনরায় অনুরোধ করিয়া বলিলেন, আমি হুজুর (সঃ) এর জিয়ারাত লাভের জন্য এখনও আকাংখিত। এই সৌভাগ্য লাভের জন্য আপনি একন্তই দোয়া করুন। হজরত কেবলা উত্তর দিলেনঃ ক্বারী সাহেব, প্রত্যেক দিন দেখা যায় না। এই কথার দ্বারা ক্বারী সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত কেবলা তাঁহার গতরাতের স্বপ্নের কথা ভালভাবেই জানেন এবং সেই দিকেই ইংগিত করিয়া বুঝইতে চাহিতেছেন যে হুজুর (সঃ) এর জিয়ারাত একবার হইয়া গিয়াছে এবং ইহা বারবার হয়না। এই আধ্যাত্মিক দয়ার জন্য উল্লেখিত ক্বারী সাহেব অনেকক্ষণ যাবৎ ক্রন্দন করিলেন।

উপসংহার

আল্লাহ ওয়ালাদের জীবনী ও বিশেষ বিশেষ অবস্থা রচনার সময় লেখকের অন্তরে যে-ভাব প্রভাব বিস্তার করে, লেখার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হয়না। তাহা

ছাড়া কোন ওলীয়ে কামেলের সঠিক অবস্থা মূল্যায়ন করার মত চিন্তাশক্তিই বা কাহার আছে? শুধু একথা বলাই যথেষ্ট হইবে যে, হজরত কেবলার ব্যক্তিত্ব অতি অসাধারণ। তাঁহার স্নেহ ও মমতার আঁচল প্রত্যেক মুরীদের উপর প্রচ্ছায়িত। তাঁহার সস্নিগ্ধ কথাবার্তা এবং দ্যুতিময় চেহারা শ্রোতা ও দর্শকদিগকে অপরিমিতভাবে পরিতুষ্ট করে। প্রতিটি কঠিন কাজের মধ্যেও সহজ ও সাফল্যের একটা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তিনি ধৈর্য্যের এক অবিচল প্রতীক, যেমন সমুদ্রের বুকে এক দ্বীপ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের আঘাতেও অবিচল থাকে, বরঞ্চ আঘাতকারীরাই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। বাতেল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা তিনি ছিলেন অবিচল। মুসলমানদের দুর্দিনের বন্ধু সুন্নাতে রাসুলের পরিপূর্ণ অনুসারী, আভ্যন্তরীণ উজ্জ্বলতায় মহিমান্বিত এবং একাগ্রতা ও খোদা ভীতির দ্বারা ছিলেন পরিপূর্ণ।

নকশে বন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরিকায়ে আলীয়ার–মাশায়ে খগণের ধারাবাহিকতাঃ–

(১) নিশ্চয় আল্লাহর ফজিলত এবং দয়া পরহেজগারদের জন্যই। গোনাহ্গার পাপীদেরকে মাফ করিয়া দেওয়া আল্লাহর জন্য কোনই কঠিন ব্যাপার নয়।

(২) আমরা কুফুরের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া সুস্থ ভাবেই রহমাতুল্লীল আলামীন মোহাম্মদ (সঃ) এর দিকে সুন্দর রাস্তা পাইয়াছি।

(৩) হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) প্রথম খফিলা যিনি সমস্ত উম্মতের মধ্য হইতে সর্বাধিক বেশী– দয়াপরবশ ব্যক্তি ছিলেন।

যিনি আল্লাহর হাবিব রাসুল (সঃ) ব্যতীত কোন পাথেয় পছন্দ করিতেন না।

(৪) আমরা অন্তরও জীবনের বদৌলতে প্রসিদ্ধ ছাহাবী হযরত সালমান ফারসীর আনুগত্য করতাম, যাহাকে রাসুলে করীম (সঃ) নিজের পরিবার তথা বংশের লোক বলেও পরিগনিত করতেন।

(৫) হযরত কাশিম বিন্ মোহাম্মদ বিন্ আবুবকর যখন দুনিয়ার সমস্ত ফয়েজ বন্টন করেন, তখন আমি সার্বক্ষনিক নিয়ামত বহিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম।

(৬) হযরত ইমাম বিশ্বাসীদের এ মন মুকুট ছিলেন, যাহা হতে হযরত আলীর বেলায়তের সাক্ষ্য আরো সৌন্দর্য মন্ডিত করে দেয়।

(৭) হযরত বায়েজিদ বুস্তামির একক ওসিলায় ডুব দিয়ে, প্রত্যেক পথিকের আল্লাহর রহমত অম্বেষন একান্ত ভাবে দরকার।

(৮) আমরা হযরত আবুল হাসান খারকানীর উপর গৌরবানিত্ব যিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের মারেফত হাসিল করেছিলেন, তাহারই সৌভাগ্য মুসলিম মিল্লাত প্রসার হয়েছিল।

(৯) হযরত বুয়ালী ফারমদী (রহঃ) মানুষের অন্তরের শুদ্ধির জন্য বলতেন, সুতরাং তাহার নূরানী নছিহতে বক্ষ বিদির্ন হতো।

(১০) হে খোদা আমরা তো সামান্য পূঁজি নিয়ে এসেছি, আমাদেরকে বন্ধু ইউসুফ হামাদানী (রহঃ) এর শিষ্যত্য দান কর।

(১১) হযরত খাজা আঃ খালেক গর্জদেদানী (রহঃ) এর নূরের কুফারী থেকে, আমাদের জন্য নূরের ফয়েজ প্রবাহিত কর।

(১২) পথ প্রদর্শক হযরত আরেফ বিড়গ্রী (রহঃ) এর উসিলায় গুমরাহীর সমস্ত বুত পত্বিকে ভেঙ্গে চুড়মার করার তাওফীক দাও।

(১৩) হযরত মাহমুদ ফগুনীর (রহঃ) উত্তরাধিকার হবো, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যিতি আধ্যাত্বিকতার ফজিলতকে গান মত বলে জানে, এবং দুনিয়ার জিল্লতি থেকে দূরে থাকে।

(১৪) খাজা আলী রাইমাতনী (রহঃ) এর যাহেরী ও বাতেনী পাথেয় দ্বারা সম্মনিত হযে যেতে চাও, তখনি হতে পারবে যখন তুমি অন্বেষনের সিড়িতে আরোহন করবে।

(১৫) হযরত বাবা সিমাসী (রহঃ) ইমাযুত তারীকায়ে নকশবন্দিয়ার জন্মের সাথে সাথেই তার ঘ্রাণ নিয়েছিলেন, সুতরাং ঐ সুঘ্রাণের আলোকেই তাহার জন্মস্থানের দিকে তাস্রীফানিয়ে ছিলেন।

(১৬) যদি তুমি চেষ্টা করতে গিয়ে নিরাশহও, তখন হযরত আমীর কেলাল সাহচর্য্য লাভ করা, যিনি উন্নত মানের চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

(১৭) হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশ্বন্দি (রহঃ) যিনি নিজের নক্কদ্ হতে, আমাদেরকে চীর জীবনের সুরা পান করিয়েছেন।

(১৮) আমরা হযরত আলাউদ্দীন আক্তার (রহঃ) এর নূরের ক্যতি থেকে নিজেদের অন্ধকার দুর করি, সোজা যাদুর ন্যায় কেরামতে সাথে চলে যাই।

(১৯) কি তোমরা হযরত ইয়াকুব (রহঃ) এর মারেফতেইলাহী – বৈঠকে উপস্থিত ছিলে?

(২০) হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ (রহঃ) এর প্রচেষ্ঠায় শরীয়তে মোহাম্মদীয় এরকম সুন্দর স্থান হয়েছে যাহার প্রত্যেক স্থানেই আঁশার শিকড় হয়ে আছে।

(২১) হযরত খঅজা মোহাম্মদ জাহেদ পরহেজ গার হিসেবে প্রতিনিয়ত প্রসিদ্ধ ছিলেন, খোদা ভীরুতা ছিলতার গৌরবের পোষাক, সম্মান মাজদ ছিল তার সৌন্দর্য্যের চাদর।

(২২) যে হযরত দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ) কে উসিলা বানিয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে, এমনকি কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

(২৩) হযরত খাজা উম্‌কাগু (রহঃ) যে ভাবে আল্লাহর রাস্তা পেয়েছিলেন, ঠিকসেভাবেই ঐ রাস্তা আমাদেরকে দেখিয়েছেন যাহা দ্বারা কিয়ামতের দিনের দাদামাত ও ভয় সত্বেও সে রাস্তা পাবেই।

(২৪) হযরত খাজা বাকিবিল্লাহর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষকর, যখন তোমরা বাকির মারেফারের উপর মাশগুল হবে, তখন নিজেই ঐ মহৎ কাজের–সাক্ষ্য দিবে।

(২৫) হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (রহঃ) মুমিনদের ইমাম ছিলেন, ওগো বন্ধুরা, তোমাদের জীবনের কসম, আমরা মুসলিম উম্মাহ তাহারই নেতৃত্তের উপর–সন্তুষ্ঠ আছি।

(২৬) যখন তোমরা হযরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম (রহঃ) কে পারে তখন তোমরা ইহ্‌সানের দিকে হেদায়াত লাভ করবে, যাহা উত্তমতার শেষ মঞ্জিল।

(২৭) যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আমরা তাকে খোদা আইফুদ্দীন দ্বারা ইসলাম থেকে হটিয়ে রাখবো, এবং দ্বীনের শত্রুদের কূপে নিপতিত করে রাখবো।

(২৮) হযরত সাইয়্যাদ নূর মোহাম্মদ বাদায়ুনী (রহঃ) আল্লাহর সাহায্যের মূর্য ছিলেন, তাহার জিকিরের আলোতে, অন্তর তথা জমিনের দিগদিগন্ত ও আলোকিত হতো।

(২৯) তারিকতের গোপনভেদ প্রকাশ কারী আমাদেরকে একমাত্র হযরত হাবিবুল্লাহ, তাহার উচ্চ পর্য্যায়ের লতিফা আমাদেরকে ছিদ্‌রাতুল সুনতাহার দিকে পৌছাবে। যে গাছের কাঠা কেটে পরিস্কার করা হয়েছে।

(৩০) হযরত শাহ গোলাম আলী (রহঃ) এর জন্ম এক জমিনের মত, যে জমিনে নুরের এমন খোসা উটেছে, যাহার নালী কাটা করে হয় নাই।

(৩১) হযরত শাহ্ আবু সাঈদ হেদায়েতের কারণে, আল্লাহর নিদর্শনের কারণ হয়ে গিয়েছিলেন, তুমি যদি সেই নিদর্শনের ইরাজ বা বিদ্রোহী হও, তাহলে আমার কি ক্ষতি হবে?

(৩২) যে ব্যক্তি হযরত শাহ আহমদ (রহঃ) এর সৈনিক হলো, তাকে যেন আল্লাহ কবুল করে নিলেন, পরে সে আর-খাহেশের অনুসারী হবে না।

(৩৩) আমরা পরহেজগার বুজুর্গ হাজী মোহাম্মদ কানদারী (রহঃ) মাহ্মান, আমরা কলবের উসিলায় নাযাৎ চাই।

(৩৪) হযরত খাজা উস্‌মান দামানী (রহঃ) আমাদেরকে সংকীর্ণ পঙ্কিলতা পূর্ণ জীবন থেকে বের করে এনেছে, প্রকৃতই যে আল্লাহর সান্যোধ্য চায় তার জন্য ফিরে যাওয়া কোন ক্রমেই ঠিক হবে না।

(৩৫) তোমরা হযরত খাজা সিরাজউদ্দীন (রহঃ) এর দায়েমী উত্তরাধীকার হয়ে যাও যিনি এতই নেককার ছিলেন যে, আল্লাহর নেয়ামতের দ্বরাই শক্তি মান ছিলেন।

(৩৬) আনুগত্যের দিক থেকে হযরত মাওলানা আবু সাদ আহ্‌স দৃঢ়চিত্ত সর্বক্ষনিক এমনি ছিলেন, যে অগনিত আল্লাহর নিয়ামত কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

(৩৭) হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মাকামাকে রহমতে এলাহীর দরজা স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার হেদায়াতে আলোয় তিনি আল্লাহর পক্ষথেকে সবচেয়ে বেশী নিয়ামত পেয়েছিলেন।

(৩৮) আমরা সারা জাহানেই হযরত খান মোহাম্মদ সাহেবের খান্‌কায়ে সিরাজিয়া সার্বক্ষনিকভাবে দেখিতে চাই।

(৩৯) আমাদের পীর হযরত আবুল খলিল, যিনি নিজের নূর বিছায়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আহাজারী করে আশ্রয়ে আসবে, সে হেদায়াত পাবে।

(৪০) হে আমার প্রভু, হে আমায় মাওলা, ঐ সমস্ত উলিদের সাহচর্য্যে মাধ্যমে, রোজ কিয়ামতের দিন রহমতের চায়ায় আশ্রয় দিও।

——— o ———

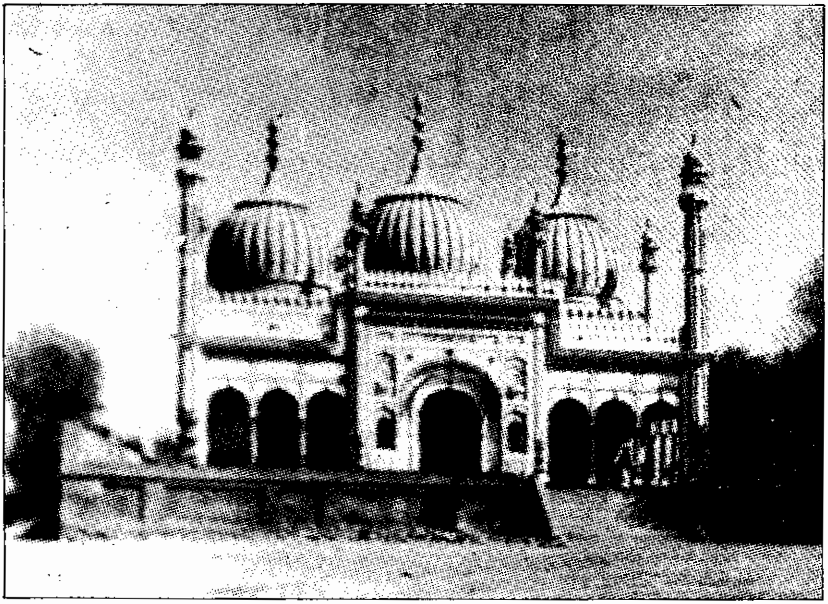

খানকায়ে সিরাজিয়া মসজিদ

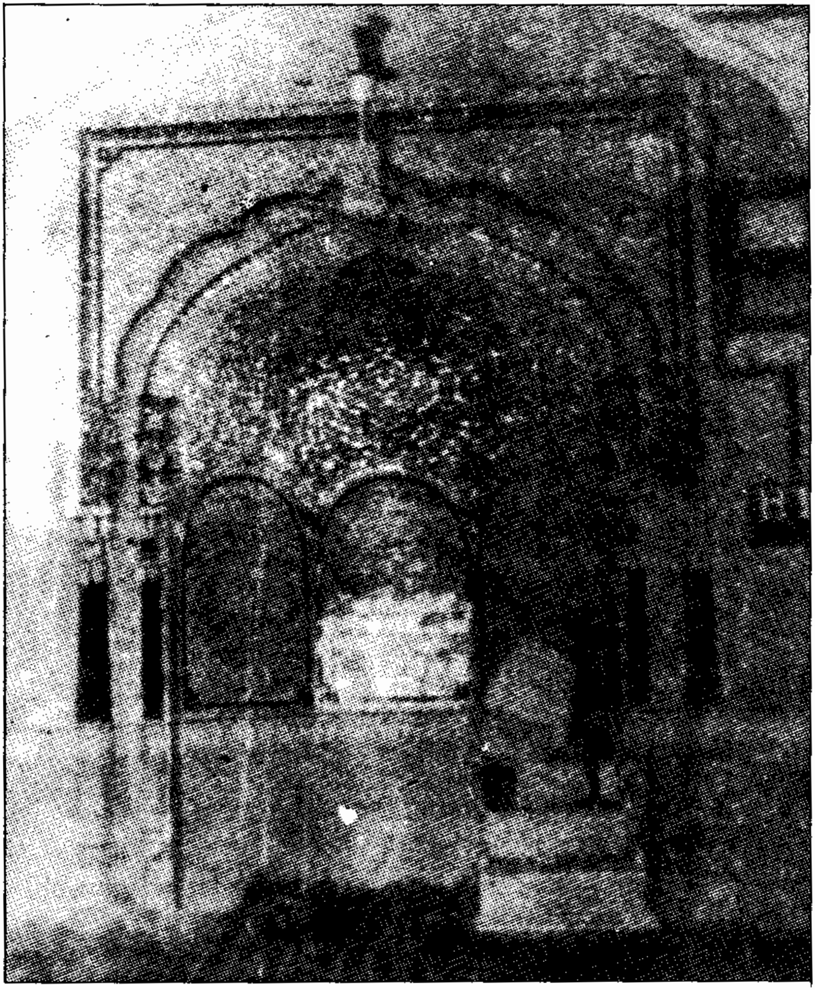

খানকায়ে সিরাজিয়া মস্‌জিদের মেহ্‌রাব